মনসিজ

প্রকাশক
প্রফুল্লকুমার রায়
অগ্রণী প্রকাশনী
এ ১, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট
কলিকাত-১২

মুদ্রক
প্রফুল্লকুমার রায়
অগ্রণী প্রেস
১৫৩।৫ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড
কলিকাতা-৬

প্রচ্ছদ
সুবোধ দাশগুপ্ত

প্রথম প্রকাশ
আশ্বিন, ১৩৬৮
অক্টোবর, ১৯৬১

পাঁচ টাকা

এ উপন্যাসে আমার অন্তর্মনা রচনাটির ধারাবাহিকতা রক্ষা করা হয়েছে। যদিও স্বয়ংসম্পূর্ণ, তবু অন্তর্মনার উল্লেখ্য সব চরিত্ররাই এ উপন্যাসে উপস্থিত। তাদের আরও পূর্ণাঙ্গ রূপ দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে।

কলকাতা
অক্টোবর
১৯৬১

জ্যোতির্ময় গঙ্গোপাধ্যায়

শান্তি বসুকে

গ্রন্থকারের অন্যান্য রচনা

অন্তর্মনা

অমরাবতী (কাব্য গ্রন্থ)

তের চোদ্দর কবিতা

পিরামিডের মাথার মানুষ (কিশোর উপন্যাস)

বাঘের ভয়ে (কিশোর উপন্যাস) (যন্ত্রস্থ)

॥ ১ ॥

ব্যবধান প্রায় একটা যুগের কি তারো কিছু বেশি।

পেটের নিচে ছুটো বালিশ ওপর-নিচ পরপর রেখে অনিন্দ্য গভীর মনোযোগ দিয়ে মিলিয়ে দেখছিল ছবি ছুখানা। ছুখানা ছবিই তার। একখানা এই নিতান্ত বর্তমানের, আরেকখানা অনেক দিনের, বাবার জীবিতাবস্থায় তোলা সেই প্রায় কৈশোরের। সত্যি মেলানো যায় না ছবি ছুখানা। এই চেষ্টাই করছিল সে প্রাণপণে। যেন একটি জটিল সমস্যার নিখুঁত সমাধান তার একটি মুহূর্তের অভীষ্ট। বর্তমানের এই মুখ আর অনেককালের পুরনো সেই সুকুমার মুখের মধ্যে 'তফাৎটা খুব বেশি বড় হয়ে চোখে পড়ে। এখন তার মুখে বুদ্ধির যে ছাপ পড়েছে তা তার নিজের ভালোবাসার বস্তু হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু সেই নিঃসঙ্কোচ দৃষ্টির, সেই কৌতূহলী ও রহস্যময় ভাসা ভাসা চোখের সহজ জিজ্ঞাসা যেন হঠাৎ এক প্রবীণ অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে অন্তর্লীন।

ছবিখানার কাগজ হলুদবর্ণ প্রায়, তিনচারটে ভাঁজ আড়াআড়ি করে পড়েছে। তার সেই সুকুমার মুখ আর চোখ সেই দাগগুলোর তলায় একরম চাপা পড়েছে মনে হয়। তবু সে আন্তরিক মমতায় সেই বহু পুরনো ছবিখানারই ওপর অপলক দৃষ্টি মেলে রাখে। ওই চোখ জোড়ার দিকে চাইলে, একটি সত্য যা চিরদিন ধ্রুব মনে হতে পারে তা হল—তার জীবনে বাবার সমস্ত কাজ, কথাবার্তা, চলাফেরা বা মেলামেশার মধ্যে যে একটি ছুনিরীক্ষ্য রহস্য, ছুর্বোধ্যতা, সেই কথাটারই সাক্ষ্য বহন করছে ওই ছুচোখের অনাবিল আলো। পুরোপুরি বিদ্রোহের না-হলেও ঠিক পরম ছুঃখেরও নয়, চাপা ক্ষোভের ও অসন্তোষের, সহস্র অনুচ্চারিত অভিযোগের অনেক দাগ যেন ছবিখানার সারা মুখ জুড়ে

এপাশ-ওপাশ। হাসি আসে তার, ম্লান হাসি। যেন এক একটি দাগ এক একটি গভীর জিজ্ঞাসার নির্মম রেখা।

বাবাকে ক্ষমা করার বা অভিযুক্ত করার কোনো প্রশ্ন ঠিক এই ছবিখানার এই সুকুমার বালকের স্বচ্ছ সহজ দৃষ্টিতে নেই। শুধু অসীম রহস্যমগ্নতার মাঝখানে থেকে থেকে মাথা তুলে উঁচু হয়ে দৃষ্টি মেলে এদিক ওদিক বহুদুর পর্যন্ত, যদি এই রহস্যের পার ছাড়িয়ে সত্য কিছু থেকে থাকে। বাবার অসংখ্য অর্থহীন দুর্বোধ্য কাজকর্মকে ডিঙিয়ে?

মানুষ কেন ছবি তুলে রাখে? স্মৃতিকে বাঁচিয়ে রাখার জন্যেই কি মানুষ ছবি তোলে? স্মৃতি যদি হারিয়ে যায়, এই তার ভয়? রক্তমাংসের বস্তু হারালে সে সান্ত্বনা পায় স্মৃতির আড়ালে আশ্রয়ে এসে। আর সেই স্মৃতি যাতে হারাতে না-পারে তারই চেষ্টায় সে কত পদ্ধতিতে কত ভঙ্গিমায় ছবি তোলে। স্মৃতিকে ধরে রাখার এই এক স্থায়ী আধার। কিন্তু সেই ছবিও তো একদিন হলুদবর্ণ হয়ে ওঠে। তখন? আর সেই হলুদবর্ণ ছবি কখনো-সখনো উইয়েতেও কাটতে পারে। তবে? স্মৃতির কি দশা হবে তখন? স্মৃতি, সামান্য স্মৃতি—তাকেও ধরে রাখা মানুষের পক্ষে মাঝে-মাঝে নিদারুণ অসম্ভব হয়ে ওঠে? মানুষের এই অসহায়তার কথা ভেবে নিজেকে তার কেমন আর্ত মনে হল।

মোটা বইখানার পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে আরেকখানা ছবি সে খুঁজে পায়। বইয়ের পাতার মধ্যে ফোটো গুঁজে রাখা তার পুরনো স্বভাব। আর এমন অনেক বইও থাকে যা নাড়াচাড়ার কোন প্রয়োজন হয়তো সে অনেকদিন অনুভব করে না। এমনই একখানা বইয়ের কোন কোন পাতা থেকে যদি বহুদিনের তোলা পুরনো দুয়েকখানা ফোটো হঠাৎই আবিষ্কৃত হয় তো সেই বিশেষ বইখানির সমস্ত কলেবর গৌণ হয়ে শুধু অবিস্মরণীয় হয়ে থাকে সেই বিশেষ বিশেষ পাতা। তাই যে পাতাখানা থেকে শ্বেতাদি, অরুদি, ছোড়দি, তাকে ও আরো অনেককে নিয়ে তোলা গ্রুপ ফোটোখানা সে আজ খুঁজে পেল তার পৃষ্ঠা সংখ্যা তার মনে গেঁথে গেল। ওই বিশেষ পাতাখানির কাছে তার তাই কৃতজ্ঞ থাকতে ইচ্ছা জাগে।

পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে হঠাৎ হাতে উঠে আসে আলগা হয়ে কিংবা

যেন পাতা থেকেই খসে পড়ে ছবি একখানা। প্রথমাবস্থার জৌলুস নেই আর। মসৃণ থেকে কেমন যেন খসখসে হয়ে উঠেছে। হলুদ হলুদ ছোপ পড়েছে ছবিখানার সারাটা গায়। ওরই মধ্যে হয়তো কারো কারো মুখে এখনও কোন দাগ পড়েনি। এ যেন সময়েরই দাগ। সময়ের নির্মম হাত কারো কারো মুখেচোখে স্পর্শ বুলিয়েছে। অরুদির দুষ্টুমিভরা মুখেচোখে আত্মম্ভরিতার কথা এখনও যেন স্পষ্ট পড়তে পারা যায়। ছোড়দির চোখের সারল্য বা অন্তরের গম্ভীর বেদনা এখন এই প্রায়বিবর্ণ ছবিতে ধরা পড়ে না। তার নিজের দিকে তাকালে তার নিজেরই করুণা করতে ইচ্ছা জাগে, একটি সরল নিঃসহায় বালকের প্রতি সহৃদয় বয়স্কের যে মনোভাব। ছবি যখন তোলা হচ্ছিল, বেশ মনে পড়ে, ক্যামেরার কাচের দিকে অসীম বিস্ময় ও বিপুল কৌতূহল নিয়ে নিষ্পলক তাকিয়ে ছিল সে। যেন পৃথিবীর সেরা বিস্ময় আজ এ মুহূর্তে আবিষ্কৃত হবে চক্ষের পলকে। আর শ্বেতাদির দৃষ্টি? সেখানেও বিস্ময় অনন্ত কিন্তু তার চাহনির মত অসহায় নয়। যেন অনেক কিছু জেনেশুনেই নীরব থাকার ভান। তার বর্তমানের বিচারে ফোটোখানার এই ব্যাখ্যাই তার কাছে গ্রহণযোগ্য মনে হয়। শ্বেতাদির ছবির কাছে এসেই দৃষ্টি তার নিবদ্ধ হয়ে থাকে। অনেকক্ষণ তাকিয়ে থেকে থেকে সে নীরবতাকে উপলব্ধি করে একেবারে হৃদয়ের সেই কোন অতলে, গভীরে।

কক্ষের বাস্তব পরিস্থিতিতে ফিরে এসেছে যখন, তখন আচমকাই যেন কে তার কানের কাছে নিবিড় কণ্ঠে বলে যায়—ফোটোর এই শ্বেতাদিই এতকাল পরে আসছে। কথাগুলো তার কানে এসে বেজেছে সরবে। যেন চমকে পাশ ফিরে দেখতে হয় আর দ্বিতীয় কোন ব্যক্তির উপস্থিতি তাকে এই কক্ষে খবরটা জানাচ্ছে: এই শ্বেতাদিই এতকাল পরে আসছে।

সত্যিই শ্বেতাদি আসছে। আর তার আসার খবর সর্বাগ্রে পেয়েছে একজন। একজন যাকে শ্বেতাদি চিরদিন ভালবেসেছে, বিশ্বাস করেছে, মনে রেখেছে। ছোড়দি, সেই একজন। চিঠি পেয়েছে ছোড়দি। তার নামে চিঠি এসেছে। এখন আগেকার সেই ছেলেমানুষী ভঙ্গিতে

সারা বাড়ি ওপর-নিচ দাপাদাপি করে বেড়িয়েছে...শ্বেতার চিঠি শ্বেতার চিঠি। আগে ছুটে গেছে মা'র কাছে। মা ওর উৎসাহ ও আনন্দের আতিশয্যে হাতের কাজ ফেলে উন্মুখ না-হয়ে উঠে পারেনি। অনেক দূরপ্রবাস থেকে কন্যার পিত্রালয়ে ফেরার সংবাদে ব্যাকুল মায়ের মুখ যেন চকিতে জ্বলে উঠেছে। ক্ষণিকের স্তব্ধতায় মা তার বিস্মৃত চোখ মুখ অবয়ব ফের ফিরিয়ে আনতে সচেষ্টা হয়। শ্বেতাদি কি এখন মা'র কাছে ছোড়দি থেকে ভিন্ন কোন মানব অস্তিত্ব বা সত্তা নয়? মা'র স্নেহান্ধ দৃষ্টিতে শ্বেতাদির চিঠিতে যতটুকু খবর আছে তারও অনেক বেশি মা পড়তে পারে। মা'র ভালবাসা যে-উপাদানে তৈরী সে উপাদান অন্যের ভালবাসায় দুর্লভ, অনুপস্থিত। মা'র কাছে তার কৃতজ্ঞতা একেক মুহূর্তে তাই অপরিসীম।

বাবার মৃত্যুরও চার কি পাঁচ বছর পর শ্বেতাদির বিয়ে। আর শ্বেতাদির বিয়ের পরও কেটেছে প্রায় আরো পাঁচ সাত বছর। বেশ মনে আছে শ্বেতাদির বিয়েতে সে যেতে পারেনি। কলকাতা থেকে অনেক দূরে এক আত্মীয়ের বাসায় সে তখন বি. এ পরীক্ষার ফাইনালের জন্যে তৈরী হচ্ছে। সে এক ইতিহাস।

যাক সে কথা। তারপর একবার মাত্র দেখা হয়েছিল শ্বেতাদির সঙ্গে। বিপুল কোন পরিবর্তন মুখে চোখে ধরা না পড়লেও সারা অবয়বে নিশ্চয়ই পড়েছিল। অগেকার মত আর তন্বী মনে হয়নি শ্বেতাদিকে। ক্ষোভ ছিল যেন একটা মনের কোন অবচেতনায়। তবু শ্বেতাদি শ্বেতাদি-ই। এ যেন তার বিশ্বাস সুগভীর সুদৃঢ়। শ্বেতাদি সেই আগেকার ভঙ্গিতে আগেকার কণ্ঠে কথা বলে, কথাগুলোও প্রায় আগের মতো, তবে বাঁধুনি কিছু দৃঢ়। পরিবর্তনটা নেহাৎই বাহ্যিক। এও খুব কম সান্ত্বনা নয়, তার কাছে।

ছোড়দিকে শ্বেতাদির নিয়মিত লেখা চিঠিগুলো থেকে সে এর আগে শ্বেতাদি আর তার স্বামীর অনেক কথা জেনেছে। অনিমেষবাবু লোক খুব মিশুক আর হৈ-হৈ খুব পছন্দ করেন। অনেক জায়গা ঘুরেছেন বাংলার আর ভারতবর্ষের। শ্বেতাদিও সঙ্গে সঙ্গে ঘুরেছে। এতে না

কি মনের প্রসার বাড়ে, মানুষ উদার হয়। শ্বেতাদি বলেছে, মনের এই প্রসারতা, ঔদার্যের জন্যে যথেষ্ট পয়সা খরচও তো করতে হবে মানুষকে। যাদের ঘোরবার মত যথেষ্ট আর্থিক সামর্থ্য নেই তারা কি তবে অনুদার। অনিমেষবাবু তার্কিক নন। তাই গৃহিণীর সঙ্গে তর্ক না-করে সোজাসুজি বলেছেন, তোমার উদার মন আর সেই মনের প্রসারতার জন্যে তোমার এই স্বামী দেবতাটির চরণে বার বার মাথা ঠোকা উচিত। ভাগ্যে বিয়ে হয়েছিল আমার সঙ্গে। নইলে ওই কলকাতাই যৌবনের উপবন আর বার্ধক্যের বারাণসী হয়ে থাকত। বড় জোর বছরে একবার করে গরমে বা শীতের সময় চেঞ্জে যাওয়া।

শ্বেতাদি থামিয়ে দিয়ে বলেছে, রাখো রাখো। নিজের গর্বে আর প্রশংসায় পাড়া জাগাতে হবে না। আমি আছি তাই আছ। কার বউ এমন কথা নেই বার্তা নেই, দিন নেই ক্ষণ নেই টো টো করে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গা ঘুরে বেড়াতে রাজী হবে। সোজা বাপের বাড়ি এসে উঠে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলত।

কিন্তু ছোড়দিকে লেখা চিঠিতে শ্বেতাদি অনেক প্রাণের কথা জানিয়েছে। লিখেছে, সত্যি পারুল তোর কথা মনে পড়ে। সঙ্গে যদি তুই থাকতিস। আমাকে এখন দেখলে তুই সত্যিই অবাক হবি ভেবে, এই আমি ঘণ্টার পর ঘণ্টা মুখ বুজে বই নিয়ে পড়ে থাকতুম। আচ্ছা পারুল, তোর কি কলকাতা ছেড়ে আমার মতন এমন হঠাৎ হঠাৎ নতুন নতুন সব জায়গায় পাড়ি দিতে ইচ্ছে করে না? আমি এমন করে দিনে দিনে বদলাব আর তোকে যা দেখে এসেছি, তুই ঠিক তেমনটি থাকবি? সেই রকম ছেলেমানুষ আর ভীতু ভীতু। কি বল?

হাসি পায় তার। একবার দেখুক না এসে ছোড়দিকে শ্বেতাদি। এই কলকাতার মধ্যে বদ্ধ থেকেও কি আশ্চর্য পালটিয়েছে ছোড়দি। ছোড়দির এই পরিবর্তন বাবার মৃত্যুর পর থেকে সে নিঃসাড়ে লক্ষ্য করে এসেছে। এ যেন ঠিক সময়ের ইতিহাসকে নিপুণ সাবধানতার সঙ্গে অনুধাবন। একটি মেয়ের জীবনের অতি সাধারণ স্বাভাবিক ঘটনার ভিতর দিয়ে তার চলাফেরা, কথাবার্তা, নিতান্ত তুচ্ছ কথাবার্তার মধ্যে তার দৈনন্দিন জীবনের যে অলক্ষ্য ওঠাপড়া, তাকে লক্ষ্য ক'রে সময়ের যে নিখুঁত

চুলচেরা বিচার তা তার মহৎ সত্যকে খুঁজে বার করার মত। আর এই অনুসন্ধানে তার কৌতূহল ও অফুরন্ত উৎসাহ তাকে কোন অজ্ঞাতে বাঁচবার প্রেরণা জুগিয়েছে।

আচ্ছা, শ্বেতাদির জীবনের পরিবর্তন তো স্থানকালের পরিবর্তন। চোখের সামনে শুধু দৃশ্যপটের পরিবর্তন। কাল যেখানে ছিলুম, যেখানে সূর্যাস্ত দেখে বিহ্বল হয়েছিলুম, আজ সেখানে নেই, আমার উপস্থিতির অভাব হেতু কোন শূন্যতা মাত্র। আজ অন্যত্র কোথাও সূর্যোদয় দেখি, কিংবা গাছের মাথায় আকাশের রং-ফেরা দেখে ভিন্ন স্বাদের তৃপ্তি। শুধু বুঝতে পারি, উপলব্ধি করি সময় আমায় একটি নির্দিষ্ট স্থানের বিশেষ এলাকায় স্থির থাকতে দেয়নি। তার বেশি কি? পুরীর সমুদ্রতীরে যে শাড়ি পড়ে শ্বেতাদি একদিন সমুদ্রের ঢেউর ওঠাপড়া দেখেছে, সে পোশাকে দার্জিলিঙে গিরিশৃঙ্গের মাথায় সূর্যদেবের সলজ্জ রক্তিমাভ মূর্তি দেখেনি। বা দিল্লীর রাস্তায় স্বামীর অনুরোধ রক্ষার্থে যে পোশাকে হেঁটেছে বোম্বাই বা পঞ্জাবের রাস্তায় সেই বেশ ব্যবহার করেনি। একটি স্থা্বর অস্তিত্বকে বাইরের পোশাকে ঢেকে ভিন্নরঙে বৈচিত্র্যময় পরিবেশে নানাভাবে পরিবেশন করেছে। এর বেশি কিছু?

ছোড়দি এই ধুসর বিবর্ণ শহরের ধোঁয়ায় অন্ধকারে আলোয় বা অস্বচ্ছতায় নিজের অস্তিত্বকে নিবিড় ভাবে পরীক্ষা করে চলেছে। সংসারের যাঁতার চাপে, প্রেমের যন্ত্রণার ঠেলায় তার অস্তিত্বের ক্রমিক গতিশীল এক পরিবর্তন। শ্বেতাদি এখানে এসে সত্যিই কি বহুবছর আগে ফেলে যাওয়া পারুলকে ফিরে পাবে? শ্বেতাদি কি জানে ছোড়দির প্রেমের কথা? জানে নিপুর মেজদা কবে থেকে ঠিক ছোড়দিকে নিদারুণ ভালবাসার যন্ত্রণায় উদ্দাম নিক্ষেপ করেছে? আর ছোড়দি?

ছোড়দির নিজের দুর্বলতা যে ঠিক কবে থেকে তাকে বিশেষ একটি পুরুষের অস্তিত্ব ও অবয়ব সম্পর্কে উন্মন করে তুলছে তার সবকিছুর খুঁটিনাটি কিন্তু ছোড়দির কাছেও অজ্ঞাত। বাবার জীবিতাবস্থায় যার উপস্থিতি ছোড়দির কিশোরীজীবনের ক্ষুদ্র সীমাবদ্ধ গণ্ডীতে সমস্ত আবহমান নিয়মকানুন লঙ্ঘনের নিঃশঙ্ক বার্তা হয়ে আসত, বাবার মৃত্যুর পর সেই পুরুষটির নিয়মিত উপস্থিতি প্রথম প্রথম ছোড়দির মনে হয়েছিল এই

সংসারে তার বেঁচে থাকারই এক শর্ত। শুধু তাই বা কেন, বাঁচার দুর্লভ্য উপাদান কটির একটি নিঃসন্দেহে। কিন্তু তার পরে কি? মাঝে মাঝে সাহস করে সে-ও খুঁচিয়ে তুলেছে প্রশ্নটা, প্রায় মুখোমুখি না রাখলেও, ঘুরিয়ে জিজ্ঞাসা করার চেষ্টা করেছে। বলা বাহুল্য তার বাল্যের অনেক প্রশ্নের মত এই অতিসাহসিক প্রচেষ্টাকে হঠাৎ কোন এক উপেক্ষার ধমকে নিরুৎসাহিত করতে কোন অভিপ্রায়ই ছোড়দির অর্ধসলজ্জ দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করেনি। বরং মুখেচোখে কেমন একটা অস্বস্তিকর প্রকাশ ফুটে উঠেছে। আর পরক্ষণে মুখ রক্তিমাভ হয়ে উঠেছে ঈষৎ; প্রশ্নের ইঙ্গিতে হঠাৎ সচেতন হয়ে কি? সে আর কোনদিন সাহস করেনি। ভেবেছে নির্বিকার নির্বিরোধ দর্শকের ভূমিকাই তার পক্ষে শ্রেয়। এই সংসারে এমন দুয়েকটি ব্যাপার আছে যা প্রথম দর্শনে নিতান্ত সরল ব্যাখ্যাতেই চুকিয়ে দেয়া যায়, তাদেরই এমন জটিল করে তুলতে পারে ছোড়দির সমস্ত তুচ্ছাতিতুচ্ছ ব্যবহার, কথা, দৃষ্টি বা বহুসময়ের অসহ্য নীরবতা যে, তাকে মাথা চুলকিয়ে প্রসঙ্গান্তরে যেতে হয়।

তবু সেই একটি সন্ধ্যার ঘটনাই তো অনেকখানি।

বাবার মৃত্যুর পর প্রায় দিন পনেরো কুড়ি কেটেছে। সমস্ত বাড়িটার আবহাওয়া নিতান্ত প্রিয়জনের বিয়োগব্যথার শোকার্ত মনোবেদনার যন্ত্রণায় যে নিশ্চল মাত্র তাই শুধু নয়, কি নিদারুণ নিঃসম্বল নিঃসহায়তায় অনির্দিষ্ট সময় কালের জন্যে মুহ্যমান। একটি লোকের মৃত্যু কেমন করে যেন অনেকের মৃত্যু ঘটিয়ে গেল। দুখানি ঘরের একখানিতেও বহুক্ষণ, সন্ধ্যা উত্তীর্ণের পরও কেউ আলো জ্বালে না। এ-বাড়ির আর কটি জীবিত প্রাণী যেন বাকিজীবন অন্ধকার চেয়ে চেয়ে সময় ফুরিয়ে দেবে। আলো জ্বাললেই মুখ দেখা যাবে। তাতে বুঝি লজ্জা আরো প্রকট হয়ে উঠবে। কী এক অন্যায় কাজের অনুশোচনায় সবাই অন্তরে অন্তরে দগ্ধাচ্ছে। মৃত্যুব্যথার শোক শুধু এ নয়। একজনের মৃত্যু আর কটি প্রাণীকে সংসারের কাছে জবাবদিহি করার কঠিন দায়িত্ব থেকে বুঝি কোনদিনই মুক্তি দেবে না। একটি মৃত্যুর জন্যে শোক, আর্ত শোক নয়, অনুশোচনা, গভীর অনুশোচনা যেন প্রত্যেকটি অর্থহীন মুহূর্তে গ্রাস করছে কটি প্রাণীকে।

সেদিনের সেই সন্ধ্যায়ও কোন ব্যতিক্রম ঘটেনি। মা মেঝেতে কাপড়ে সমস্ত শরীর মুখ ঢেকে পড়ে আছে। সাদা কাপড়ে ঢাকা নিশ্চল নিষ্প্রাণ দেহের একটা কফিন। মা যে-জায়গাটায় শুয়ে ছিল মেঝের ঠিক ওই জায়গায় বাবার মৃত্যু হয়। বাবার মৃতদেহ অনেকক্ষণ ওখানে শুয়ে ছিল। শায়িতাবস্থায় মাকে দুর থেকে দেখে মনে হতে পারে সত্যিই নিঃশ্বাসের ওঠাপড়া নেই। যেন নাকের কাছে কান পেতে শুনতে চায় জীবন্ত মানুষের তপ্ত নিঃশ্বাস ফেলার শব্দ, বা গায়ের ওপর আস্তে হাত রেখে অনুভব করার প্রয়োজন যে হৃদপিণ্ডের উত্থানপতন বাবার মৃত্যুর পরও কি মা'র শরীরে জীবনের সবচেয়ে বড় প্রমাণ এখনও নিশ্চিহ্ন করেনি।

তক্তপোশের ওপর দেয়াল ঘেঁষে বিছানা গোটান। আর বিছানার গা-ঘেঁসে ছোড়দি বসে ছিল। একটি পা মেঝেতে ঝোলান আরেকটি পা ভাঁজ করে ওপরে রেখেছে। আর হাঁটুর ওপর দুটি বাহু আড়াআড়ি রেখে মুখ ঢেকেছিল তাদেরই গহ্বরে। মাথার পিছন দিকে ঘরের দুটি জানালার অন্ততমটি খোলা। সেই খোলা জানালার উন্মুক্ত পথে বাইরের শহরের ক্ষীণ ম্রিয়মান আলোটুকুর প্রবেশই একমাত্র স্বচ্ছতা।

অতীশদা এই সময়ে পা দিয়েছিল ঘরে। ঘরের দুটি প্রাণীর একজন অনেকক্ষণ কিছু টের পায়নি, অন্যজন টের পাওয়ার পরও কিছুমাত্র সচকিত হয়নি। অতীশদা আলো জ্বালার প্রয়োজন বোধ করেনি। ছোড়দির পাশটিতে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল। তাঁর নীরব উপস্থিতি ছোড়দি টের পেয়েছিল। ছোড়দির পিঠে ডান হাতটি রেখে অতীশদা অনুভব করেছিল কান্নার এলোপাথার অসংখ্য ঢেউএর ওঠানামা সারা পিঠ বেয়ে। পিঠে হাত রাখার সঙ্গে সঙ্গেই কান্নার গতিবেগ হঠাৎ বেড়ে গেল, তাও অনুভব করেছিল অতীশদা। তারপরও কয়েক মুহূর্ত নীরব থেকে অতীশদা খুব স্বচ্ছ কণ্ঠে পরিষ্কার ডেকেছিল ছোড়দির নাম ধরে—পারুল। প্রথম বারের ডাকেই সাড়া মিলবে এমন নিশ্চিতি ছিল না। ফের ডেকেছিল একই ভাবে—পারুল। ছোড়দি নড়ে বসেছিল একটু, সময় নিয়েছিল। তারপরে সাড়া দিয়েছিল—বলুন—

বলব কি—দেখছিলুম তুমি জেগে আছ না ঘুমুচ্ছ—

বসে বসে কেউ ঘুমোয় না কি ? মুখ না-তুলেই ধরাগলায় উত্তর দিয়েছিল ছোড়দি।

কেউ না ঘুমোয় তুমি তো পার। আর আমি তো ট্রামে দাঁড়িয়ে ঘুমোই—

ছোড়দির পরিবর্তন কিন্তু তখনও লক্ষ্যণীয় মনে হয়নি অতীশদার। ফের বললে : আচ্ছা, কেন চোখ তুলছ না বলব, চোখে আঁচল চেপে মুখের বাষ্পের উত্তাপ লাগাতে চায় ছোড়দি। যেন কিছু একটা চোখের মধ্যে পড়েছে, এমনই ভাবখানা।

ওসব কিছু নয়। আসল কথা চোখ দুটো ফুলে ফুলে বেশ বড় হয়েছে। লোকে তো ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে চোখ ফোলায় শুনেছি, তুমি কি আজকাল ঘড়ি ধরে কাঁদছ না কি ?

এমনি করে প্রথম আড়ষ্টতা থেকে মুক্তি পেয়েছিল ছোড়দি সলজ্জ হাসির স্বল্প প্রকাশে। পরে একসময় বুঝতে পেরেছিল ছোড়দি এতখানি সাহস সঞ্চয় করতে যে-সময়ের প্রয়োজন, অনেক ধৈর্য ধরে অতীশদা সেই সময় পার হয়ে এসেছে।

কয়েকটি লঘুকথার ব্যবহারে থমথমে আবহাওয়া হাল্কা করার কৌশল অতীশদা কি ভাবে আয়ত্ত করেছিল, কেমন করে তা সে-ই জানে। ছোড়দিকে শেষ পর্যন্ত মাথা তুলতে হয়েছিল, অতীশদার সোজা কটি কথার জবাবও দিতে হয়েছিল। ঘরে অন্ধকার এবার ঘন হতে শুরু হয়েছে। আর কিছুক্ষণ পরে মুখ দেখা যাবে না কারও। ছোড়দি যেখানে বসে ছিল তার হাত কয়েক তফাতে পা-ঝুলিয়ে বসল অতীশদা।

দেখ পারুল, এমনি করে আর সময় নষ্ট কোরো না। বইপত্তর গুছিয়ে আবার লেগে যাও উঠে পড়ে—

কি যে বলেন—ছোড়দির কণ্ঠস্বরের ম্লানতা অনুভব করা যায় মাত্র এই ঘনায়মান অন্ধকারে। মুখের চেহারা ধরা পড়ে না।

মানে ? অতীশদার কণ্ঠে উষ্ণ জিজ্ঞাসা।

আবার সেই কেঁচে গণ্ডুষ ?

দরকার হলে তা-ই করতে হবে, অতীশদার অসহিষ্ণু কণ্ঠে প্রায় আদেশের সুর।

আপনি কি ঠাট্টা করছেন।

ঠাট্টা? অতীশদার কণ্ঠস্বরের তীক্ষ্ণতা ছোড়দিকে নিশ্চয় স্পর্শ করেছিল।

কি করে সম্ভব বলুন—অনতিবিলম্বে কথা বলেছিল ছোড়দি। কণ্ঠের স্বরে নৈরাশ্য কিছুমাত্র ঢাকা থাকেনি।

কোনটা সম্ভব আর কোনটা অসম্ভব তাও কি তোমার কাছে আমায় শিখতে হবে, না তোমার আগে আমিও ভাবিনি কথাটা। অতীশদার কথার তিরস্কারে ছোড়দিকে আনত মুখে নীরব থাকতে হয়েছিল, যতক্ষণ না অতীশদা ফের কথা বলেছিল।

আর তর্কই যদি কর তো আমার আসার আর কোন প্রয়োজন নেই, এই নির্লিপ্ত কথাগুলিতে অতীশদা বেশ একটা মোচড় তুলেছিল।

বাবার মৃত্যুর পর যার নিয়মিত দেখাশোনা এ-সংসারের তিনটি প্রাণীর কাছে প্রায় আশীর্বাদের মত, বেঁচে থাকার প্রতিটি মুহূর্তের আশ্বাসসম, তার এ-জাতীয় উক্তির কপটতা ছোড়দিকে মোটেই দুশ্চিন্তায় ফেলেনি।

শেষকালে ভয় দেখিয়ে কাজ আদায় করবেন—মুখ না-দেখা গেলেও কণ্ঠের উক্তিতে বোঝা গিয়েছিল ছোড়দি এক মুহূর্তে সব কিছু হাল্কা সহজ করে তুলল—

তা হলে বোমাবারুদেরই জয়—মানছ তো?

হেসে ফেলেছিল ছোড়দি। অতীশদা জায়গা ছেড়ে উঠে দাঁড়াল প্রস্থানোদ্যত হয়ে।

ছোড়দিকে এর কয়েকটা দিন পরেই পড়াশুনো শুরু করতে হয়। আজকের এই বিশ্বাসের মত সেদিনও ছোড়দিকে নিশ্চয় অনুভব করতে হয়েছিল সে পড়াশুনো শুরু করছে দীর্ঘ বিরতির পর, শুধু কি এক কঠিন আদেশের অঙ্গুলিনির্দেশে না অন্য কোন এক কিছুর সুনিবিড় টানে? ছোড়দির লেখাপড়ার জন্যে একরোখা ইস্কুলমাস্টার বাবার কাছে লাজুক স্বল্পভীরু নিপুর মেজদার এ তো কোন অনুরোধ নয়; পারুলকে অতীশদার এ এক নির্ভীক তীক্ষ্ণ জিজ্ঞাসা।

মা'র ঘুম ভেঙেছিল। ঘরে তখন আলো জ্বালার আয়োজনে ছোড়দির ব্যস্ততা লক্ষ্য করেছিল মা। ঘুমে কি মা সত্যিই প্রাণহীন

হয়ে পড়েছিল কয়েক মুহূর্ত। না, ছেঁড়াছেঁড়া কাটাকাটা কথা দুয়েকটি কানেও গিয়েছিল? মা'র নীরবতা কি তবে সবটাই ছলনা...অর্থাৎ নিদ্রার ভান? বেশ লাগছিল মা'র দুজনের ভাঙাভাঙা কথা কটি। যেন বুঝি বিরতি বা বিচ্ছেদ চায়নি ওই বাক্যালাপে। ওরা দুজনে কথা বলুক—যতক্ষণ ওদের কথা না-ফুরোয়, বলবার শেষ কথাটিও অকথিত থাকবে না। মা ওদের সময় দেবে। অতীশদা ছোড়দি, ওরা সময় চায়? না না, হয়তো এসব কিছুই নয়। মা'র শরীর মনের অবসন্নতা হয়তো, জীবনের কোন সমস্যাকেই আর খতিয়ে বিশ্লেষণ করতে চায় না। মা'র এই নিস্তব্ধতা ও ঐকান্তিক নির্লিপ্ততা খুবই স্বাভাবিক—বর্তমানে সহজাত। নির্জীব হয়ে পড়ে ছিল মা মেঝেতে তাই নিরবচ্ছিন্ন অবকাশে। যেন হঠাৎই সজাগ হয়েছিল আচমকা কোন শব্দে...

ভাবনার স্রোত তাকে ঠেলে নিয়ে গিয়েছিল অনেক পিছনে। মাথা তার ভারসাম্য হারিয়ে নিচে নেমে এসেছিল। হাত থেকে আলগা হয়ে পড়ে গিয়েছিল ছবি দুখানা। যে ছবি দুখানাই সে গভীর মনোযোগসহ বিচার করছিল কিছু সময় আগে। ছবির লোকগুলোর দিকে চোখ মেলেছিল অচপল আর তাদের বহুবিস্মৃত হারিয়ে-যাওয়া কণ্ঠস্বর ফিরিয়ে আনতে সচেষ্ট হয়েছিল প্রাণপণ। ঠিক তন্দ্রা নয়, তন্দ্রাচ্ছন্নভাব—এমনই অবস্থায় এক অর্ধচেতন মনের ধারাবাহিক আলস্যসুখ। বেশ লাগে পড়ে থাকতে। অস্পষ্ট কথা সব ভেসে আসে কানে। যেন এ-বাড়ির লোকদের কণ্ঠস্বর নয়, কোন দূর বাড়ির ছাদে দাঁড়িয়ে দুটি মেয়ে কোথায় বাক্যালাপ করছে, তাদের কথাই আংশিক কানে আসছে। একবার উঠে গিয়ে ওদের মুখ দেখে আসতে ইচ্ছে করে। কিন্তু আলসেমি বাধা হয়েছে। অথচ স্বল্পসচেতন মুহূর্তের অবকাশেই জানা যায় আসলে কণ্ঠস্বর ছোড়দিরই অথবা মা'র। পাশের ঘরের বা তারও পরের ঘরের ওপাশে খোলা রান্নার জায়গা থেকে কটি কথা দেয়াল-দরজার বাধা পার হয়ে বা সোজাসুজি তার পায়ের দিকের সরু টানা বারান্দা ধরেও আসতে পারে। হঠাৎ একপাশে থেকে থেকে একটি পা অসাড় মনে হওয়ায় তোলবার চেষ্টা করতে হয় তাকে। তারপর টান করে ছড়িয়ে দেবার চেষ্টা মাত্রই বুড়ো আঙুলের

ডগায় লেগে কি একটা পড়ে গেল। চোখে না-দেখে পতনের শব্দে আন্দাজ হয় কোন একখানা পাতলা বই সম্ভবত পড়ল বুক-সেল্‌ফটা থেকে। আবার কখনো এমনও হয়, মাথার ডান দিকে কি বাঁ-দিকে কোন জায়গায় সিগারেটের প্যাকেট আর তার মাথার ওপর দেশলায়ের বাক্স আছে, তন্দ্রাচ্ছন্ন মুহূর্তে তাদের অবস্থানের কথা মনেই থাকে না। ডান হাতখানা সামনের দিকে ছড়িয়ে মেলে দিতে গেলেই কটি আঙুলের টোকা লেগে মেঝেতে পড়ে যায় দেশলায়ের বাক্সটা। চোখের সামনেই পড়েছে, চোখ মেললেই দেখা যাবে। তবু না ইচ্ছে করে চোখ মেলতে, না ঝুঁকে পড়ে হাত বাড়িয়ে তুলতে। শুধু অসীম আলস্যে যা ঘটেছে তাকে তুচ্ছ করে পাশ ফিরে শুলেই এই মুহূর্তের অগাধ নীরবতাকে অব্যাহত রাখা যায়। সে তাই করে।

॥ ২ ॥

কিন্তু বেশিক্ষণ একভাবে পড়ে থাকতে পারে না। কানের মধ্যে কেমন সুড়সুড় করে ওঠে। উপুড় অবস্থাতেই বাঁ হাতের একটা আঙুল দিয়ে কানের এই অস্বস্তি মুক্ত করতে চায়। কিন্তু ফের ওই একই ভাবে কানের মধ্যে সুড়সুড় করে ওঠে। ছোড়দি বা স্মৃতির নিত্য নতুন জ্বালাতন করার পদ্ধতিতে সে একেক সময় হঠাৎই ক্ষেপে ওঠে। বোঝাতে পারে না যে অনেক সময়ে ছোড়দিকে বা হয়তো স্মৃতিকে কেন্দ্র করেই ভাবনার যে জাল মন্থর বুনে চলেছিল খুব সাবধানে, অতীতের বা বর্তমানের এমন কি অনিশ্চিত ভবিষ্যতেরও নানা জায়গা হাতড়িয়ে, তখন স্মৃতি বা ছোড়দিই স্বহস্তে সেই মৃদুমন্থর বুননকে ছিন্ন করেছে। সে এবার চালাকি ধরবার সম্পূর্ণ অভিপ্রায়ে স্বল্প মুহূর্ত নিষ্ক্রিয় থেকে চকিতে হাতখানা ঘুরিয়ে কানের কাছে এনে খপ করে ধরে ফেলে একখানা হাত। হাতের সুপুষ্ট নরম মাংসল কব্জি তার পাঁচ আঙুলের কঠিন আয়ত্তে এলে সে মুহূর্তের অনুভবেই বুঝতে পারে এ-হাত ছোড়দির হতে পারে না, স্মৃতিরও নয়—এত চুড়ি স্মৃতির হাতে থাকে না। পিছন ফিরে ধড়মড় করে উঠে বসতেই দেখে স্বয়ং শ্বেতাদি। আঁচলের ডগাটা সরু করে পাকিয়ে কানের মধ্যে সুড়সুড়ি দিচ্ছে। প্রথমে সলজ্জ ভাব খানিকটা তার মুখে চোখে লেগে থাকে। শ্বেতাদির মুখের দিকে তাকিয়ে অনুমান করে শ্বেতাদিও আন্দাজ করেছে তার মনোভাব। তারপর তার মুঠি থেকে শ্বেতাদির কব্জি আলগা হয়ে ঝুলে পড়লে, সে-ই প্রথম কথা বলল: সত্যিই মোটা হয়েছ তুমি।

নিজের অস্বস্তি নিজের মধ্যে বেশ টের পেয়েছে সে এতক্ষণে।

শ্বেতাদি খুব স্বাভাবিক হেসে বলে, সত্যি বলছিস? ভীষণ?

ভীষণ আর কি, তবে বেশ মুটিয়েছ ; এবার অনেকখানি সহজ ও স্বাভাবিক হয়ে কথা বলতে পারে সে।

তবু তো তোর মতো দিবানিদ্রা নয়—অনেক পুরোনো দিনের অতি স্বাভাবিক ভঙ্গিতে অন্তরঙ্গ কণ্ঠে বলল শ্বেতাদি।

সে অনুভব করল ভিতরে, তার অস্বস্তির অনেকখানি কেটেছে। শ্বেতাদির কণ্ঠের স্বাভাবিকতাই তাকে কিছুটা সহজ স্বাভাবিক করে তুলেছে।

চিন্তার এই সামান্য বিরতির পর সে আবার বলল, নিজের চেহারাটা ভাল করে দেখেছ আয়নায় ?

না তা কি আর দেখেছি।

দেখলে আমায় অন্তত একটু করুণাও করতে।

তোকে আমি করুণা করব—বাব্ বাঃ!

একটু ঘুমুতেও দিতে পারতে।

না আজ দয়া করুণা কিছু নয়—হঠাৎ প্রগলভ হয়ে ওঠে শ্বেতাদি, এতদিন পরে আসছি কোথায় অভ্যর্থনা টভ্যর্থনা না সব—পড়ে পড়ে দিবানিদ্রা—

কিন্তু অভ্যর্থনাসমিতির সম্পাদিকা তো তোমার ওঘরে—

শ্বেতাদি পা টিপে-টিপে তার ঘরের ও-পাশের ঘরের মধ্যবর্তী দরজার কাছে এগিয়ে যায়। ভেজানো দরজা বাতাসে অল্প ফাঁক হয়ে পড়েছে। শ্বেতাদি সেখানে দাঁড়িয়ে পাশের ঘরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে। এবার শ্বেতাদির দেহের সম্পূর্ণ সে পিছন স্পষ্ট অনুমান করতে পারে।

আগের থেকে অনেক ভারী হয়েছে শ্বেতাদির চেহারা। ঘাড়ের মাংস যেন একটু বেশিই ঠেকে চোখে। পুরু পিঠের ওপরে সৌখিন সিল্কের ব্লাউজ এঁটে বসে আছে। ঘাড়ের শুভ্রতার জন্যে ভালই লাগছে জামার চড়া রং। কোমরের তলা থেকে গুরুনিতম্ব যেন একটু কটু ঠেকল তার চোখে হঠাৎই অকারণ। শ্বেতাদির সারা অবয়বের এই দ্রুত পরিবর্তনই তার অহেতুক অস্বস্তির কারণ। সে কি এই বিশেষ কারণেই অপ্রতিভ হয়ে উঠেছিল শ্বেতাদির হাত চেপে ধরে। যেন সম্পূর্ণ অপরিচিতা কোন মহিলার হাত বিশেষ পরিচিতা কার মনে করে নিদ্রাচ্ছন্ন অবস্থায়

ধরে ফেলেছে। সত্যিই প্রথমটা যে একটা অস্বস্তি তাকে আচমকা চেপে ধরেছিল এটা সে কিছুতেই মন থেকে তাড়াতে পারে না। আর এরই সঙ্গে শ্বেতাদির দৈহিক পরিবর্তনের সম্পর্কটা যুক্ত করতে যায় যখন, একটা মানসিক পীড়নের অনুভূতি তাকে থেকে থেকে বেশ কটি মুহূর্ত জ্বালা দেয়। কিন্তু স্বাভাবিকও যে হঠাৎই হয়ে-ওঠা যায় তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ তো শ্বেতাদির চিরদিনের অন্তরঙ্গ কণ্ঠস্বর ও কথা—এমন কি দুয়েকটিও।

ছোড়দিকে ঘুম থেকে তোলার জন্যে কিছুমাত্র সাধ্যসাধনার প্রয়োজন হল না শ্বেতাদির। এটাও কম আশ্চর্যের কথা নয়। সে পাশের ঘর থেকে ভেজান দরজার সরল রেখার মতো লম্বা ফাঁক থেকে দেখতে পেল শ্বেতাদি মেঝের ওপর উবু হয়ে বসে পড়েছে। ছোড়দির মুখ ঢাকা পড়েছে তার দেহের আড়ালে। শুধুমাত্র কোমর থেকে পায়ের পাতা পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে।

এই ওঠ...এই পারুল, শ্বেতাদির কণ্ঠস্বর নিশ্চয়ই তার কানে যাবার কথা। গিয়েছিলও। কিন্তু দুপুরের গাঢ় ঘুমে তখন তার দুচোখ জড়ান। শরীরও প্রায় নির্জীব। তাই অবাঞ্ছিত শব্দের প্রতিবাদে পাশ ফিরতে যায়, ঘুমন্ত অবস্থায় শরীরটা একটু বেঁকিয়ে শাড়ির প্রান্তটুকু এক হাত দিয়ে টেনে টেনে নামিয়ে দু পায়ের পাতা পর্যন্ত ঢেকে দিতে চেষ্টা করে।

কিন্তু পুরোপুরি পাশ ফিরতে পারে না ছোড়দি। শ্বেতাদি এক হাত দিয়ে বাধা দেয়। একটু জোর যে করে না তা নয়, কিন্তু ও-পাশ হতে পারে না। তারপর একটু বিরক্তির ভঙ্গিতে অল্প অল্প করে চোখ মেলে। আর এর ঠিক একটু পরেই দুহাতের তালুতে চোখ রগড়াতে রগড়াতে সটান একেবারে উঠে বসে।

কোথায় বিরক্তি আর ঘুমের আলসেমি। এক মুহূর্তে মুখে অনেক পুরনো দিনের ভাবভঙ্গি সব ফুটে ওঠে একজোটে। মুখ চোখের চেহারাই পালটে যায় ছোড়দির। নিমেষেই ছোড়দির মুখের সমস্ত খুশির অকৃত্রিমতা সে ধরতে পারে। শ্বেতাদির দুটি বাহু ভর করে

ছোড়দি উঠে বসে সামনের দিকে ঝুঁকে। ঠিক অপ্রত্যাশিত অযাচিত কিছু পাওয়ার আনন্দ যেন ছোড়দিকে হঠাৎই মুখর করে তুলবে। দুজনের মুখেই অকৃত্রিম খুশির হাসি লক্ষ্য করল সে।

দরজার সামনে থেকে সরে এসে আবার উপুড় হয়ে পা ছড়াল নিজের বিছানায়। একটা সিগারেট বার করে ধরালো। প্রথম টানের সঙ্গে সঙ্গে একটু আরামের শব্দ করে যে পরিমাণ ধোঁয়াটুকু সে মুখের মধ্যে জমা করলে সেটুকু নির্গত হবার সময় একটি মাত্র চিন্তাই তাকে অবাক করল। তার বার বার মনে হল, কে বলবে না ওরা দুটি অভিন্ন সত্তা? কে বলবে শ্বেতাদি ছোড়দিকে ছেড়ে অনেক দূরে কাটিয়েছে এই এতগুলো বছর, শুধু মাঝে মাঝে চিঠি লিখে? মা'র অনেক দিনের কটি কথাই তার মনে পড়ে। মা বলেছিল শ্বেতাদিকে রং তোর যতো ফর্সাই হোক, পেটের মেয়ে হলি তুই। আর পারুল যে কথা কোনোদিন পারুলকে বলতে পারি না, তোকে না-বলে থাকতে পারি না কেন? শ্বেতাদিও তার শুভ্র মুখ, এখন চোখের সামনে ভাবে, মার মলিন ঘর্মাক্ত কাপড়ে কতক্ষণ গুজে রেখেছিল। মা শুধু আস্তে আস্তে শ্বেতাদির সারা পিঠে মাথায় হাত বুলিয়েছিল।

বেশ আয়েস করে টান দেয় ফের। ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে খানিকটা হাসিও বুঝি অজ্ঞাতে ছড়িয়ে দেয় দুচোখের কোণায়, ঠোঁটে, মুখের দুপাশে। ছোড়দির কথাটা ভেবেই হাসিটা আসে। এক ধরনের কথা চিন্তা যা বিনা চেষ্টায় মানুষকে হাসায়। তার এখনকার হাসির উৎসও তাই। ছোড়দিকে দুপুরের নিদ্রা থেকে তোলার কথা সে ভাবছিল।

দুপুরের খাওয়া সারতে সারতে ছোড়দি প্রায় দুটো একটা পার করে দেয়। আর খেতে বসে মা'র সঙ্গেই। মা'র কোন কথাই টেকেনি। মা'র ভাত বেড়ে, সব গুছিয়ে তারপর মুখোমুখি বসে নিজের খাওয়ার আয়োজন। কথায় গল্পে দুজনে এককে সময় মনে হতে পারে অনায়াসে দুপুরটা পার করে দেবে।

মা মাথাটা ওপরের দিকে করে পেতলের ঘটিটা থেকে আলগোছে জল ঢেলে খাবে। প্রায় আধ ঘটি। তারপর মেঝের ওপরটা কাপড়ের আঁচল দিয়ে পরিষ্কার করে নিতে নিতে ছোড়দির সঙ্গে টুকটাক দুয়েকটা

কথা কইতে কইতে সেই জায়গাটায় গায়ের কাপড়ের কিছু অংশ বিছিয়ে শুয়ে পড়বে নিশ্চিন্ত আরামের ভঙ্গিতে।

ছোড়দির যেখান থেকে হোক খুঁজে পেতে দু এক কুচি সুপুরি বা দুটো একটা লবঙ্গ মুখে ফেলা চাই। তারপর যে মোটা বইখানা দিন দুই তিন হল শুরু করেছে সেখানাই পেড়ে নিয়ে আসে দেয়াল সংলগ্ন তাক থেকে। তারপর খুঁজে বার করে সেই বিশেষ জায়গাটি যেখানে পাতা মুড়ে ভাঁজ করে রেখেছে। হয়তো লক্ষ্য করলে দেখা যাবে সেই পাতাখানারই একটু আগে কি পরে রবার স্ট্যাম্পের ছাপ রয়েছে, দয়া করিয়া পাতা মুড়িবেন না।

ধোঁয়া ছেড়ে সে ফের হাসে।

পড়তে পড়তে কখন এক সময় গাঢ় ঘুমে নিজেকে হারিয়ে ফেলে ছোড়দি পারিপার্শ্বিক সব কিছু ভুলে। ছোড়দির মুখের চেহারাটা তখন সত্যি দেখবার মতো হয়। হাত থেকে আলগা হয়ে মুখ থুবড়ে হাতের বইখানা পড়ে থাকবে বুকের কাছে কি কোলের কাছে।

আর অনেক অনেক দিন হয়তো এমনি সময় পড়ন্ত দুপুরের মুখে অতীশদা এসে হাজির হবে। বিকেলের চা না-খেয়ে উঠবে না। ভাবগতিকেই বুঝতে পারা যায় অতীশদার।

সাধারণত ছুটিছাটার দিনেই এমনটা ঘটে। সেও বাড়ি থাকে। ছোড়দিকে উদ্দেশ্য করেই হয়তো বলল তাকে অতীশদা—তাড়াতাড়ি ওঠার কোন চান্‌স আছে না কি?

আমার তো মনে হয় না, সেও বেশ চটপট উত্তর দেয় পাশের ঘর থেকেই অর্ধশায়িত অবস্থায়, প্রশ্নের তাৎপর্য উপলব্ধি করে।

কিন্তু উপায়, চা না-হলে যে আর চলছে না—

কানের কাছে চেঁচানো ছাড়া তো কোন উপায় নেই—

তা তুমিই একবার চেষ্টা করে দেখ।

অগত্যা তাকে উঠে আসতে হয় পেটের কাছে কাপড়ের গিঁট ঠিক করতে করতে।

সে ঘরে ঢুকে ছোড়দির মুখের দিকে তাকিয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে।

অতীশদা তাকে লক্ষ্য করে। পরে প্রশ্ন করে—ও বইখানা কি? আঙুল দিয়ে বইখানার অবস্থান দেখিয়ে দেয়।

বইখানা এমন অবস্থায় পড়ে আছে, ছোড়দির একটি বাহুর আড়ালে অর্ধাংশ লুপ্ত হয়ে, যে সে বেশ অনুমান করতে পারে ওখান থেকে বইখানা উদ্ধার করা আপাতত অতীশদার পক্ষে সম্ভব নয়। সে নিজেই নিচু হয়ে একটু সতর্কভাবে তুলে নেয় বইখানা। ছোড়দির কনুইটা এবার মেঝে স্পর্শ করে। ঘুম ভাঙার কোন লক্ষণ দেখা যায় না।

বইখানা সে সরাসরি অতীশদার হাতেই তুলে দেয়। অতীশদা মলাটটা উলটিয়ে প্রথম পাতাখানার ওপর একটু দৃষ্টি রেখেই স্বভাবসিদ্ধ হাসি হাসে। পরে ভাঁজ-করা একখানা পাতার ওপর চারটে আঙুল চেপে বইখানাকে উলটিয়ে তার হাতে দিয়ে বলে, ওই জায়গাটা কানের কাছে বেশ গলা ছেড়ে পড় তো—

সে যথাযথ আদেশ পালন করে। কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘুম ভেঙে যায় ছোড়দির। এপাশ ওপাশ করে করে কোন ফল হয় না। যে-দিকেই ফেরে সেই একই কণ্ঠস্বর। প্রথমটা ঠিক ধরতে পারে না। পরে বুঝতে পারে ব্যাপারটা বেশ একটা ষড়যন্ত্র। তারপরেই চেঁচিয়ে বাড়ি মাথায় করে, দিয়ে দে বলছি আমার বই, ভাল হবে না...

ভাল যে হবেই এটা বলেছে কে, পিছন থেকে অতীশদা হাসি চেপে বলে।

আর যায় কোথায়। চকিতে পিছন ফিরে অতীশদার দিকে তাকিয়ে ছোড়দি এবার শুরু করে, থামুন থামুন আর কথা বলবেন না, একজনের সাধ্যে কুলোয় না দশজন মিলে আড়ে হাতে...হাই তুলতে তুলতে হাত দিয়ে মুখ ঢাকা দেয়, মুখে বিরক্তির ভাব টেনে আনে, কথা আর শেষ করে না।

আগেকার মতো গম্ভীর ভঙ্গিতেই হাসি চেপে অতীশদা ফের বলে, তা বিপদ সে রকম হলে দশজন কেন একশোজনও ডাকতে হয়—

ডাকুন আপনারা যত জন পারেন ডাকুন...চা এখন হবে না, পিঠের ওপর থেকে খোলা আলগা চুল গোটাতে গোটাতে ছোড়দি বাইরে চলে যায়।

অতীশদা এবার হাসে তার দিকে চেয়ে। সে অতীশদার মনোভঙ্গি বুঝতে পারে। একটুও দেরি হয় না তার। ছোড়দির নির্ভেজাল

সারল্য ও সহজাত ছেলেমানুষীই অতীশদাকে টেনেছে এত বেশি করে। ছোড়দিকে এমন করে ক্ষ্যাপানোর মধ্যে অতীশদা ছোড়দির ঘনিষ্ঠ নিবিড় সান্নিধ্যটুকুর উত্তাপ অনেক তফাতে দাঁড়িয়ে বা বসেও অনুভব করে। সে তো একরকম নিঃসন্দেহেই তাই ভাবতে পারে এখন।

আবার অনেক সময় হয়তো শুয়েছে বালিশের নিচে সংসারের হিসেবের খরচের খাতা নিয়ে। বালিশের তলা থেকে খাতার খানিক অংশ বেরিয়ে থাকে। নিতান্ত আলগোছে সুকৌশলে অতীশদা কোন সুযোগ সুবিধের মুহূর্তে খাতাখানা টেনে নেয়। ছোড়দি নেড়েচেড়ে একটু সজাগ হতে গেলেই অতীশদা কানের কাছে পড়তে শুরু করে, দুধ দশটাকা বারো আনা, ধোপা চারটাকা, খবরের কাগজ পাঁচটাকা সাড়ে দশআনা, স্মৃতির ছোটমামা ছোট মামীমার জন্যে বাড়তি খরচ পাঁচটাকা...ছোড়দির এরপর আর বেশিক্ষণ ঘুমের ধৈর্য থাকে না। গায়ে পিঠে সামান্য এলোমেলো কাপড় গোছাতে গোছাতে উঠে বসে, সামনে হাত বাড়িয়ে খাতাখানা ফেরৎ চায়, অধৈর্য কণ্ঠে বলে—পড়বেন না বলছি...কেন পড়ছেন...ভাল হবে না দিয়ে দিন খাতাটা...না ভারি অন্যায়...তারপরে হয়তো হাল ছেড়ে দেবার ভঙ্গিতে বলে, যা খুশি করুন....আমি হিসেবের আর কিচ্ছু জানি না।

ঠিক আছে। এবার থেকে আমিই হিসেব রাখব।

রেখে তো উল্টে যাবেন।

তা বলে যা তা সব খরচ হবে।

ছোড়দি বাধা দেয়—যা তা খরচ কি? তবে তার মুখ দেখে মনে হয় অতীশদার কণ্ঠের হাল্কা সুরটুকু সে বেশ ধরতে পারে কিন্তু।

এরপরই অতীশদা বলে, যা তা নয়তো কি? স্মৃতির ছোটমামা ছোটমামীর জন্যে বাড়তি খরচ পাঁচটাকা, আর এ মাসে সিনেমাই তো সাতটা।

ছোড়দির মুখ থেকে ফস করে বেরিয়ে পড়ে, কি মিথ্যুক—তারপরই নিজেকে চকিতে সামলে নিয়ে বলে, এত মিথ্যে কথাই বলতে পারেন—

মানে? অতীশদা ফের জের টানতে চায় অনেক কথা পেড়ে। ছোড়দি একটি কথাও যাতে কানে না-যায় সে কারণে কানে আঙুল

দিয়ে থাকে। কিছুতেই অতীশদাকে আর একটি কথাও বলতে দেবে না। পরে প্রথা মতো ঘরের বাইরে চলে যাবে কপট ক্রোধের ভাব ছড়িয়ে সারা মুখে ক্ষণিকের জন্যে।

অনিন্দ্য খুব ভালই অনুমান করে অতীশদা বেশ পরিষ্কারই জানে ছোড়দি উপভোগ করে এই হাল্কা হাসিঠাট্টার মুহূর্ত কটি। অতীশদার বাইরের কর্মময় নিঃস্বার্থ জীবনটার সঙ্গে এইরকম অনেক হাল্কা তুচ্ছ, অতি তুচ্ছ লঘু অর্থহীন হাসিঠাট্টার মুহূর্তগুলো যুক্ত করে অতীশদার মনের অনেকখানি কিন্তু নাগাল পাওয়া যায়। অনেক দুর পর্যন্ত ছোঁয়া যায়।

আসলে ছোড়দির অসুবিধেটা কোথায় তা তার ভালই জানা। ছোড়দির যত লজ্জা তার ওই হস্তাক্ষর নিয়ে। তার হাতের লেখা কেউ অনেকক্ষণ দিনের আলোয় স্পষ্ট চোখ মেলে পড়ছে এই চিন্তাটাই তাকে লজ্জায় আনতমুখ করে রাখে। ছোড়দি হয়তো ভুল করে লিখে বসে আছে। আর অতীশদার সন্ধানী চোখ দুটিকে ও এড়াতে পারে না। আর যে-মুহূর্তে অতীশদা এটা আবিষ্কার করবে সেই মুহূর্তে ছোড়দিকে তৈরী হতে হবে একটি ছোটখাট পর্বের জন্যে।

তার কিন্তু নিগূঢ় বিশ্বাস অতীশদার এই সমস্ত নিতান্ত তুচ্ছ, আচমকা ও অনেক সময়ে প্রায় অর্থহীন নানা কথা ও ব্যবহারে ছোড়দি হয়তো নিজেরই অলক্ষ্যে জীবনের ক্ষয়িষ্ণু বিলুপ্তপ্রায় অর্থের অনেকখানি আস্তে আস্তে ফিরে পেয়েছে। প্রায় বিনা নোটিশে বাবার দুঃসহ মৃত্যু ছোড়দির মনে যে ভাঙন ধরিয়েছিল সেই ভাঙনে ধীরে ধীরে কবে থেকে যে জোড় লাগতে শুরু করেছে, ছোড়দির সম্পূর্ণ অলক্ষ্যে প্রায়, তার চেহারাটা চোখের সামনে আজ কেমন যেন পরিষ্কার হয়ে উঠছে। অথচ তার বাঁচার প্রেরণার উৎসে কি ছিল, এ প্রশ্ন আজ ছোড়দিকে করলে সঠিক উত্তর কিছু মিলবে? তাই তো, কোথায় এর উৎস, হয়তো গালে হাত দিয়ে ভাবতেই বসে যাবে ছোড়দি। জীবনে অনেক তুচ্ছ ও নিতান্ত অবহেলার অসংখ্য সামগ্রী বহুসময়ে কি নির্বিঘ্নেই যে সোনা ফলায়, আর মানুষ কি অনায়াস অবহেলায় অক্লেশে পীড়া দেয়। আর বাস্তবিকই একটি বছর মাসের এই একটানা ক্লান্তিকর ইতিহাস ছোড়দির জীবনে ঢেউ ওঠাপড়ার যে চিহ্নগুলো ক্ষতের মতো ছড়িয়ে গেছে, স্বচক্ষে

একটি একটি করে না-দেখলে সে কি এই সরল সত্যটাকে কোনদিন এমন করে বিশ্বাস করতে পারত। শুধু চোখের দেখাই বা কেন, তার হৃদয়ের অনির্বাণ যন্ত্রণায় ছোড়দির বেদনাগুলো একটির পর একটি পুড়ছে।

যাকে ঘুম থেকে তোলা নিয়ে এত কথা, চিন্তার স্রোত এভাবে তাকে নানা ভাবনার জট খোলাতে খোলাতে বহু পিছনের কোন একটা নিদ্রা ত্যাগ করে হঠাৎই কখন মুখর হয়ে উঠেছে। প্রতিবাদ বা আপত্তির ক্ষীণ শব্দটুকুও তার মুখ থেকে বেরুল না। সত্যিই শ্বেতাদির এটা একটা বিজয়গর্বের অহঙ্কার।

শুধু একটিবার মাত্র বাধা দিয়েছে, তারপর উঠে বসে চোখ রগড়ে অবিশ্বাস্য দৃষ্টি মেলে যেন একটা স্বপ্নকেই তাড়াতে চেয়েছে। ভাবতেও মজা লাগে এতদিনের এই বেশ কটি বছরের দীর্ঘ ব্যবধান তারা এমন সহজে কি করে সংক্ষিপ্ত করল। ছোড়দির আর শ্বেতাদির পক্ষে সবই সম্ভব। এই বন্ধুত্বকে অরুদি কত ঈর্ষা করেছে, অঞ্জন সন্দেহের চোখে দেখেছে হয়তো। বয়স যখন তার অল্প ছিল তখন ভেবে খুব দুঃখ পেত, এখন মজাই পায় বেশি।

কথায় কথায় কোথা থেকে যে কোথায় চলে যেতে পারে তা অনুসরণ করা কারো সাধ্য নয়। আচ্ছা, নিপুর সঙ্গে হঠাৎই যদি তার পাঁচ সাত বছর পর দেখা হয় সে কি পুরনো আলাপের কথায় এমনি দ্রুত ফিরে যেতে পারবে? ঠিক এমনই অক্লেশে? হয়তো সহজ না-হতে পারার বা বিশেষ কোন অসুবিধে হেতুই তাকে অবান্তর নানা কথার জের টেনে খুব শিগ্‌গিরই বলতে হত: আচ্ছা আবার দেখা হবে।

শ্বেতাদির কাছ থেকে লিখিত, প্রায় নিয়মিতই বলতে হয়, চিঠি পেয়েছে ছোড়দি। তবু সুদীর্ঘ ব্যবধানের পর প্রথম সাক্ষাতের সামান্য আড়ষ্টতাও বলে তো কিছু থাকে। ওদের ক্ষেত্রে যেন তা-ও নেই। শ্বেতাদির চিঠি পেয়েছে। খাওয়া দাওয়া সেরে যথারীতি দিবানিদ্রায় চলেছে। স্থির বিশ্বাস চিঠি যখন শ্বেতা দিয়েছে, সে আসছেই। আর তা ছাড়া শ্বেতা আসতে আসতেই উঠে পড়ব—এই মনোভাব নিয়েই বোধহয় হাত পা ছড়িয়েছে। যেন এমন অস্বাভাবিক কিছুই ঘটছে না

প্রাত্যহিক জীবনের নিতান্ত ধরাবাঁধা রুটিনের বাইরে। এপাড়া থেকে ওপাড়ায় কারো বেড়াতে আসা বা যাওয়া। ব্যাপারটা কিছুই নয়, একজনের চিঠির বদলে একজন স্বয়ং নিজেই আসছে। একজনের চিঠির উপস্থিতির সঙ্গে তার দৈহিক উপস্থিতির যেন কোন পার্থক্যই নেই। ছোড়দির মুখ চোখের নিশ্চিন্তির, নির্লিপ্তির এই ভাবটাই তাকে বেশ অবাক করে।

বেতের পুরনো ঝাঁপিটার মধ্যে শ্বেতাদির চিঠির জমানো স্তূপের ছবিটাই বার বার চোখের সামনে এসে দাঁড়ায়। শুধু চিঠিগুলো কেন, চিঠির খামগুলোও অক্ষত আছে। তবে রং বিবর্ণ হয়েছে অধিকাংশেরই। কলকাতার, আর কলকাতা থেকে অনেক দূরে বহু বহু মাইল ব্যবধানের কত জায়গার পোস্ট-অফিসের ছাপও অনেকগুলো খামের মাথায় উজ্জ্বল হয়ে আছে।

ছোড়দিকে কতদিন দেখেছে হাতে অনেক সময় নিয়ে দুপুরের স্তব্ধ প্রহরগুলিতে এই পুরনো বেতের ঝাঁপিটা থেকে চিঠিগুলোকে উপুড় করে ঢেলেছে। তারপর বেছে বেছে তুলেছে খানকয়েক চিঠি। খামের ওপর চোখ বুলিয়েছে, বছর আর মাসের তারিখ দেখে পুলকিত হয়েছে। তারপর খাম থেকে চিঠি বার করে পড়তে শুরু করেছে, পড়তে পড়তে থেমেছে, আপনার মনে হেসেছে। দেখে তারও মজা লাগেনি কম। চিঠিগুলো যেন ছোড়দির শরীরের এক একখানি পাঁজরা।

আর তার নিজের কথা ভেবে একেক সময় ক্ষেপে উঠেছে সে। পরপর খানতিনচার চিঠি লিখেও দুয়েকজন উত্তর পায়নি তার কাছ থেকে। স্মৃতি তো একবার জেহাদই ঘোষণা করতে গিয়েছিল আর কি।

আর ছোড়দি যেদিন শ্বেতাদির চিঠি পাবে সেদিনই উত্তর লিখতে বসবে। কোন ব্যতিক্রম নেই এ ব্যাপারে। যদি খাম না-থাকে তো বাড়ি থেকে বেরুবার মুখে তাকে ছোড়দির তাগিদ শুনতে হবে ঘন ঘন। ফেরবার সময় যেন অতি অবশ্যই খাম নিয়ে ফেরে। চিঠি লিখে সে রেখে দেবে। কিন্তু খাম না-পেলে পোস্ট করতে পারবে না, এটা যেন মনে থাকে অনিন্দ্যর। আর পোস্টকার্ড বা খাম নিয়ে আসার কথাটা ভুলে যাওয়া যেহেতু তার পক্ষে নিতান্ত স্বাভাবিক সে ভুলেও যায়।

আর তারপরই মার সামনে ছোড়দির ফেটেপড়ার অধ্যায়। মাও হাতের কাজ ফেলে ছোড়দির দিকে ফেরে।

জান মা, তোমার ছেলের আজকাল আর আমার কোন কথাই খেয়াল থাকে না...বার বার বললুম শ্বেতার চিঠিখানা ফেলা হবে না খাম না আনলে...

আরে, আমারও তো একখানা জরুরী চিঠি ছাড়তে হবে, অ্যাপ্লিকেশনের ব্যাপার, না আমারও পোস্ট-অফিস ছাড়া চলবে—তার এই যুক্তিতর্ক কিছুতেই টেঁকে না। মার কাছ থেকে সহানুভূতির বিন্দুমাত্র মেলে না।

মা উল্টে বলে, আচ্ছা বয়স বাড়ছে? এখনো সেই উদো-মাদা থাকবি? বলবেটা কাকে, রাস্তার লোককে।

তবে অতীশদার কথাটা ভাবলে হাসি পাবারই কথা। দেয়ালে ঝোলানো ওই বেতের ঝাঁপিটার দিকে আঙুল দেখিয়ে একদিন হাসতে হাসতে বলেছিল অতীশদা তার দিকে চেয়ে—ওটার মধ্যে কি আছে বলতো? সে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে বলেছিল, কি আর, যত রাজ্যের ছেঁড়া কাগজ, রাবিশ আর জঞ্জাল—

ছোড়দির চোখ ঘুরে তার দিক থেকে এবার অতীশদার দিকে ফিরল। এক মুহূর্তে মুখে যতটা সম্ভব গাম্ভীর্য টেনে এনে বলে, কী বললে? ওসব চিঠির দাম কিছু বোঝ? কত পাউণ্ড, ডলারে একদিন ওই পত্রগুচ্ছের এক একখানি বিক্রী হবে তা জান।

ছোড়দি ঠাট্টার উত্তর দেয় প্রায় ভয় দেখানোর ভঙ্গিতে অনেকটা, আচ্ছা, এসব কথা আমি লিখব শ্বেতাকে।

চিঠির সেই শ্বেতা আর পারুল এখন মুখোমুখি বসে, তার পাশের ঘরেই।

|| ৩ ||

কথায় কথায় দুজনে দুপুরকে অনেক দূর গড়িয়ে এনেছে। প্রায় অফুরন্ত কথা বলেছে দুজনে। কি কথার বিষয়, বা এক বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে চলে গেছে কেমন করে কোন সূত্র ধরে, পাশের ঘরে শুয়ে অলসভঙ্গিতে সিগারেট টানতে টানতেও সে-সব কথায় কান দিতে পারেনি। কাটা কাটা, ভাঙা-ভাঙা অনেক কথাই হয়তো স্পষ্ট কানে এসেছে কিন্তু সে সময় তার নিজের চিন্তাও বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। কি যেন ভেবেছে তখন। এবার হঠাৎই ওদের উচ্ছ্বসিত হাসির, কথার শব্দতরঙ্গ এ-ঘরে এসে আছাড় খেল—

না কথা ওল্টালে চলবে না...সত্যি বল তুই বলেছিলি কিনা, এবার ছবি পাঠাবি দুজনের একসঙ্গে, তোর আর অনিমেষবাবুর—ছোড়দির গলা।

কিন্তু ছবি তোলা হলে তো?

শ্বেতাদি আর কিছু বলবার আগেই ছোড়দি প্রগলভ হয়ে ওঠে—না, আমায় বিশ্বাস করতে হবে, তোরা এ্যাদ্দিনেও একসঙ্গে ছবি তুলিসনি।

বিশ্বাস কর, শুধু আমার—শ্বেতাদির কথা মুখেই থাকে।

চালাকি পেয়েছিস, ফের মিথ্যে কথা—ছোড়দির অন্তরঙ্গ কণ্ঠ। ঘাড় কাৎ করে পিছনে একটু বেঁকে সে দেখে ঘরের দরজাটা বাতাসে আরও একটু বেশি ফাঁক হয়ে গেছে। এবার বুঝতে পারে পাশের ঘর থেকে ওদের দুজনের গলা এত স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে কেন।

আচ্ছা কথা দিচ্ছি এবারে, পাঠাব পাঠাব পাঠাব—ছোড়দির কাছে প্রায় শপথ করে শ্বেতাদি।

পাঠাবি তো সেই পাঁচসাত মাস পরে, এবারে তো একটি বছরের আগে যাওয়া হচ্ছে না।

অত না-হলেও, সাতআট মাসের আগে কিছুতেই নড়ছি না।

সত্যি শ্বেতা একটু বেশি দিন থেকে যা—এলি কদ্দিন পরে বলতো ?

এখানে সবাই মিলে একখানা ছবি তুললে কেমন হয় রে পারুল।

সবাই মিলে মানে—রাখব তোদের দুজনের ছবি—তা না গাদা লোকের ভিড়...

কেন বেশ তো মজা। ভিড় থেকে খুঁজে বার করবি আমাদের ধাঁধার মতন।

ও। যেন শোভাযাত্রা থেকে তোদের বার করতে হবে...

নয় তো কি, যেমন বললি—গাদা লোক। বলছিলুম তুইও থাকবি।

শ্বেতাদির কথাটা যেন সম্পূর্ণ ধরেছে এতক্ষণে ছোড়দি।

তা-ই বল, মাঝখানে আমি, একপাশে তুই আরেকপাশে অনিমেষবাবু—এই তো ?

আরেকখানা—শুধু তুই আর অনিমেষবাবু—

তাও মন্দ হবে না, তবে আমার চেহারাটা যা—

ওটা বাজে কথা, আমার মনে হয় তুই বিশেষ একজন ছাড়া আর কারো সঙ্গে, ছোড়দির মুখের দিকে চেয়ে শ্বেতাদি কথায় একটু ঢিলে দেয়। কথাও আর শেষ হয় না শ্বেতাদির।

ভাল হবে না বলছি শ্বেতা—বলেই হয়তো এক কিল বসাতে যায় ছোড়দি। শ্বেতাদি ততক্ষণে উঠে দাঁড়িয়েছে পিছন ফিরে।

ছোড়দিও দরজার দিকে পিছন ফিরে বসে শ্বেতাদির দিকে মুখ উঁচু করে তাকিয়ে আছে। শ্বেতাদি ঘরের একপাশের দেয়ালের দিকে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। ওপাশের জানালার মাথার ওপরে দেয়ালে টাঙানো ছোড়দির একখানা এমব্রয়ডারি ছবি কাচের মধ্যে ফ্রেমে বাঁধানো। শ্বেতাদি ওইদিকে আঙুল তুলে বলে, ওটা কবে করলি রে পারুল ?

তোর বিয়েরও আগে, কি একটু পরে হবে, ছোড়দির কথায় মনে হবে হঠাৎই, শ্বেতাদির বিয়ে সে কি, আজকের কিছু, কোন অনাদিকালের ব্যাপার। ছোড়দি কি অজান্তেই বলে ফেলতে চায়, শ্বেতা বিয়ে তোকে বয়সিনী করেনি শুধু সময়ের কোন পারে নিয়ে গিয়ে ফেলেছে।

কোথায় নিশ্চিন্ত উপকূলে এনে ফেলেছে। বয়স আরো কিছু বেশি

হলে ছোড়দি হয়তো এ সময় চাপা একটা দীর্ঘশ্বাসও ফেলত। কোন চাপা একটা অব্যক্ত ব্যথাকে ছোড়দি মনের মধ্যে কবে থেকে যেন পুষে রেখেছে। বাবার মৃত্যুর কয়েকটা বছর পর ছোড়দি হাতের ওই কাজটা নিয়ে বসেছিল। চুপচাপ নিঃসাড়ে যেন নির্মম দুঃসহ সময়ের সঙ্গে লড়াই করে চলেছে। ওটাকে সম্বল করে ছোড়দির সে-সময়ের ছবিটা তার মনে এখনো বেশ স্বচ্ছ। অতীশদা তখন এই পরিবারের লোকগুলোর সঙ্গে সবে একটা নিবিড় সম্পর্ক রচনা করতে চলেছে। অপরাহ্ণের ম্লান আলোয় এই শহরের বাইরের কোলাহলের সঙ্গে সব সম্পর্ক চুকিয়ে এ-বাড়ির এই কক্ষের অস্পষ্ট অস্বচ্ছ আলোয় যেন সেই দুরন্ত গতিশীল শহরটারই গম্ভীর, পরম ধীর ও শান্ত নির্জন আত্মাটির অন্বেষণে অতীশদা আসে। ছোড়দিকে তার কখনো কখনো মনে হত শহরের সেই গম্ভীর, বিপুল বেদনাহত, নির্বাক আত্মাটি।

অতীশদার পায়ের শব্দ পেয়ে ছোড়দি হয়তো তাড়াতাড়ি সেলাইর সরঞ্জাম গুটিয়ে ফেলেছে, হাতের কাজ নামিয়ে। অতীশদা বলেছে—গোটানো হল কেন? বেশ তো চলছিল—

না, ঘাড়ে ব্যথা ধরে গেছে—স্বল্প দুয়েকটি কথার জবাবই তখন দিতে পারত ছোড়দি।

এর সঙ্গে সঙ্গে একটু আধটু বিদ্যেচর্চা হলে মন্দ কি—অতীশদা পরে, একটু সময় নিয়ে, বেশ মোলায়েম করে বলেছিল কথাগুলো। ছোড়দি তখন প্রস্থানোদ্যত। প্রেরণার, বাঁচার প্রেরণার সূত্রপাত বোধ হয় এমনি করেই।

শ্বেতাদি ও-জায়গাটা ছেড়ে কখন সরে এসেছে ওই দেয়ালেরই আরেক পাশে। একখানা মস্ত মোটা ফ্রেমে বাঁধানো ছবির দিকে আঙুল তুলে বলে শ্বেতাদি—মাসিমা'র করা সেই ছবিটা না?

হ্যাঁ।

কতদিনের ছবিটা বল তো—উঃ! ফ্রেমটা পালটিয়েছিস, না?

একেবারে নষ্ট হয়ে যাচ্ছিল ছবিটা। অনিন্দ্যকে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে তবে—যা কুঁড়ে, চট করে নড়ে বসতে চায় নাকি—

হ্যাঁ, এসেই তো দেখি বাবু চিৎপটাং, আর—এখনো কি উঠেছে?

ওই তো, সিগারেট টানছে—ছোড়দি শূন্যে আঙুল তোলে।

এতক্ষণে খেয়াল হল তার সিগারেটের ধোঁয়া দরজার মাঝখানের ফাঁক দিয়ে পাশের ঘরেও যেতে শুরু করেছে কখন। এক একবার বাধা পেয়ে বেশ কায়দায় যেন শরীরটাকে ক্ষীণ করে ওই নীল ধোঁয়াটা তার ঘর থেকে পাশের ঘরে প্রায় চোখকে ফাঁকি দিয়েই একরকম চলে যায়। সব ব্যাপারটা দেখে, কল্পনা করে তার হাসি পায়, বেশ হাসি পায়।

হঠাৎ নিজের নাম ওদের দুজনের মুখে আলোচিত হতে শুনেই চমক ভাঙল। ওর চিন্তা কিন্তু বাঁধা পড়েছিল মা'র ওই বহু পুরনো হাতের কাজের ছবিটার কাছে। মা'র মুখ থেকেই শুনেছে ছবিটার কথা। বিয়ের কটা মাস পরেই মা ওই হাতের কাজটা শুরু করে। সবুজ একটা বনাতের মাঝখানে একটা ফুলের সাজি আর তাকে ঘিরে দুয়েকটা প্রজাপতি। সাদা পুঁতি দিয়ে নক্সাটা ভরানো।

কল্পনায় মা'র একখানা ছবি কতবার গেঁথেছে সে। স্কুলমাস্টারের গৃহিণী। তবু আশা অনেক। উজ্জ্বল শ্যামবর্ণের একটি মেয়ে। কোমল সুশ্রী। উচ্চাশা না-থাকলেও যেন কোনখানে দারিদ্র্যভীতির চিহ্নমাত্র নেই। ওই ছবিটার মধ্যেই নিজের মনের অনেকখানি ছড়িয়ে রাখতে চেয়েছে মা। ধুলোয় বনাতের মাঝে মাঝে রং-চটে-যাওয়ার ছোপ, পুঁতিও অনেক খসে গেছে। মা'র ওই ছবিখানা থেকে ছোড়দির ছবিখানার দূরত্ব দেয়ালের গায়ে যা ধরা পড়ে তা থেকে সময়ের ব্যবধানের দূরত্বটা শ্বেতাদি কি একটুখানিও আঁচ করতে পারে? হঠাৎই মনে হল তার কথাটা কি ভেবে। একখানা মা'র হাতের, আরেকখানা মেয়ের। ছবি দুখানা একই দেয়ালের দুই প্রান্তে। যৌবনের দুই প্রান্তে দুটি নারী, মা আর মেয়ে। তারা যেন দুটি প্রান্তরেখা, মাঝখানে সময়, নিষ্ঠুর নির্মম সময়। এই সময়কে অনুধাবন করতে পারে শুধু একজনই যে এই দুটি প্রাণীর যন্ত্রণার অজস্র সহস্র মুহূর্তকে ছায়ার মতো একান্ত চুপিসাড়ে গোপনে, সবার অলক্ষ্যে অনুসরণ করেছে। মা'র যৌবনের সামান্য কটি ভীরু ইচ্ছা মেয়ের যৌবনের বাসনায় এসে মিলতে পারেনি; তার বহু আগে কবে থেকে চূর্ণ হতে লেগেছে। দীর্ঘ এ-ইতিহাসের উপসংহারে যে-কথাটা তার বার বার মনে হয়েছে, তা হল, সময়ের

হাত এতই দীর্ঘ যে জীবন তার নাগালের বাইরে রাখতে পারে না নিজেকে।

রান্নাঘর থেকে মা'র গলার আওয়াজ আসায় এতক্ষণে মনে পড়ল মা'র কথা। কখন টুকিটাকি দু চারটে কথা সেরে মা শ্বেতাদি আর ছোড়দিকে ছেড়ে রান্নাঘরে গিয়ে ঢুকেছে। তা প্রায় ঘণ্টাদুয়েক তো হবেই, আরো বেশি হয়তো। বাধা দিতে গিয়েছিল শ্বেতাদি, এক্ষুণি উঠে চললে কোথায় আবার ?

ছোড়দি ব্যস্ত ছিল নিজের কথায়। মা যে ঘর থেকে বেরুবার জন্যে দাঁড়িয়েছে তা তার নজরে পড়েনি।

বসে থাকলে চলবে মনে করেছিস ? আজ আর ও মেয়েকে ওখান থেকে নড়াতে পারব না কি ?

তা তোমারই বা তাড়া কিসের এত শুনি—যেন স্বাভাবিক চিরকালের দাবিতে শ্বেতাদির কণ্ঠে এই প্রতি-জিজ্ঞাসা।

দেখি কত বকতে পারিস তোরা।

তা'হলে শেষ পর্যন্ত সেই তোরা—শ্বেতাদির কণ্ঠে এবার হাসির মৃদু রেশ ফুটে ওঠে।

মা ঘর থেকে বেরুবার উদ্‌যোগ করতেই শ্বেতাদি বসে থেকেই সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে পিছন থেকে মা'র আঁচল টেনে ধরে। মা পিছন দিকে একটু টলে পড়ে তাড়াতাড়ি। মা'র একটি পা এসে পড়ে শ্বেতাদির মাটিতে রাখা একখানা হাতের ওপর। মা সামলে নেয় নিজেকে, বলে, আচ্ছা পাগল মেয়ে, গায়ে সে-ই পা লাগালি তো ?

এরপরই সস্নেহে শ্বেতাদির মাথা নিজের দুই হাঁটুর কাছে টেনে আনে, একটু নিচু হয়ে ডান হাতের সব কটা আঙুল শ্বেতাদির সারা মাথায় বুলিয়ে নিজের দুই ঠোঁটে ঠেকায়। তারপর ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

মা বিশেষ কারো উপস্থিতিতে এমনই সক্রিয় হয়ে ওঠে। শ্বেতাদি এসেছে। মা আজ কিছুতেই চুপচাপ থাকতে পারবে না। নিজে হাতে করে খাবার করবে। তরকারি করবে দুচার রকমের। খুব সরু করে কুচিয়ে আলু ভাজবে পোড়া-পোড়া করে। শ্বেতাদি ভালবাসে তাই।

তারপর অবশেষে লুচি ভাজতে বসবে। আর ভাজা শেষ হলেই হয়তো ডাকবে—কই শ্বেতা, গরম গরম দুখানা মুখে দিবি আয়—আগে আয়, জুড়িয়ে যাবে।

ছোড়দি পত্রলেখিকাকে সশরীরে পেয়ে সবকিছু ভুলে যায়। হয়তো নাওয়া খাওয়া। মা এই মেয়েটিকে পরম তৃপ্তির সঙ্গে নিজের হাতের তৈরী খাবার না-খাইয়ে কিছুতে শান্ত হতে পারে না। একজন এই মেয়েটির সঙ্গ পেয়ে নিজের নিঃসঙ্গ মুহূর্তগুলিকে যেন ঠিক নির্বাসন দণ্ড দেবে। আর অন্যজন মনে করে তার দায়িত্ব অনেক বেশি ও গুরু। পেটের মেয়ে ছাড়া আর কি হতে পারে ও। বাজার থেকে খাবার আনিয়ে ওর মুখে কেউ ধরতে পারে ?

সে দেখেছে তাদের সংসার সেই পুরনো দিনগুলি থেকে আজ পর্যন্ত এমনি করেই মা মেয়ে ভাগ করে নিয়েছে শ্বেতাদিকে। কৌতুকটা তারই চোখে পড়ে বেশি। শ্বেতাদিকে কেন্দ্র করে ছোড়দি আর মা'র ব্যাপারটা তার কাছে মাঝে মাঝে পরম উপভোগ্য।

মা'র গলার আওয়াজ আসে, বলি, পারুল এখনো তোর সময় হল না ? আমি কি সব ছড়িয়ে এমনি করে বসে থাকব নাকি—মুহূর্তকাল চুপচাপ। তারপর আবার—কি রে কথা কানে গেছে ? এত বড় মেয়ের আক্কেল দেখে—বাকি কটা কথা অস্পষ্ট হয়ে আসে কানে। তবে সে আন্দাজ করতে পারে।

এদিকে শ্বেতাদি আর ছোড়দি বসেছে মেঝের ওপর হুমড়ি খেয়ে, ফোটোর এ্যালবামখানা খুলে। দেয়ালের ওপর থেকে চোখ এবার নেমে এসেছে মাটির ওপর।

ফোটোতে কি রং বোঝা যায় নাকি—শ্বেতাদি বলে।

চোখে দেখে তো বোঝা যায়—আমি তো এ্যাদ্দিন ধরে দেখে আসছি নিজের চোখে—একটু জোর দিয়ে বলে ছোড়দি কথাগুলো।

তোর কাছ থেকে যা শুনেছি তাতে এত ফর্সা মনে হয়নি তো—

না, ঠিক এতটা ফর্সা নয়, তবে তোর কাছাকাছি যাবে। আমার মতো কালা আদমি নয়।

থাক থাক আর বেশি বিনয় করিস নে। তবে এ্যাকমপ্লিশড, কি বলিস ? শ্বেতাদির কণ্ঠে কৌতুক।

তার মনে হয় এটাই অনিমেষবাবুর প্রভাব ইদানীং শ্বেতাদির চরিত্রের ওপর। অনিমেষবাবু কথা বলতে বলতে অনেক ইংরেজী কথা মেশান নিশ্চয়, খুবই স্বাভাবিক তাঁর পক্ষে। হাসে, ভাবে, শুনিয়ে দেবে নাকি শ্বেতাদিকে মনের কথাটা তার। ব্যাখ্যা করবে অর্ধাঙ্গিনী কথাটার ভাল করে।

এ্যাকমপ্লিশড কি না দেখতেই তো পাবি বাবা, আর তো কিছুক্ষণের মধ্যেই এসে পড়বে—ছোড়দিও যে ইংরেজীর সমঝদার আজকাল এটা সুযোগ সুবিধে মতো বিশেষ স্থানকালে জানিয়ে দিতে ছাড়ে না। আর তা'ছাড়া বি. এ. পরীক্ষার জন্যে প্রাইভেটে তৈরী হওয়ার পর থেকেই ছোড়দির এ ব্যাপারে যেন একটা অধিকারবোধ জন্মেছে।

ঘড়ির দিকে তাকাতে হয় তাকে। কিছুক্ষণের মধ্যেই স্মৃতি আসছে তাহলে। আর কিছুক্ষণ মানে তো নিশ্চিত সন্ধ্যা। ঘরের একদিকের পাল্লাটা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় বিকেল একেবারেই পড়ন্ত মনে হয়। বসে বসেই যতটা সম্ভব পা লম্বা করে টেবিলের বইগুলোর মাথার ওপর দিয়ে জানালাটা খুলে দেওয়ার চেষ্টা করে। পা অতদূর যায় না। উঠতে হল বলে কেমন যেন অস্বাচ্ছন্দ্য। উঠে গিয়ে আর খুলতে ইচ্ছে করে না। বুঝতে পারে পশ্চিমের আকাশের গা থেকে এখনো পড়ন্ত রোদের শেষ আলোটুকু সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হয়নি। অনেক আগেকার বছরগুলোর মতো আকাশের ওই রঙের দিকে চোখ পড়লে এখনো উদাস হয়ে পড়ে নিজের পুর্ণ অজ্ঞাতে অনেক সময়। যতরাজ্যের আলসেমি এসে যেন দেহের নড়াচড়াকে পঙ্গু করতে চায়। পরিপুর্ণ মগ্ন হতে ইচ্ছা জাগে বুঝতে পারে না ঠিক কোথায়, একরাশ অতীত ভাবনা পলাতক গতায়ু স্মৃতির মধ্যে না এখনকার আকাশের ওই ছড়ানো অপস্রিয়মান আলোর স্বচ্ছ পাতলা আচ্ছাদন ছিন্ন করে তার মধ্যে।

শ্বেতাদির কথার টুকরো অংশ আবার কানে আসে—তবে তোর চেয়েও বেশি বলিনি কিন্তু—

অন্যায় করেছিস।

মানে ?

পক্ষপাতিত্ব।

তুই ঠাট্টা করছিস ? আমি কিন্তু সত্যি বলেছি, একটু স্মার্ট।

যা ! তুই ফোটো থেকে দেখেছিস—তাই, সামনে থেকে দেখিস, একেবারে অন্যরকম—ছোড়দির কণ্ঠস্বরে মনে হয় বিশ্বাস আরোপ করতে চায় নিজের কথাগুলোর ওপর।

তবে যতই বল তোর মতো দীর্ঘপক্ষ আঁখি—

শ্বেতা, ফের আবার—বলছি তুই নিজে চোখে দেখে বলিস—আমার থেকে অনেক সুন্দরী।

দেখা যাক—প্রায় চ্যালেঞ্জের ভঙ্গিতে কথাটা বলল শ্বেতাদি ; আর ছোড়দির মুখ থেকে সুন্দরী কথাটা শুনে ছোড়দি সম্পর্কে ফের একটা কথাই মনে হল—ছেলেমানুষ, ভীষণ ছেলেমানুষ ছোড়দি।

মা'র অধৈর্য কণ্ঠ থেকে আবার তাড়া আসে। ওদের অগত্যা উঠতেই হয় এবার। এ্যালবামখানা কোনোরকমে মেঝের ওপর উল্টে ফেলে ওরা দুজনেই ছোটে রান্নাঘরের দিকে। ছোড়দি প্রায় এক দৌড়ে শাড়িটা কোন-গতিকে সামলে নিয়ে ছোটে। শ্বেতাদি অনেকটা তফাতে ধীরে অনুসরণ করে ছোড়দিকে। কিন্তু ধীর গতিতেও কেমন একটা ব্যস্ত ভাব ফুটে ওঠে।

অনিন্দ্য সিগারেট ধরালো। হাত পা একেবারে টান টান করে ছড়িয়ে দিল বিছানার ওপর। জানালা খোলা সত্ত্বেও ঘরে আলোর অস্পষ্টতা এবার অনেক বেশি মনে হল। অথচ আলো জ্বালার প্রয়োজনও সে অনুভব করল না মোটে। ভালই লাগছিল ওদের দুজনের মুখ থেকে স্মৃতির চেহারার বা চরিত্রের বর্ণনা, আলোচনা বা ছেঁড়া কাটা মন্তব্য দু-চারটে শুনতে। এখন পাশের ঘরে নীরবতা। ওদের কথা যে একেবারেই শুনতে পাওয়া যাচ্ছে না তা নয়, জোরে হাসলে চেঁচিয়ে কথা বললে বা উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলে হঠাৎই কানে এসে বাজবে কিংবা ধাক্কা দেবে অসংলগ্ন কথার ঝংকার।

স্মৃতি এলে, আজ সন্ধ্যায় প্রথম কথাই বলবে—বড়বেশি স্মার্ট স্মার্ট—কথা শেষ করার কোন প্রয়োজন হবে না। ইঙ্গিতটুকুই যথেষ্ট, আর তার সঙ্গে চোখের দৃষ্টি।

হঠাৎ এ কথা? একটু কপট ক্রোধ মুখের অনাবিল লাবণ্যের ওপর সর্বত্র ছড়িয়ে মধ্যবয়সী বিবাহিতা মহিলার ভঙ্গিতে স্মৃতি এমনি প্রশ্ন করে কখনো সখনো কোন কোন কথার পিঠে। আজও হয়তো তেমনি করবে।

স্মৃতির এ ধরনের চাউনিতে মাঝে মাঝে সে কেমন বিব্রত বোধ করে নিজেকে। স্মৃতির নিঃসঙ্কোচ কটাক্ষের মধ্যে যে কথাটা গোপন থাকে সেটা হল, প্রেমের ব্যাপারে এখনো কি ছেলেমানুষ তুমি। আবার বুদ্ধিমান বলে নিজের ঢাক পেটাও।

স্মৃতির দৃষ্টির ওপর পলক মাত্র চোখ ফেলেই সে বলবে, হঠাৎই মনে হল, তাই।

তবে নিতান্ত হঠাৎই। কারণটা জানতে পারি।

সবকিছুরই আবার কারণ থাকে নাকি?

তা হলে অকারণেই স্মার্ট—তবু চেষ্টা করেও তো অনেকে স্মার্ট হতে পারে না।

অনেকে মানে আমি তো, নিজের বুকের ওপর আঙুলের টোকা মেরে ও বলবে—আরে! আমিতো চিরকালই আনস্মার্ট।

সেই জন্যেই রাগটা—পরাস্ত করার একটা দীপ্তি স্মৃতির সমস্ত মুখ আচ্ছন্ন করবে।

কথাটা আমার নয়, শ্বেতাদির—তার কণ্ঠস্বরটা আপসের মতো শোনাবে।

কোথায় তিনি?

স্মৃতির এই অহঙ্কারই তার অস্ত্র। অথচ এ অস্ত্রকে তার নিজের ভয় করার কিছু নয়। স্মৃতিকে সে জেনেছে বলেই এই বিশ্বাস। স্মৃতির এ অহঙ্কার যে কিসের তা ধরা মুশকিল। চেহারার না কথাবার্তার, ব্যবহারের না রুচির? কিন্তু যা সে প্রথম ব্যবহার থেকেই ঘোষণা করতে চেয়েছে তা তার কাছে মনে হয়েছে, জয় তুমি করেছ অনেক, করবে অনেক, কিন্তু জয় যা করবে না তাওকি কম। স্মৃতির এই অহঙ্কারকেই সে জয় করতে পারবে না, কোনদিনও না। এ তাকে ব্যথা দেয় না অথচ সে মনের কোথায় অস্বস্তি বোধ করে। স্মৃতির

চাঞ্চল্যকে হত্যা করতে পারলে তবে বুঝি ওই অহঙ্কার তার আয়ত্তাধীন হতে পারে। কিন্তু ওই চপলতাই তো স্মৃতির অনেকখানি।

ঘড়ির কাঁটা ঘোরাই সার হল। সূর্যের সারা আকাশ পরিক্রমাই কি কম ক্লান্তিহীন। এবার ঘরে আলো জ্বালতেই হবে। বাইরের আলোর কাছে আর হাত পাতা যায় না। সবকিছুরই বিরতি আছে, এই নিয়মই এ মুহূর্তে তার অলঙ্ঘ্য মনে হল। মজা দেখেছে, অনেক আশা করে বসে থাকার পরও আশানুরূপ কিছুমাত্র ঘটল না। আবার ভাবেনি যা, মনেও হয়ত করেনি এমন অনেক কিছু ঘটে গেল অপ্রত্যাশিত। এত কথা ভেবে দেখার বা তলিয়ে চিন্তা করার সামান্য অবকাশ হয়ত মিলত না যদি স্মৃতি এসে পড়ত নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বা এমন কি সেই সময় পার করেও। কিন্তু হিসেব করে দেখল স্মৃতির আসার কোন সম্ভাবনাই নেই। তার মনের এই নৈরাশ্য ও শূন্যতাবোধের জন্যে দায়ী করতে হয় একমাত্র স্মৃতির অনুপস্থিতিকে। তিরস্কারও করে হয়ত স্মৃতিকে মনে মনে—

কি এমন রাজ কাজ তোমার যে সময় করে একটিবার আসতে পারলে না—

নিজের সুখসুবিধেটাই খালি দেখছ, পাল্টা জবাবে তার প্রশ্নের উত্তর কিন্তু কিছু মেলে না।

মানে? আর এই প্রশ্নের সঙ্গে সঙ্গে হয়ত সে জ্র কুঁচকবে, তার কছে উষ্মতা প্রকাশ পাবে।

রাগ করলে কি হবে? স্পষ্ট কথা বলব, অন্য লোকের দরকারটা তোমার কাছে কিছু নয়।

দরকার অদরকার বুঝি না, আমিও অনেক দরকারি কাজ ফেলে কথা রাখি, এটা মানবে?

আমি অত হিসেব করে রাখিনি। অনেকে পারে, আমি পারি না।

আমার হিসেব রাখা ঠিক নয়। হ্যাঁ দেখ, তোমায় সত্যিই বলছি, সামনের সোমবারে আমার ওখানে যাওয়া সম্ভব হচ্ছে না—

এটা কি এক্ষুণি ঠিক হল। কতবার জিজ্ঞাসা করেছি, তারপর ছোটমামাকে জানিয়েছি।

ঠিক আছে, একটা ফোন করে দিও না।

তারপর স্মৃতির অস্বাভাবিক গম্ভীর মুখের দিকে কয়েক পলক তাকিয়ে থাকতে হয়। শেষকালে একটা রফা করতে হয় ব্যাপারটার আপসের মধ্যে দিয়ে। পরম উপভোগ্য হয় স্মৃতির বিশেষ তুয়েকটা কথা, 'অন্যলোকের দরকারটা' বা 'অনেকে পারে'। এই নিয়ে একপালা মজা করা যায় স্মৃতির সঙ্গে।

অন্যলোক মানে না হয় বুঝলুম স্মৃতিরেখা কিন্তু অনেকে মানে কি করে অনিন্দ্য হয় শুধু? অনেকে তো বহুবচন—

স্মৃতি নীরব থাকে এ সময়। শুধুমাত্র একটি চাহনিতে তাকেও নীরব করে দেয়।

নিজের মনের সঙ্গে কথা বলা বেশিক্ষণ সম্ভব হয় না। স্মৃতির অনুপস্থিতি শূন্য কক্ষের নিঃসঙ্গতাকে থেকে থেকে বাড়াবে। মনের কোথায় শুধু ক্ষোভের পীড়ন অনুভব করে। এ থেকে নিজেকে মুক্ত করবার জন্য সে কিছু খুঁজেও পায় না হাতের কাছে।

ছোড়দিকে শ্বেতাদি সঙ্গে করে নিয়ে গেছে ওদের ওখানে। ওদের বাড়ি এখন ফাঁকা। শ্বেতাদির বাবা বাইরে কোথায় গেছেন জমি দেখতে, বাড়ি করবেন তাই। শ্বেতাদির মা'র ইচ্ছে ছোড়দি দিন কয়েক ওঁদের বাড়িতে এসে থাকুক। শ্বেতাদির মা বলেছেন, অরু এখানে নেই, উনিও কাজে কয়েকটা দিন বাইরে যাচ্ছেন, তুই এসেছিস রক্ষে, কী ভীষণ ফাঁকা লাগত। এই ফাঁকে না হয় পারুলকে ধরে নিয়ে আয়।

শ্বেতাদি মাকে ভাল করে বুঝিয়ে নিয়ে গেছে ছোড়দিকে সঙ্গে করে। মা বলেছে, আর তো কিছু নয়, এই শরীর নিয়ে যদি একবার পড়ি তো অনিন্দ্যর খাওয়া দাওয়া মাথায় উঠবে।

তু চারটেদিন তো থাকবে, তুমি কেন, তোমাদের বৈদ্যনাথ চালিয়ে নিতে পারবে না?

পারবে পারবে—তোর জন্যে না-পেরে উপায় আছে? মা বলেছে সস্নেহে হাসতে হাসতে। তারপর এমন করে তাকিয়ে থাকে শ্বেতাদির মুখের দিকে যে সত্যি বোঝা ভার কী ওদের সম্পর্কটা।

আর ঠিক এই কারণেই ফাঁকা বাড়িতে সেও চুপচাপ পড়ে আছে।

তার কাজের মধ্যে বর্তমানে সিগারেট টানা আর দেয়ালের দিকে তাকিয়ে থাকা, ঘাড় উঁচু করে ইজি-চেয়ারটায় অর্ধশায়িত অবস্থায়। দেয়ালের ঠিক ওই বিশেষ জায়গাটায় যেখানে বাবার ছবিখানা টাঙানো ছিল। তাদের পরিবারের কাছে বা পরিচিত অনেকের কাছে এটা বিস্ময়ের ব্যাপার হলেও, তার কিন্তু এটা অভ্যাসের পর্যায়ে এসেছে। ঠিক মনে হয়েছে ঘরের ও চারিপাশের জড় ও চলমান সমস্ত কিছুর অস্তিত্ব তার অনুভূতি ও উপলব্ধির গোচরে আর নেই।

দেয়ালের ওই দিকটায় তাকালেই অনিন্দ্যর দৃষ্টি প্রায় নিবদ্ধ হয়ে থাকে। ক্ষণিকের জন্যও সে চোখ তুলতে পারে না। সরাতে পারে না একটুও এপাশে কি ওপাশে। দেয়ালের ওই বিশেষ জায়গা জুড়ে ছিল বাবার বহুদিনের পুরনো ফোটোখানা। খুব সযত্নে সবাই রক্ষা করে এসেছে ফোটোখানা বাবার মৃত্যুর পর থেকে। ছবিখানা ওখানে টাঙানো ছিল অনেককাল। তারপর নামিয়ে নেওয়া হয়েছে, কি কারণে। দেয়ালের গায়ে কিন্তু ফ্রেমের দাগ যেন চেপে বসে গেছে। (শত চুনকামেও কি ওই দাগ দেয়ালের গা-থেকে তোলা যাবে!) সে একটা পুরো সন্ধ্যা কি অপরাহ্ণ ওই দিকে তাকিয়ে কাটিয়ে দিতে পারে। বিশেষ করে তার এই ঘরে যদি কেউ না-আসে এই তন্ময়তা থেকে তাকে উদ্ধার করতে। ঘড়ি ধরে সময় দেখলে দেখা যাবে, বেশ কিছুক্ষণ সে এই অনির্দিষ্ট তন্ময়তায় নীরব নিমগ্ন রয়েছে। বাবার জীবনের সমস্ত অসাফল্য, ব্যর্থতা, গ্লানি, ক্লেদ, ক্ষোভ ও রিক্ততার পূর্ণ বিশ্লেষণ চেতনার বিপুল গভীরে সারা হয়ে যায়।

সিগারেটের ধোঁয়াটে সাদা রেশমের দড়ির মতো ঘুরে ঘুরে পাক খেয়ে নাক আর চোখের সামনে দিয়ে কিছু দূরে মিলিয়ে যায়। মাথা নিচু করে সিগারেটের মুখ থেকে একবার ছাই ঝাড়ে। ছাই ছাইদানিতে পড়ে না, উড়ে এলোমেলো হয়ে যায় ঘরের মধ্যে। তারপর ওই ফ্রেমের দাগের দিকে চোখ তুলে বেশ শব্দ করে টান দেয় সিগারেটে। আর তখন এ-ই একমাত্র শব্দ সারাটা ঘর জুড়ে।

মানুষটি নেই, এমন কি চোখের সামনে তার ফোটোখানাও অনুপস্থিত
তবু সেই ফোটোর কয়েকটা দাগ একটি মানুষের

চলাফেরা, ভাবভঙ্গি কতকালের পরিচিত শুদ্ধ কণ্ঠস্বর সবকিছু ফিরিয়ে আনে অনায়াস চেষ্টায়।

বাবার মৃত্যুর পর বাবার সঙ্গে মুখোমুখি বসেছে সে অনেকবার এমনি ভাবে। অনেক জটিল প্রশ্নের স্থায়ী মীমাংসা করাটাই যেন তার উদ্দেশ্য। বাবার সব ক্রিয়াকলাপের একটা সুসংবদ্ধ ধারাবাহিক বিচারই তার কাম্য। ফিরে ফিরে যে-প্রশ্ন তার মনে তীব্র ও অনির্বাণ হয়ে উঠেছে তা, একটা লোক কিছুদিন ধরে এই কলকাতার জলহাওয়ায় বেঁচে ছিল, হয়তো আরো কিছুকাল বাঁচত একই ভাবে, কিন্তু কি উদ্দেশে বেঁচেছে? যাদের জন্যে বেঁচে ছিল তারা তাকে ঠিক চিনত? তাদের স্মৃতিতে তার সারা জীবনের সব কাজের কোন অনুরণন আজ শুনতে পাওয়া যাবে?

দু হাত দিয়ে শক্ত করে অনিন্দ্য নিজের মাথাটা চেপে ধরে। যেন প্রবল ধাক্কায় একটা সবল নিঃসঙ্কোচ উত্তর অসীম অস্থিরতায় নির্গত হবে। সে প্রায় নিঃসাড় হয়ে পড়ে অনেকক্ষণের এই শ্রান্তিতে। তারপর অসহ্য দুর্বিসহ ব্যথায় নিস্তেজ হয়ে যায় পরক্ষণে।

চোখের সামনে ছায়াময় ঝাপসা অন্ধকার দৃষ্টি রোধ করতে চায়। কবেকার সেই হিমার্ত শ্বাস বন্ধ-করা দৃশ্যটা আবার জীবন্ত হয়ে চোখের সামনে অতীতের এক দুঃসহ সন্ধ্যাকে মূর্ত করে তোলে। কী নিদারুণ ভয়াবহ সন্ধ্যা। বাবার মৃত্যুর সন্ধ্যা।

বাবা মা'র মৃত্যুশয্যার পাশে উপস্থিত থাকবার জন্যে শুনেছে মানুষ কত দূর দুরান্ত থেকে ছুটে আসে। আর না-আসতে পারলে চিরজন্মের ক্ষোভ। আর তার ক্ষেত্রে? যদিও সে তখন প্রায় নাবালক। তবু কি বাবার মৃত্যুশয্যার পাশে উপস্থিত থাকতে পারত না? শেষবারের মতো বাবার জীবিত চোখ দুটোর দিকে একবারো চেয়ে থাকতে পারত। আবার ভেবেছে, না বাবার মৃত্যু সে সহ্য করতে পারত না। বাবার মৃত্যু সে কল্পনায় ঠাঁই দেয়নি। তাই সে দূরে ছিল। একটা লোক কি যেন চাইতে গেল, চাইতে পারল না। কি একটা বলতে পারল না, ঠোঁটটা একটু কেঁপে ওঠে। তারপর চোখ দুটোর পাতা কেমন [illegible] করে কেঁপে উঠেই হঠাৎ বুজে আসে। আর সে লোকটা কোনদিন [illegible]। ভাবতে কষ্ট নয় শুধু, ভয় করে।

ল ৭.

বাবার নিশ্বাস নিতে খুব কষ্ট হচ্ছিল; ঘরে বাতাস রুদ্ধ মনে হচ্ছিল, মা'র চোখের দিকে অসহায় দৃষ্টি তুলেছিল মাত্র কটি মুহূর্ত, তারপর চোখের পাতা বুজেছিল। আর পরক্ষণেই মাথা টাল সামলাতে পারেনি। একপাশে কাত হয়ে পড়ে গিয়েছিল। মা নাকি প্রথমটা বুঝতেই পারেনি।

আর সে তখন পানুর সঙ্গে সিনেমা দেখছিল। দুপুরের দিকে পানু রোজই একবার করে খোঁজ নিতে আসত। বাড়ি চুপচাপ। বাইরে ঝাঁ-ঝাঁ রোদ, সব কিছু ম্রিয়মান, আর বাড়ির ভিতরের স্তব্ধতা কল্পনাও করা যায় না। শুধু মাঝে মাঝে ডাক্তার সঙ্গে নিয়ে অতীশদার সন্তর্পণে পা-ফেলা।

দুপুরের দিকে একবার তাকিয়েছিল বাবা অনেকদিন পর তার দিকে স্পষ্ট করে চোখ মেলে। নামটাও একবার উচ্চারণ করেছিল। পরিচ্ছন্ন গলায় ডেকেছিল। উদ্দেশ্য, কি করে বেড়াচ্ছে সে আজকাল—এইটাই জানা। জীবিতাবস্থায় বাবাকে এই শেষ দেখা।

পানু চিরকালই একটু বেশি সাহসী। তার ওপর এ সময় সুযোগ তো না চাইতে-ই পাওয়া। বাবা শয্যাশায়ী। গলা ছেড়ে ধমক দিয়ে বা বিছানা ছেড়ে উঠে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে তো কোন বাধা দিতে পারবে না। এইটাই পানু তাকে ভাল করে বুঝিয়েছে। ক্রমাগত শ্বাস টানার কষ্ট বাবাকে একেক সময় নির্জীব করে রাখে। খানিকক্ষণ এ দৃশ্য দেখে ও পালিয়ে আসে ঘর ছেড়ে। ঠিক মনে হয় দম নেয়ার কষ্টটা তারও কিছু কম নয়। মা কেমন পাথর হয়ে গেছে। ছোড়দি মুখ বুজে সেবা করছে। হঠাৎ কখনো কখনো আঁচলটা মুখে শক্ত করে চেপে নিঃশব্দে ফুপিয়ে ফুপিয়ে কেঁদে উঠেছে। অতীশদার চোখে পড়লে শুধু জিজ্ঞাসা করেছে—কেন এমন কষ্ট বাবার। কি বলছেন ডাক্তারবাবু। পানু তাকে এও বুঝিয়েছে—আর তা ছাড়া বাড়ির আর সবাই তো রয়েছে, অতীশদাও আছে। সত্যি সিনেমা যাওয়ার কী চমৎকার সুযোগ। বড় একটা কাজের জন্যে কেউ তাকে ডাকবে না। আর তাকে বাধাও এখন কেউ দেবে না। ছবিটা দেখেই চুপি চুপি বাড়িতে এসে একবার ঢুকে পড়তে পারলেই হল। যেন কাছাকাছি

কোথাও ছিল। ভাল করে গলা ছেড়ে ডাকলেই কেউ ঠিক তার সাড়া পেত।

বেশ মনে আছে দুপুরের ছবি ভেঙেছিল সূর্যাস্তের সামান্য কিছু আগে। সিনেমা শো ভাঙার পরই রাস্তাটা মুহূর্তে মনে হয়েছিল ডুবে গেছে অসংখ্য দর্শকের পায়ের নিচে। ট্রামের লাইনই দেখা যায় না মনে হয় এক আধবার। পান্নু বলেছিল, তাড়াহুড়ো করিসনে। ভিড় একটু ফাঁকা হোক, লোক সরুক। তারপর ধীরে সুস্থে ট্রাম ধরবে।

এরপর ভেবেছে কতদিন, তাড়াহুড়ো করার সময়ও মানুষ জীবনে বেশি পায় না। পান্নুর কথা ভেবে ম্লান হাসি ফোটে তার মুখে। তাড়াহুড়ো করেও কি ফল হত কিছু? বাবাকে জীবিত দেখতে পেত কি? সূর্যাস্তের সামান্য কটি মুহূর্ত পরেই বাবার মৃত্যু হয়।

মনে আছে, গলির মোড়ে যখন বাঁক নিচ্ছে তখন ল্যাম্পপোস্টগুলোকে স্পষ্ট জ্বলতে দেখেছে দূর থেকে। বাড়ির কাছাকাছি এসেছে যখন পাড়ার বুড়ো সুরেনবাবুকে কাকে জিজ্ঞাসা করতে শুনেছে: কি হয়েছিল?—এই কথাগুলো আর সুরেনবাবুর মুখটা মনে আসে।

বুক ধড়াস করে উঠেছিল। সামান্য কটি কথা। কি ইঙ্গিত ছিল কথা কটায়। বাড়িতে ঢোকার আগেই অতবড় সর্বনাশের খবর না হলে প্রায় বাতাসে তার কানে ছড়িয়েছিল। ঠিক মনে হয়েছিল যে মুহূর্তে বাড়ি ঢোকা ঠিক হবে না। যেন কিছু বিলম্ব ঘটিয়ে দুঃসংবাদকে মিথ্যে করে দেবে। কিন্তু তা হয়নি।

বাড়িতে ঠিক চোরের মতো পা ফেলেছিল। প্রথমেই চোখে পড়েছিল অতীশদা। শার্টের ওপর দিয়ে কাপড়ের কোঁচাটা পাকিয়ে কোমরে বেঁধেছিল। কী ভয়ঙ্কর মুখ মনে হয়েছিল অতীশদার। দিনের পর দিন রাতজাগার কোন পুরস্কার মেলেনি। বরং ব্যর্থতার সমস্ত চিহ্ন অতীশদার সারামুখে, মাথার ধুসর চুলে, দাড়িতে গোঁফে, পুরু চশমার নিচে চোখের কালিতে ছড়ানো ছিটানো। ছোড়দিকে দেখতে পেয়েছিল কাঁদছে। ফুপিয়ে ফুপিয়ে কাঁদছে। অবাধ্য শিশু যেমন বাবা মা'র হাতে নিদারুণ প্রহার খেয়ে কাঁদে। এক সময় এমনও মনে হতে পারে, কোন কিছু এই কান্নাকে ভোলাতে পারে না। এক পলক

ছোড়দির দিকে চেয়ে সেই সন্ধ্যায় তারও মনে হয়েছিল ছোড়দির এই কান্নাও সে রকম অনেকটা। মা'কে দেখতে পায়নি। দেখতে চায়নিও বোধ হয়। শুনেছিল, বাবার মাথার কাছে বসে ছিল পাথরের মানুষ হয়ে। আকাশ পাতাল ভেবেছিল, কোন কূলকিনারা পায়নি দেয়ালের দিকে চেয়ে কড়িকাঠের দিকে তাকিয়ে। ভ্যাপ্‌সা আলো-আবছা ঘরের দুঃস্বপ্নময় পরিবেশে মা একটি মৃত্যুকে কি সহজেই গ্রহণ করেছিল, যে-মৃত্যুই মা'র নারীজীবনের বৈধব্যের সূচনা। মা চেঁচিয়ে কাঁদা তো দূরের কথা, কতোখানি চোখের জল ফেলেছে তাও ভাববার কথা। বাবার জীবদ্দশায় মা'র যে অভিমান, মৃত্যুর প্রথম প্রহরেও বুঝি সেই অভিমান।

পায়ের জুতো জোড়া যে ছুঁড়ে কোথায় ফেলেছিল তা তার মনেই পড়ে না এখন। শুধু মনে আছে বাইরের দেয়ালের কোন এক অন্ধকার কোণে গিয়ে মাথা গুঁজেছিল। ভেবেছিল আর বাড়ি না-ফিরলেও তো চলত। মাণিকতলার ওই রাস্তাটা ধরে সোজা হেঁটে যেত। সমস্ত রাত্তির ধরে হাঁটত। সকালে নিশ্চয় কলকাতার অনেক দূরে কোথাও গিয়ে পৌঁছত। নতুন একটা নাম নিয়ে নতুন কোন এক জায়গায় অন্যরকম ভাবে বাঁচবে। পড়াশুনো যে আর করবে না এ ব্যাপারে সে নিশ্চিন্ত ছিল এক রকম সেই সব মুহূর্তে।

যা যা ভেবেছিল তার একটাও হয়নি। ঘাড় গুঁজে পড়ে ছিল, কতক্ষণ তা তার খেয়াল ছিল না। একটা ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনার দৃশ্য থেকে সে মুক্তি পেতে চেয়েছে। কারো কথাই তার আলাদা ভাবে মনে আসেনি। মা'র কথা নয়, ছোড়দির কথা নয়, অতীশদার কথা নয়—আরো কারা সব এসে দাঁড়িয়েছিল ঘরের বাইরের জায়গাটুকুর ওপর বা রাস্তায় দরজার সামনে। বাবার মৃতদেহের চেহারাটাও একবার চোখের সামনে ভাসেনি। অসম্ভব ঘেমেছিল নিঃসীম অন্ধকারে চোখ দুটোকে ডুবিয়ে। দমবন্ধ হওয়ার কষ্টটা যেন পরীক্ষা করে দেখছিল।

অতীশদা কখন একসময় জোর করে তুলেছেন তাকে ওই জায়গাটা থেকে। নিপুকে সঙ্গে করে পাঠিয়ে দিয়েছেন তাঁদের বাড়িতে। সেখানে গিয়ে সে ঘুমিয়েছে অতীশদার বিছানার ওপর। অতীশদার মাকে দেখেছে মাথার কাছে ঘুম ভাঙলে পর।

তারপর সেদিনকার সেই সন্ধ্যা কখন গভীর মধ্যরাত্রে এসে পেঁৗছেছে। মনে আছে কলকাতার নির্জন মধ্যরাত্রির রাস্তা দিয়ে একখানা ট্যাক্সি ছুটছে। সেই ট্যাক্সির মধ্যে কাদের সঙ্গে সেও আছে। বাইরে থেকে ঠাণ্ডা হাওয়া এসে ক্লান্ত চোখের পাতা খুলে দেয়। বুঝেছে ওই ট্যাক্সিখানা যে-জায়গায় তাদের পেঁৗছে দেবে সেখানে বাবার মৃতদেহকে কারা কাঁধে করে বয়ে এনে রাখবে। হয়তো এতক্ষণে তারা পেঁৗছে গেছে, চলন্ত ট্যাক্সিতে বসে ভেবেছে।

একটা দড়ির খাটের ওপর দেখেছে খোলা জায়গায় খোলা আকাশের নিচে বাবার মৃতদেহ শায়িত। অন্ধকার, অন্ধকার জায়গাটায় বাবার মুখ দেখে এমনও মনে হতে পারে, ভাল করে দেখেছে তো সবাই, প্রাণ নেই। চশমাটা খুলে নেয়া হয়েছে। তবু চোখ দেখে মনে হবে যেন ক্লান্ত হয়ে বিশ্রাম নিচ্ছে। এমন ভাবে চশমা খুলে কতদিন তো বাবাকে চোখ বুজে শুয়ে থাকতে দেখেছে। মাথার চুলে একবার হাত বুলিয়ে দেখতে ইচ্ছে হয়েছিল তার, জীবন্ত মানুষের সঙ্গে পার্থক্য কোথায়। কিন্তু পারেনি। সমস্ত শরীর আড়ষ্ট হয়েছিল। গলা শুকিয়ে কাঠ।

চোখের সামনে যা ঘটেছিল তার সঙ্গে যেন সে সব কিছুর কোন যোগাযোগ নেই। কখন অনেকগুলি ব্যস্ত কণ্ঠস্বর কানে গিয়েছিল। বার বার একটা শব্দ কানের কাছে বেজেছিল, ডেথ সার্টিফিকেট।

শুনেছে, জেনেছে এই ডেথ সার্টিফিকেট ছাড়া মৃতদেহ পোড়ান যায় না। তা সে মৃতদেহ বাবারই হোক না কেন।

আস্তে আস্তে রাত্রির প্রহরগুলো কোথায় মিলিয়ে গেল। ভোরের আকাশের দিকে তাকিয়ে তার এই মিলিয়ে-যাওয়ার কথাটা মনে হয়। আকাশ ঠিক আলোয় সাদা নয়, কিন্তু অন্ধকার ফিকে হতে শুরু হয়েছে। গতায়ু রাত্রির শেষ অন্ধকারটুকু নিশ্চিহ্ন হতে চলেছে। কিছুক্ষণ পরে আকাশ আরো স্বচ্ছ হবে। অন্ধকারের যেমন কোন চিহ্ন থাকবে না গত রাত্রির সামান্য কিছুরও।

কলকাতা শহরে এমন ভোর তার জীবনে আর একটিও আসেনি। সেদিনের সেই ভোর তাদের জীবনের একটানা কর্মপদ্ধতিতে একটা আমূল ওলটপালট ঘটিয়ে গেল। গতানুগতিক জীবনকেই মনে হয়েছিল অনেক

শ্রেয়। কত বাড়িতেই তো এমনি করে ভোর হয়েছে। সেখানে তো বাঁধাধরা জীবনে এতটুকু পরিবর্তনের আঁচড় লাগেনি। সকালের চায়ের ব্যস্ততা লাগবে। যে যার কাজে বেরুবে। আর বাড়ির কোলাহল ছেড়ে শহরের বিপুল ব্যস্ততায় মিশে যাবে।

কলকাতা শহরের আকাশে সেদিন ভোর দেখে শহরের ব্যস্ততা সম্বন্ধে কত কথাই মনে হয়েছে এক সঙ্গে।

গঙ্গায় চান করছে অনেক লোক নিয়মিত অভ্যাস অনেকের। আবার মৃতদেহবাহীদেরও ছিল অনেকে। ভোরের ট্রাম চলার শব্দ কানে আসে। খুব দ্রুত চলছে। এখন তো শুধু এইরকম দুটো একটা শব্দ। ভোরের ট্রাম চলার বা গঙ্গাস্নানার্থীদের কারও কারও উচ্চ কণ্ঠে মন্ত্রপাঠের। আর কিছুক্ষণ পরে কতগুল শব্দে যে মুখর হবে এই শহর ভাবতেও পারা যায় না। তাদের সরু গলিটাতেও আজ সকাল হয়েছে। আনাচকানাচ থেকেও অন্ধকার সরছে। আর বাড়িটায়।

বাবার দুয়েক জন আত্মীয় বন্ধু, মা'র দূর সম্পর্কের কেউ কেউ ঠাসাঠাসি করে শুয়ে বসে সারারাত ধরে সান্ত্বনা দিয়েছে মাকে। সহানুভূতি প্রকাশ করেছে কান্নাকাটি করে, বাবার নাম ধরে ডেকে গলা ছেড়ে। তারপর আস্তে আস্তে দুপুরের স্তব্ধতা বাড়িটার বাতাস ভারি করে তুলবে। বিকেলের মুখে সব কিছু কেমন বিষণ্ণ ঠেকবে। অনেকে যারা এসেছিল সান্ত্বনা দিতে সহানুভূতি জানাতে তাদের বেশির ভাগই চলে গেছে। আর সন্ধ্যা নামলেই কেমন ছমছম করবে। বাকি সামান্য দুয়েক জন যারা ছিল তারাও প্রায় সব চলে যাবে। শুধু চোখের সামনে বড় হয়ে থাকে একজনের চেহারা, অতীশদার পাতলা লম্বা চেহারা। ছোড়দির হয়ে অতীশদাই জ্বেলেছে হ্যারিকেনটা। বুঝেছিল সেদিন থেকেই অতীশদা সক্রিয় ভূমিকা নিতে শুরু করলে তাদের সংসারে। তার আর ছোড়দির জীবনে যে-পরিবর্তন নেমে এল সে-পরিবর্তন যেন অতীশদার জীবনেরও। আর মা তো সম্পূর্ণ নতুন জীবন শুরু করল নরুনপেড়ে ধুতি পরে। হাত মা'র বাবার জীবদ্দশাতেও প্রায় খালিই ছিল। তাই পরিবর্তন খুব লক্ষণীয় ঠেকেনি চুড়ির ক্ষেত্রে।

বাবার ফোটোখানার দিকে একবার চোখ তুলে ক্ষণিকের জন্য কি ভাবল, তারপরই মাথা নিচু করে দুহাতে মুখ ঢেকে অস্ফুট স্বরেই বলল, আচ্ছা বাবা, কি প্রত্যাশা ছিল মা'র তোমার কাছে ?

কোন প্রত্যাশা নয়—উত্তর পেয়েছিল মনের কাছে।

কোনদিনও মা তোমার কাছে একটুকরো সোনা তো দূরের কথা, ময়লা ছেঁড়া দুর্গন্ধ কাপড়ের বদলে সাধারণ নতুন একটুকরো কাপড়ও চায়নি—

না চায়নি, কোনদিনের জন্যেও না।

নিজের ছেলের জন্যে কিছু চেয়েছে, পেটের মেয়ের জন্যে ?

কিচ্ছু চায়নি।

ছোড়দিকে স্কুল থেকে ছাড়িয়ে নিয়েছিলে কেন আমার কাছে তখন তা স্পষ্ট হয়নি, ছোড়দির কাছেও বোধ হয় না। ভেবেছিল মেয়েদের লেখাপড়া শেখা তুমি পছন্দ কর না। মা তো তাই বুঝিয়েছিল। কিন্তু মা কি সব জানত না ?

সব জানত। সব জানত তোমার মা। আমার জন্যেই মিথ্যে কথাগুলো সাজিয়েছিল—

মাকে তবু তুমি ঠকালে ?

হ্যাঁ, সবায়ের কাছে ঠকে তোমার মাকেই ঠকিয়েছি শুধু।

সারা জীবনে মাকে তুমি একটিবারও জানতে চেষ্টা করেছিলে সহানুভূতি দিয়ে, মাকে তুমি বুঝতে পেরেছিলে একটি মুহূর্তও ?

জীবনের প্রতি পদক্ষেপে তোমার মাকে জেনেছি। তোমার মাকে যদি বুঝতেই না পারব তো প্রতিদিন অত মিথ্যে কথা কি করে সাজিয়েছি। কি করে নিত্যনতুন আশ্বাস দিয়েছি—হবে হবে, একটু ধৈর্য ধর। অমন অস্থির হলে কি সংসারে চলে ?

মা বিশ্বাস করেছে, ধৈর্য ধরেছে !

পুরোপুরি বিশ্বাস করেছে তোমার মা। সারা জীবন ধৈর্য ধরেছে। তা না হলে আমার ওই অক্ষমতা আমি কি দিয়ে ঢেকে রাখতুম বল—

কেন তোমার ওই অক্ষমতা ? তুমি তো অশিক্ষিত নও।

আমিও ভেবেছি একথা অনেকবার যখন আজকের তোমার মত ছিলাম, কিন্তু হল কি ?

তুমি কি তার জন্তে দায়ী নও ? তোমার পৌরুষকে তুমি বিশ্বাস করতে পারনি, আত্মবিশ্বাসকে অপমান করেছ।

তোমার সব কথাই হয়তো আজ মানতে হবে, নইলে তো মানতে পারি না আমি হেরে গেছি।

তোমার এই ভাবালুতাই সর্বনাশ করেছে আমার, আমাকে ওটার উত্তরাধিকারী করে রেখে গেছে। বলতে পার কি এমন বেশি চেয়েছিল ছোড়দি মেয়ে হয়ে বাপের কাছে ? লেখাপড়া শিখতে চেয়েছিল, সামান্ত সাধারণ ইচ্ছা একটি মেয়ের ! কেন তুমি অতীশদার অনুরোধ অমন করে পায়ে ঠেলেছিলে ?

পায়ে ঠেলার কথাই বললে যখন জোড়হাত পাতার খবরটাও কি জানবে না। জোড়হাত যখন পেতেছি তখন অতিরিক্ত যা মিলেছে তা ভালবাসার বা সহানুভূতিরও নয়, দয়ার। আর প্রাপ্য মূল্য যখন ফিরে পেয়েছি ও তুটি হাতে তখনও অনুভব করতে পারিনি প্রাপ্যমূল্যও ভিক্ষার দান হয়ে আসে। উন্মুক্ত ভিক্ষাপাত্রে যেমন করে মুদ্রা ফেলে লোকে আমার পাতা জোড়হাতের ওপরও তেমনি করে—

তুমি কণ্ঠে কেন প্রতিবাদ তুলতে পারনি। তোমার কণ্ঠ তুর্বলের, তোমার কাঁপা হাত অক্ষমের। আর আমার কথা ? ছেঁড়াতালি দেয়া জামা পরে, আধপেটা খেয়ে, সাততালি দেয়া জুতো পরে, যতরাজ্যের পুরনো পাতাছেঁড়া বই এখান থেকে ওখান থেকে যোগাড় করে করে— যাক আমার নিজের কথা, ছোড়দির কথাও ছেড়ে দিলুম। কিন্তু মা ? মাকে তুমি শেষকালেও অমন করে ঠকিয়ে গেলে কেন ? মা'র একটি মাত্র প্রত্যাশা তুমি রাখতে পারতে না ?

কি ?

তুমি কি আরো কিছুদিন বাঁচতে পারতে না ? মা তো আর কিছু চায়নি। শুধু চেয়েছিল আরো কিছুদিন বেঁচে থাকো। মানুষ বাঁচার অবলম্বন সংসারে অনেক সময় অনেক কিছুতে খুঁজে পায়। কিন্তু মা'র বাঁচার অবলম্বন একমাত্র তুমি। ওই ছোট্ট বাড়িটার চারদেয়ালের বাইরে ঠিক কতবার জীবনে পা ফেলেছে তা তুমি জানো ? তবু মা'র ওই একটি প্রত্যাশাই ছিল তোমার কাছে। তুমি বেঁচে থাকবে। মা বুঝতে

পারছে, মা ঠকছে, মা অর্থহীন সান্ত্বনায় ভুলছে, তবু মা'র ইচ্ছা তুমি বেঁচে থাকবে। কেন তা মা'রই ভাল জানা। তবু তো কই তুমি বাঁচতে পারলে না—

মনের মধ্যে যে কথাগুলো এতক্ষণ আওড়েছে নিজের কানের কাছেই তার প্রবল প্রতিধ্বনি শুনতে পেয়ে যেন হঠাৎই সম্বিৎ ফিরে পেল নিমেষের জন্য।

শেষের কথাগুলোর উত্তরের প্রত্যাশায় মুহূর্তকাল নীরব থাকতে চাইল। কিন্তু কোন উত্তর মেলে না। পরক্ষণেই ভেবেছে, তাও তো বটে, মা'র প্রত্যাশানুযায়ী তোমার বেঁচে থাকবার কথা। কিন্তু তুমি বাঁচতে পারনি। সেইখানেই তো সব ফুরিয়ে গেল। তুমি মৃত। প্রাণহীন। আর কী উত্তর পেতে পারে তোমার কাছ থেকে জীবিত মানুষ।

দুই করতল থেকে মুখ একটু তুলে ঘামে-ভেজা কররেখাগুলির মধ্যেই দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখে। ওই হস্তরেখাগুলির মধ্যে কি এতক্ষণের এত প্রশ্নের ও প্রশ্নোত্তরের যত সমস্যা তার সমাধান মিলবে মনে করে। সত্যিই তো কররেখাগুলির দুর্বোধ্য ভাষা একবার কষ্ট করে যদি কেউ পড়তে পারে তো অনায়াসে জানতে পারে, কখন কা'র পিতৃবিয়োগ কখন বৈধব্যযোগ, কখন মাতৃবিয়োগের শোক বা সংসারযাত্রার দুর্বিষহ যন্ত্রণাভোগ। কররেখাগুলির দুর্বোধ্য ভাষার অর্থোদ্ধার করতে পারে এমন কারো কাছে ছুটে যাবে মনে হয় এ মুহূর্তেই।

দুটি হাতে মুখের দুপাশ মোছে, দুই করতল থেকে ঘাম মুছে ফেলে ঘষে ঘষে। পরে চোখ ঢাকে, কপালও ঢাকা পড়ে দু হাতের মধ্যে। মুখের নিম্নভাগ অনাবৃত থাকে শুধু। হাসে আপনার মনে হঠাৎই কথাটা ভেবে। চোখ বুজে থাকলে মানুষ কিছু দেখতে পায় না, চোখ খুললেই তবে সে সব কিছু দেখতে পায়। এই তো চোখ খুলেছিল, দৃষ্টি রেখেছিল দেয়ালের ঠিক জায়গায়। ছবির ফ্রেমের দাগ ছাড়া তো কিছু চোখে পড়ে না। কিন্তু চোখ বুজলে? যতবার চোখ বোজে ও জায়গায় বাবার ছবিখানাই দেখতে পায়। ছবিতে বাবার চোখে চোখ রাখতে পারে।

আর বাবার ওই ফোটোখানার দিকে অপলক তাকিয়ে সে একসময় আবিষ্কার করত বাবা সত্যিই তার দিকে তাকিয়ে আছে কিনা।

বাবার মৃত্যুর পর অতীশদা নিজে দেখেশুনে এই বাড়িটাই ঠিক করেছিল। মা অতীশদাকে বলেছিল, আর একদণ্ডও এখানে মন টেঁকছে না বাবা, তুমি এ বাড়ি ছেড়ে যেখানে পার আমায় নিয়ে চল। প্রাণটা কেবল হু-হু করে।

অতীশদা সম্পূর্ণ নিজের দায়িত্বে এ-বাড়িতে এনে তোলে মাকে, ছোড়দিকে আর তাকে। কি করে যে অতীশদা এমন ভাল বাড়ির ভাড়া সামলেছিল প্রথমটা তা ভেবে ছোড়দি অবাক হয়েছিল। মা শুধু বাড়ি বদলাতে চেয়েছিল, কেমন করে সম্ভব তা ভেবে দেখতে চায়নি। আর সে? অতীশদার কোমর জড়িয়ে ধরে লাফিয়েছিল। পরে জেনেছিল অতীশদারই এক ঘনিষ্ঠ বন্ধুর বাড়ি। বন্ধুর দুটি ছোটভাইকে পড়ানোর দায়িত্বে অতীশদা বাড়িভাড়া যথাসম্ভব কমাতে পেরেছিল।

বাড়ি বদলের পর ছোড়দির ইচ্ছা ছিল একটি ঘরের দেয়ালে শুধু টাঙানো থাকবে বাবারই একখানা ফোটো। ছোড়দির ইচ্ছা মতো তাই টাঙানো হয়েছিল বাবার ফোটোখানা। বাবার মৃত্যুর পর বাবার ছোট একখানা ফোটো থেকে বড় করানো হয় ওখানা। তাও কি মনে করলেই ছবি পাওয়া যায় না কি? অনেক কষ্টে মা বিয়ের তোরঙ্গ থেকে খুঁজে পেতে বার করেছিল ফোটোখানা। অনেক আগেকার একখানা ফোটো।

তারপর কি করে একদিন দড়ি ছিঁড়ে যেন পড়ে গিয়েছিল ছবিখানা। আর পড়া মাত্রই টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে গিয়েছিল ছবির কাচ। তারপর ভাঙা কাচ সরিয়ে, খবর-কাগজে মুড়ে একপাশে সরিয়ে রাখা হয়েছিল ছবিখানা। কবে একদিন ছোড়দির চোখে পড়ল উই ধরেছে ছবিখানায়। রোদ্দুরে রেখেও বিশেষ ফল হল না। আবার ভার পড়ল অতীশদার ওপর, ছবিখানার সংস্কার করার।

ছবিখানা দেয়ালে টাঙানোর প্রথম কয়েকটা দিন পরই তার কেমন খেয়াল হল পরীক্ষা করে দেখে, ছবির বাবা ঠিক তার দিকে চেয়ে আছে কিনা। ফোটোর দেয়ালের মুখোমুখি সোজা অন্য দেয়ালের গা-ঘেঁষে

দাঁড়িয়ে একদৃষ্টে তাকিয়ে থেকেছে বাবার চোখের দিকে। কী আশ্চর্য, ঠিক মনে হয়েছে বাবা তার দিকে তাকিয়ে আছে অপলক। এরপর ইচ্ছা যায় দেয়ালের এক কোণ থেকে দেখে। দেখলে বাবার চোখ ঘুরে ঠিক কোণাকুনি হয়ে তার দিকের চেয়ে আছে। আবার হয়তো অন্ত কোণে চলে গেছে, দেখে বাবার চোখ ঘুরে ঠিক তার দিকেই পড়েছে। পরে এক সময়ে মনে হয়েছে দেয়াল থেকে পেড়ে ছবিখানা একবার কোলের ওপর রেখে দেখে। খুব কাছ থেকেও তাই মনে হয় কিনা।

ভাবলে যে কত কথাই মনে আসে একে একে। হাসি চাপতে পারে না। কিন্তু এমন হঠাৎ হঠাৎ হাসির ক্ষণিক লঘুতা কিন্তু মনের স্থায়ী অস্থিরতা ও বেদনাভার থেকে মুক্তি দিতে পারে না। এতক্ষণ যেন একটা দ্বন্দ্ব চলছিল নিজেরই সঙ্গে। ভীষণ ঘেমেছে ও তার সঙ্গে কেমন যেন দুর্বলভাব। খুব কড়া ঘুমের ওষুধ খেয়ে লোকে যেমন ঘামে কুলকুল করে, আর খুব দুর্বল-দুর্বল মনে হয় সমস্ত দেহ, আর কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘুমে অবশ হয়ে আসে সারা শরীর, তার ঠিক সেই অবস্থা এখন। নিজেকে অনেকদিন এমন দুর্বল আর ক্লান্ত মনে হয়নি তার। এ-রকম ঘামল কেন হঠাৎ? জ্বর আসবে নাকি ঘাম শুকিয়ে গেলে? চোখ দুটো জ্বালা-জ্বালা করতে শুরু করেছে। কপালটাও গরম গরম ঠেকছে। বেশ কয়েক গ্লাস জল খাওয়ার দরকার। না-হলে ত তেষ্টা মিটবে না।

অনেকক্ষণ সিগারেট খায়নি। দেশলাইটা সামনে ছিল। হাতে তুলে একবার নাড়া দেয়। ভিতরের সব কাঠিগুলো একটা শব্দ তোলে। পিছন ফিরে হাত বাড়িয়ে সিগারেটের প্যাকেটটা টানতে যায়, দেখে স্মৃতিরেখা বসে আছে। নির্বাক নিস্পন্দ। ভীষণ লজ্জা পায় মনে মনে। কতক্ষণ বসে আছে স্মৃতি এমন ভাবে? তার সব কিছু লক্ষ্য করেছে? তাকে পাগল মনে করেছে, না ছেলেমানুষ? স্মৃতি তো অন্যায় কিছু করেনি, এ-ঘরে এমন করে ঢোকার দাবি তার আছে। কিন্তু সে? কি ছেলেমানুষী করেছে সে এতক্ষণ ধরে স্মৃতির সামনে?

স্মৃতি শুধু হাত বাড়িয়ে সিগারেটের প্যাকেটটা এগিয়ে দেয় তার দিকে। হাত বাড়াতে গিয়েও যেন মনে হয় পারে না। খালি মনে হয় কী ভেবেছে স্মৃতি ?

বিছানার এক কোণায় বসে ছিল স্মৃতি। স্মৃতি কি বুঝতে পারেনি ও নিজেকে অপ্রকৃতিস্থ মনে করছে। স্মৃতির হাত থেকে সিগারেটের প্যাকেটটা নিতে নিতেই জিজ্ঞাসা করেছে—কতক্ষণ এসেছ ?

এইমাত্র, মুখে অন্যমনস্ক হাসি টেনে কথার উত্তর দিয়েছে স্মৃতিরেখা।

স্মৃতির হাসিকে বিশেষ কোন মূল্য না-দিয়ে, আপাতত হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছে। বলেছে, ডাকনি কেন ?

কি করে ডাকব—আর বেশি বলার প্রয়োজন হল না বুঝি স্মৃতির। আশ্চর্য সমব্যথী মন স্মৃতির। কেমন করে ওর মত মেয়ে এই মন তৈরী করেছে।

সত্যি করে বল ত কতক্ষণ এসেছ ?—ফের জিজ্ঞাসা করে।

অনেকক্ষণ—খুব ছোট উত্তর দেয় স্মৃতি।

তা হলে অনেকক্ষণই বসে আছে তার পিছনে ? সব দেখেছে। তাই হেসেছে মুখ টিপে। সিগারেট ধরায়। কটা কাঠি পর পর নষ্ট করে। একটু সময় নেওয়ার অছিলা, স্মৃতি কি এও লক্ষ্য করছে নাকি। এক মুখ ধোঁয়া টানে। তারপর আস্তে আস্তে একটু একটু করে ধোঁয়া ছাড়ে সময় নিয়ে। অন্য প্রসঙ্গে যাওয়ার প্রয়োজন অনুভব করে। জিজ্ঞাসা করে, এলে না কেন কাল সন্ধেয় ?

স্মতি নিরুত্তর থাকে। ওকে আবার জিজ্ঞাসা করতে হয়, কই বলছ না, কেন এলে না কাল—

মনে হল স্মৃতি এবারেও নিরুত্তর থাকবে। কিন্তু মৌনতা ভাঙল, বলল, বাইরে না বেরুলে আমি কিচ্ছু বলব না।

তার মানে স্মৃতিরেখাকে নিয়ে তাকে এখন বেরুতে হবে রাস্তায়। কোথায় যাবে স্মৃতি ? আচ্ছা, যাবে কোথায় এখন ?

কোথায় আবার ?—এরই মধ্যে স্মৃতি সব কিছু প্রচ্ছন্ন রাখে। অর্থাৎ যাবার তো একটিই জায়গা আছে।

তা রোদ আর একটু পড়ুক—

রাস্তায় নামতে নামতেই পড়বে—

তাড়া কেন এত ?

আমায় একটু সকাল-সকাল ফিরতে হবে।

সব সহ্য হয়, কিন্তু মাঝে মাঝে স্মৃতির এই সকাল সকাল ফেরার কথায় একমুহূর্তে যত উৎসাহ যেন এক সঙ্গে নিবে যায়।

তুমি কি আজকাল কব্জিতে শক্ত করে সময় বেঁধেছ ? কথাটা অবিশ্যি আমার নয়—

কার ?

রবীন্দ্রনাথ টেগোরের—

স্মৃতি হেসে ফেলে ওর টেনে টেনে বলার কৃত্রিম ঢঙে। বলে, যাঁরই হোক—আমার কব্জিতে বাবার দেয়া ঘড়ি বেঁধেছি।

তারপর বাঁ হাতটা ওর চোখের সামনে উঁচু করে তুলে ধরে, অর্থাৎ সময়টা জানিয়ে দেয়।

॥ ৪ ॥

রাস্তায় পা-ফেলে প্রথম যে-কথাটা মনে এল তা, এ-সময়ে স্মৃতি এসে যদি তাকে রাস্তায় টেনে এনে বার না-করত তো ওই ঘরের মধ্যেই সম্ভবত আজ গভীর রাত্রে মা তাকে অচৈতন্য অবস্থায় দেখতে পেত। স্মৃতিকে ঘরের মধ্যে উপবিষ্ট দেখার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্তও তার মানসিক অবস্থায় যে কী বিপর্যয় ঘটেছিল তা সে কাউকে খুলে বোঝাতে পারে না। এমন কি ঠিক এই মুহূর্তে স্মৃতিও যদি কিছু জানতে চেয়ে প্রশ্ন করে তো তাকে নিরুত্তর থাকতে হবে, কিম্বা অন্য কোনো হাল্কা প্রসঙ্গে মোড় ফেরাতে হবে। কি করেই বা বোঝাতে পারে সে ঠিক যা যা তোলপাড় করেছে তার মনকে বা সমস্ত দুপুর জুড়ে আচ্ছন্ন করেছে তার চেতনাকে।

স্মৃতি যখন তাকে বাসে তুলল তখনও সে আন্দাজ করতে পারেনি ওর গন্তব্য স্থান কোথায়। দোতলা বাসের ওপরে উঠে এল দুজনে। নিজের জায়গায় ভাল করে বসে ও একবার ভেবেছিল জিজ্ঞাসা করে স্মৃতিকে, কোথায় যাচ্ছে ওরা। ওর হাঁটার ভঙ্গিতে, মুখের চেহারায়, কণ্ঠের নীরবতায় যেন ঐটাই বার বার প্রকাশ পাচ্ছিল, যেখানে নিয়ে যাচ্ছি চল না। সব সময় প্রশ্ন কর কেন। সত্যিই বাসে ওঠার আগে পর্যন্ত ওদের কটা কথা হয়েছে? দুজনেই প্রায় নিঃশব্দে হেঁটেছে। এত মন্থর হেঁটেছে ও যে মাঝে মাঝে স্মৃতি ওর চেয়ে এগিয়ে গিয়েছিল। স্মৃতি পিছন ফিরে তাকিয়েছে। কেমন অন্যমনস্ক চোখে তাকিয়ে আবার স্মৃতির পাশাপাশি এসে হাঁটতে শুরু করেছে। নিজেকে হঠাৎই মনে হয় ছেড়ে দিয়েছে স্মৃতির ইচ্ছার হাতে। সে তার কৌতূহলকে পরীক্ষা করছে, বেশ করুক।

বাস এসপ্ল্যানেড ছাড়াল। তারপর কখন হঠাৎ গতিবেগ বাড়াল।

এবার রাস্তা ফাঁকা। শহরের দক্ষিণ অভিমুখে হাওয়ার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে অত বড় দেহটা নিয়ে যেন হাতির মতো ছুটছে। স্মৃতির ডান দিকের কিয়দংশ তার বাম বাহু, উরু বা পায়ে এসে লাগছে ঘন ঘন বাসের ঝাঁকুনিতে। তাকিয়ে দেখে এক পলক স্মৃতির দিকে। ও কেমন আনমনে তাকিয়ে আছে জানলা দিয়ে। কপালের ওপর কয়েকটা চুল বার বার উড়ে এসে লাগে। সে প্রায় ততোবারই সরিয়ে সরিয়ে দেয় বাঁ-হাত দিয়ে। তার চুলের অস্পষ্ট গন্ধ শুধু সুন্দর নয়, সে নিজেও সুন্দর। পাশ থেকে বা নিচু করা অবস্থায় স্মৃতির মুখ কিন্তু আরও কোমল। সামনে থেকে ওর মুখে কেমন একটা চাপা দম্ভের ভাব ছড়ান থাকে। যারা ওকে চেনে না ভাল করে তারা ভুল বুঝে ফেলতেও পারে। ওর চেহারার এই একটা অসুবিধে, একথা অনেকবারই মনে হয়েছে তার। চলন্ত ট্রামে বাসে যেতে যেতে ওকে এই একটি বিশেষ ভঙ্গিতে দেখে সে মুগ্ধ হয়। আজও মুগ্ধ হল। হাতের কনুয়ের ওপর ভর করে গালের একটা পাশ হাতের তালুতে চেপে, মাথাটা একটু কাত করে ঘাড়টি উঁচু করে প্রায় অপরূপ ভঙ্গিতে তাকিয়ে থাকে জানলার মধ্যে দিয়ে উদাস চাউনি মেলে।

সামনের সিটেই বসেছে একটি বিবাহিতা মেয়ে। সঙ্গে বোধ হয় মেয়েটির স্বামী। মেয়েটি বেশ কয়েকবার পিছন ফিরে ফিরে দেখল স্মৃতিরেখাকে। স্মৃতির চোখ তার দিকে পড়েছে কিনা সে বুঝতে পারে না। মেয়েটি সাজার নিখুঁত চেষ্টা করেছে, কিন্তু পারেনি। ঘাড়ের তলাটা এমন ঘেমেছে যে পাউডার উঠে উঠে গিয়ে কতগুলো লোম ঘাড়ের কাছে সাদাটে মনে হয়। পাউডার উঠে গিয়ে মুখ আর কপালের রঙও ভিন্ন মনে হয়। খুব তাড়া করে ঘাড়ে মুখে পাউডার বুলিয়েই বোধ হয় স্বামীর তাড়ায় বেরিয়েছে। আয়নার সামনে দাঁড়ায়ও নি ভাল করে। দেখে এমন কল্পনা করাও অস্বাভাবিক নয়, মেয়েটি শহুরে জীবনে এখনও তেমন অভ্যস্ত নয়। ওর স্বামীটিই বা কি? চোখে দেখতে পাচ্ছে না? একবার বলতেও তো পারে ঘাড়ে আর সারা মুখে রুমালটা একবার আলতো বুলিয়ে নিতে। স্ত্রীর রূপ সম্পর্কে কি ওর কোন দায়িত্ব নেই। স্মৃতির ব্যাপার হলে ও এখুনি

তাই করত। মেয়েটির মুখের দিকে তাকিয়ে কেমন অস্বস্তি বোধ করে।

মেয়েটি ফের আরেকবার ঘাড় অল্প ফিরিয়ে দেখে নেয়। ও কি বুঝতে পারে, না-সেজেও কী অপরূপ সেজেছে স্মৃতি? কিম্বা সেজেও বেশ একটা আটপৌরে ঢং ছড়িয়ে রেখেছে দেহের সর্বত্র। স্মৃতি ওর দিকে মুখ ফেরাল। তারপর আস্তে একটু ঠেলা দিল উঠতে বলে। এবার ওর সব কিছুই লক্ষ্য করল মেয়েটি। দু চোখের দৃষ্টিতে অবাক-অবাক ভাব। যেন এমন করে তার স্বামীই তাকে নামতে বলতে পারে।

ও জানলার মধ্য দিয়ে ডান দিকে চাইল। আশ্চর্য! ওর মন কোথায় ছিল আজকে। স্মৃতি যে তাকে আজ এখানেই টেনে আনছে, তা তার একবারও মনে হয়নি। এখন বার বার মনে হয়, এ-জায়গা ছাড়া আজ বিকেলে কোথায় বা আনতে পারত তাকে! বিশেষ করে তার মনের এই অবস্থায়।

বাস থেকে নামবার পর এক মুহূর্ত দাঁড়াতে হল। বাসটা চলে যাওয়ারই আগেই পিছন থেকে একখানা মস্ত প্রাইভেট গাড়ি দুরন্ত বেগে চলে গেল। আর তারপরই সামনে রাস্তা ফাঁকা। ওরা খুব কাছাকাছি হয়ে পার হল রাস্তাটা দুজনে। চোখের সামনেই সাদা দীর্ঘ গির্জেটা। ওদের বহুদিনের ভীষণ চেনা, প্রিয় জায়গাটিতে তাকে নিয়ে এসেছে স্মৃতিরেখা।

রাস্তা পার হয়ে আবার হাঁটল সামনের দিকে ওরা। অল্প একটু এগিয়েই ডান দিকে বাঁক নিল দুজনে। ওরা ওদের পুরনো জায়গায় এসে বসবে। এমনি ভাবেই ঘুরে আসতে হয় ও-জায়গায় পৌঁছতে হলে। কলকাতার মধ্যেই এমন কয়েকটা জায়গা আছে যা বিশেষ বিশেষ সময়ে ওর মনে হয়েছে কলকাতার মধ্যে নয়। আর এ-জায়গাটা সম্পর্কে তার ও-কথা সবচেয়ে বেশি খাটে।

দুপাশে উঁচু ঢালু ঘাসঢাকা জমি। মাঝখানে একটি জলরেখা ঘুরে বেঁকে গেছে। মাঝে মাঝে বেশ স্বচ্ছ মনে হয়েছে ওই জল। কোন ক্ষীণকায়া স্রোতস্বিনীর সঙ্গে তুলনা করতে ইচ্ছে হয়। ঘাসঢাকা

সবুজ জমি জলের একেবারে ধার পর্যন্ত নেমে এসেছে। স্মৃতি কতদিন নেমে গেছে, দাঁড়িয়ে কোমর পর্যন্ত নিচু করে নিজের ছায়া দেখেছে ঝুঁকে স্বচ্ছ নিস্তরঙ্গ জলে। ও গাছের নিচে নিজের জায়গায় বসে দেখেছে দূর থেকে।

গাছের নিচে ওদের পরিচিত জায়গাটা অনেকদিন পর আবার চোখে পড়ল তার হাঁটতে হাঁটতে দূর থেকে। একদিন ওখানে একটি হিন্দুস্থানী লোক বিড়ি খাচ্ছিল বেশ আয়েস করে লম্বা লম্বা টান দিয়ে শব্দ করে। লোকটা ভীষণ জোয়ান। মস্ত মোটা মোটা পা আর নগ্ন উরু দেখা যাচ্ছিল। পরনের কাপড় অনেকখানি গুটিয়ে ওপরে তুলেছিল। কি রাগ স্মৃতির ওকে ওই জায়গায় বসতে দেখে। ওকে কি করে ওই জায়গা থেকে তোলা যায়, কেবল সেই কথা জিজ্ঞাসা করেছিল। কিম্বা সরাসরি গিয়ে অনুরোধ জানাবে, উঠে গিয়ে যদি অন্য জায়গায় বসে। আচ্ছা আবদার। সে বলেছে, কেন ওটা কি তাদের কেনা জায়গা নাকি ?

হ্যাঁ কেনাই তো।

বেশ, তবে প্রমাণ দেখিয়ে জায়গা দখল কর, ও বলেছে নিজেকে ছেড়ে দেবার ভঙ্গিতে। লোকটাকে অনুরোধ করবার দরকার হয়নি। কিছুক্ষণ পর ও নিজেই ও-জায়গাটা ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছিল। ওরা এসে আবার নিজেদের জায়গা দখল করে। অন্তত স্মৃতির দ্রুত পা-ফেলার চেষ্টায় ওর সেদিন তাই মনে হয়েছিল।

আজ গাছের নিচে ওদের জায়গায় কেউ বসে নেই। ওরা খুব ধীরে হেঁটে এসে বসল জায়গাটায়। স্মৃতির বসা ও লক্ষ্য করে। বেশ সন্তর্পণে কাপড় বাঁচিয়ে বসে ঘাসের ওপর বিছানো অনিন্দ্যর রুমালখানার ওপরে। অনিন্দ্য নিজে বসে ওর কাছ থেকে প্রায় একহাত তফাতে। ওরা সামান্য দুয়েকটা হুঁ হাঁ ছাড়া প্রায় সমানে নীরবে এসেছে সমস্ত পথ, এখানে এসেও হেঁটেছে নীরবে। সে কথা না-বলেই প্রথামত রুমালখানা পেতে দিয়েছে, আর স্মৃতিও বিনা দ্বিধায় বসে পড়েছে।

ওর এবার প্রথম কর্তব্য পকেটের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে হাতড়িয়ে সিগারেটের প্যাকেটটা বার করা। কত কি সব টুকরো কাগজে, কয়েকদিন

আগে-পাওয়া পোস্টকার্ডে পকেট মাঝে মাঝে এমন ভারি হয়ে ওঠে যে সিগারেটের প্যাকেট পকেটেই আছে টের পাওয়া যায় না। মাঝখানে চুপসে কাগজের ভিড়ে, অন্যমনস্কে পকেটের ওপর চেপে বসায়, কেমন ভেঙে তুমড়ে, খানিকক্ষণের জন্যে হারিয়ে যায় প্যাকেটটা। হাত ঢুকিয়ে এলোমেলো কাগজগুলোর কথা অনুমান করতে করতে কয়েকটা আঙুল দিয়ে আলগা করে তুলে আনে সেটাকে। বার করে দেখে প্যাকেটটাই শুধু চুপসে যায় নি ভেতরের অবশিষ্ট কটি সিগারেটও। একটা সিগারেট হাতে করে সমান করতে করতে নাকে টেনে গন্ধ নেয়। তারপর দেশলাই খুঁজতে গিয়েই অনুভব করে ও পকেটের বাইরে থেকে, ফেলে এসেছে। স্মৃতি এতক্ষণ নীরবে ওর সব কিছু লক্ষ্য করছিল, এবার কী একটা বলবার জন্যে প্রস্তুত হতেই ও উঠে দাঁড়ায়, বলে, আসছি— এক মিনিট।

ওর এই এক মিনিট নিয়ে কতবার যে স্মৃতি ওকে নাজেহাল করেছে। বলেছে, অনিন্দ্যর এক মিনিট মানে তো ঘড়ির কমসে কম পাঁচ মিনিট। তাই ওটা না বললেও তো সে জানে যে পাঁচ মিনিট সময় চাইছে। তারপর মুদ্রাদোষ বিষয়ে একটি নাতিদীর্ঘ বক্তৃতাও দেয়। স্মৃতি বেশ কিছুক্ষণ কথা বলে গেলে, একটু থামিয়ে দিয়ে বলে, কতক্ষণে শেষ হবে মনে হয়? তারপর ঘড়ির দিকে চোখ নামিয়ে বলেছে, আচ্ছা আর এক মিনিট—

তারপর দুজনেই হেসে ফেলেছে।

ও উঠে যায়। সিগারেট খেতে খেতে একটি লোক এলোমেলো পায়চারি করছিল। ও তার কাছে গিয়ে তার সিগারেটের আগুন থেকে সিগারেট ধরাল। তারপর এসে বসল নিজের জায়গায়। পিছন ফিরে একবার চায়। লোকটার নজর যেন ভাল করে পড়ল তার ওপর, অনুমান ওর মিথ্যে নয়। লোকটা এবার উপলব্ধি করেছে স্মৃতি তারই সঙ্গে এসেছে। কথাটা ভেবে হাসি পায় তার।

হাসলে যে—

না, ভাবছি যেখানেই যাও সবই স্মৃতিময়।

দেখতে হবে তো কে? স্মৃতির সবই যে অনিন্দ্য, ফস করে বলে

ফেলেছে কথাগুলো স্মৃতি। পরমুহূর্তেই মনে হয়েছে কথাটা ভেবেচিন্তে সাজিয়ে বলেছে। মনে মনে লজ্জা পেলেও কেমন এক পরিতৃপ্তি, খুশি, আনন্দ সব কিছু তার মন আচ্ছন্ন করল একমুহূর্তেই। পরে একটু সহজ হওয়ার চেষ্টা করে বলল, না বলছিলুম কি, ও লোকটা এতবার আমায় দেখত মনে করেছ নাকি তুমি সঙ্গে না থাকলে।

কেন দেখবে ? তোমার ওই ঘামমাখা মাস্টার-মাস্টার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতে বয়ে গেছে লোকের।

কথাগুলো বলে ওর মুখের ভাবগতিক লক্ষ্য করতে চেয়েছে স্মৃতি। তারপর নিজের ছোট্ট গন্ধমাখা হালকা শৌখিন রুমালখানা ওর হাতে দিয়ে বলেছে, নাও, ঘামটা মুছে ফেল। সত্যি কি অকৃতজ্ঞ তুমি। ও লোকটা না থাকলে কি করে সিগারেট ধরাতে ?

স্মৃতির রুমালখানা দিয়ে মুখ মুছতে মুছতে খুব সংক্ষেপে ও বলেছে, ক্ষমা চেয়ে আসব ?

স্মৃতি অন্যদিকে চেয়ে নিরুত্তর থাকে। তার হাতে রুমালখানা ফেরত দিয়ে সে আবার গোড়ার কথায় ফিরে গেল, কই বললে না তো কাল সন্ধেয় এলে না কেন ?

কি করে আসব। মামীকে নিয়ে ছোটমামা হুম করে এসে হাজির। মামীমা তো অনেকদিন বাড়ি ছিল না। কাল হাসপাতাল থেকে ফিরল।

কি হয়েছিল তোমার ছোটমামীর ? ওর কণ্ঠে কেমন উৎকণ্ঠা ফুটে ওঠে।

চোখের ট্রাবল। বাঁ চোখটা তো যেতে বসেছিল। অপারেশন এমন সাকসেসফুল হবে ছোটমামা ভাবতেও পারেনি।

বেশ আছেন তোমার ছোটমামা, ভারি তো চোখের অসুখ তাও আবার হাসপাতাল, কথা কটার মধ্যে দিয়ে একমুহূর্তে ও গম্ভীর ব্যাপারটাকে লঘু, তরল করে দিতে চাইল।

লোকের অসুখ বিসুখ নিয়েও তোমার ঠাট্টা—স্মৃতির কণ্ঠের মৃদু ভর্ৎসনা তাকে এবার স্পর্শ না-করে পারে না। কথাগুলো বলে স্মৃতি অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে। ও নিজেকে হঠাৎ অপরাধী মনে করে।

সত্যিই আমার অন্যায় হয়েছে, নরম গলায় ও বলে আগের কথাগুলো

ফিরিয়ে নেওয়ার মত করে। স্মৃতির চোখের তারা আবার নড়ে ওঠে। খুশিতে ভিজে ওঠে চোখ দুটো।

সোমবারের কথা মনে আছে তো? ছোটমামা ছোটমামী কালও মনে করিয়ে দিয়েছে, বার বার বলেছে কিন্তু।

তা'হলে তোমার ছোটমামা হিসেব করেই রেখেছেন, কাল তোমার মামীকে আনছেন, তারপর সোমবারে আমাদের ভোজ আর সিনেমা।

অন্যায়টা কি করেছেন—এমন গম্ভীর কণ্ঠে স্বাভাবিক ভাবে কথাগুলো বলে যে ওর মনে হয় বহুদিন দাম্পত্য জীবনে অভ্যস্ত স্ত্রী তার স্বামীকে এমন সহজে তিরস্কার করতে পারে। কথাটা মনে করে সে আবার মনের গভীরে তৃপ্তি অনুভব করে।

না, আমি বলছিলুম কি—

কিছু বলতে হবে না তোমায়, সোমবার অফিস থেকে যেন সোজা চলে এস না আমাদের ওখানে। জামাকাপড় ছেড়ে পরিষ্কার হয়ে এস, ওর কথায় বাধা দিয়ে সে বলে।

—পাগল নাকি, কে যাচ্ছে অফিস থেকে সোজা। পোশাকও ঠিক করে রেখেছি। ঢিলেঢালা পাঞ্জাবি আর তাঁতের ফাইন ধুতি, কথা কটা বলে স্মৃতির মুখভাব লক্ষ্য করতে চেষ্টা করে।

হাসতে গিয়েও হাসি চাপে স্মৃতিরেখা। মুখ কৃত্রিম গাম্ভীর্যে ভারি করে অন্যদিকে ফিরিয়ে নেয়। ও ভাবে নিশ্চিন্তে এবার সিগারেট টানতে পারে আরেকটা। ফেলে-দেওয়া অর্ধদগ্ধ সিগারেট থেকে নতুন করে ধরিয়ে নেয়। স্মৃতিও পাশের চলমান যানবাহনের দিকে তাকিয়ে থাকে সুদূর দৃষ্টি মেলে। ওর নীরবতা ভাঙতে ইচ্ছা করে না। সিগারেটে টান দিতে দিতে তারও ভাল লাগে অন্যমনস্ক চিত্তে স্মৃতির ছোটমামার কথা ভাবতে।

ছোটমামার কথা ভাবলেই মনে হবে লোকটা সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। হাসি-হাসি চোখ আর পরম আত্মতৃপ্তির দৃষ্টি মেলে ধরে সারাক্ষণ তিনি কথা বলে হাসাবেন লোককে। ঝগড়া-ঝাঁটির আব-হাওয়াকে নিমেষে লঘুহাস্যে মুখর করে তুলতে পারেন। ছোটমামা

বলেছেন, ছেলেবেলায় এ-পিঠে কি কম লাঠি ভেঙেছে, তবু কেউ চোখ থেকে এক ফোঁটা জল বার করতে পারেনি।

বলে তিনি স্যাণ্ডো গেঞ্জি তুলে পিঠের সব অংশটুকু এমন ভাবে নিচু করে দেখিয়েছিলেন যে প্রশস্ত পিঠের তারিফ না-করে উপায় ছিল না। আর কথায় কে না হাসবে।

অতীশদাদের অফিসে তিনি পদস্থ কর্মচারী। মোটা মাইনের চাকরি করেন। তবু যাই হোক সংসারী লোক তো। সব সময় সামঞ্জস্য রেখে এমন লঘু খুশির মেজাজে কি করে যে থাকেন তা তার কাছে প্রায়ই বিস্ময়কর ঠেকেছে। অনেক মোটা মাইনের চাকুরেদের সে দেখেনি তা তো নয়। বিশেষ করে সংসারী লোক যারা। স্ত্রী পুত্র-কন্যা নিয়ে যাদের সংসার করতে হয়। ছোটমামা বলেন, বাঁচার রুটিন থেকে একদিনও হাসি বাদ নেই। জিজ্ঞাসা করে দেখ তোমার মামীমাকে।

মামার কথা বলতে গিয়ে মামীমা চট করে থামেন না। বেশ বুঝতে পারা যায় তাঁর মনের কোথায় পরম তৃপ্তির রেশটুকু সর্বদা স্বামীর প্রতি তাঁর প্রেমের কথাই মনে করায়। মামীমার মুখ থেকেই অনেকবার শুনেছে স্মৃতি তার মামার নানা ব্যবহারের কথা।

কিছুতেই চটেন না তোমার মামা। সেদিন কোথায় বেরুবেন যেন। হ্যাঁ তোমাদের ওখানেই তো গেলেন। ভীষণ তাড়া লাগালেন, পাঞ্জাবির ঘাড়টা ফেঁসে গেছে এক জায়গায়, ওখানটা সেলাই করে বোতামটা পরিয়ে রাখতে বললেন। খুব তাড়াতাড়ি বেরুবেন। চা যেন কলঘর থেকে এসেই পান। আমি তো জল চাপিয়ে বসেছি পাঞ্জাবি নিয়ে। সেলাই করবার সময় জামাটা উল্টো করেছি। তারপর জল ফুটে যেতেই রান্নাঘরে আমাদের অর্জুনের ডাকে ছুটে গেছি। কোনগতিকে চা করেছি, চিনি মেশাইনি। তাড়া দিলে আমার যে কী অবস্থা হয়। যা-ও মনে থাকে তা-ও ভুলে যাই। ফিরে এসেই বসেছি পাঞ্জাবিতে বোতাম লাগাতে। উল্টোজামায় বোতাম পরিয়ে রেখেছি। তারপর ওদিকে তো চা-য়ে এক ফোঁটা চিনি নেই আর এদিকে উল্টো জামায় বোতাম। চা-য়ে এক চুমুক দিয়েই বললেন—কাপ ধোয়া হয়নি ভাল করে? আমি ভাবলুম নাকে কোনো গন্ধ যাবে হয়তো। কাপ নাকের

কাছে তুলে নিয়ে দেখলুম। না কোনো গন্ধ নেই তো। বললেন, খেয়ে দেখ দিকি একটু। মুখে দিয়েই দেখি একেবারে স্বাদহীন। আমি যে তখন কী অবস্থায়। অর্জুন দরজার সামনে দিয়ে সিঁড়ির দিকে ওপাশে নেমে যাচ্ছিল, ডাকলেন। অর্জুন এসে দাঁড়াল। বললেন, একটা দিন সামান্য একটা কাজ করতে গিয়েও তোর ভুল হয়। আচ্ছা অভাগি হয়েছিস। অর্জুন কিছু বুঝতে পারে না। কী কাজ, কিসের ভুল। ও অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে। তারপর পাঞ্জাবিটা হাতে করে উঁচুতে তুলে দেখান, উল্টো পাঞ্জাবিতে বোতাম লাগিয়ে রেখেছিস। অর্জুন খানিক পরেই সব ব্যাপারটা বুঝতে পেরে, সাহস পেয়ে বলে, ও বোধ হয় মা-ই করেছেন। তারপর খুবই অবাক হওয়ার ভঙ্গিতে বলেন, ও তোর মা'র কাজ নাকি এটা। শেষকালে আবার ফিরে চা করলুম, চা খেলেন। ওই জামাটা পাল্টে অন্য জামা দিলুম, পরে বেরুলেন। হাসতে হাসতে বললেন, বেরুতে গিয়ে একবার বাধা পেলে তক্ষুনি-তক্ষুনি আর বেরুতে আছে?

না শুধু স্ত্রীর সঙ্গে নয়, অন্য লোকের সঙ্গে ব্যবহারেও স্মৃতির ছোটমামার আসল চরিত্র বা মেজাজ ধরা পড়ে। বিশেষ করে তার ক্ষেত্রে তো সে বহুবার লক্ষ্য করেছে।

স্মৃতি যেবার ম্যাট্রিক পাশ করল সেবারের কথা। সাফল্যের খবর সে আগেই জোগাড় করেছে। ওর পরীক্ষা তো নয় যেন তার নিজেরই। তবু খবরটা স্মৃতির মুখ থেকে শোনা আর আত্মগর্ব অনুভব করার স্বাদই ভিন্ন। খুব সকাল-সকাল গিয়েছিল ওদের বাড়িতে। ওর বাবার সঙ্গে প্রথমে দেখা হয়েছিল। মুখে চোখে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ পাচ্ছিল। সে মুখের হাসিতে জানাতে চেয়েছে, এ ত খুবই স্বাভাবিক অর্থাৎ আমি আছি পাশ না-করার ।ক কারণ।

পড়ার ঘরে ঢুকেই দেখে ছোটমামা বসে আছেন। তাকে দেখেই ছোটমামা আরেকখানা চেয়ার হাত দিয়ে ঠেলে সামনে এগিয়ে দেন, এস এস ভায়া—স্মৃতির ছোটমামাকে যে-কারণেই হোক সে আশা করেনি। দেখে পুলকিত হয়ে বলেছে—কি ব্যাপার মামাবাবু, এ-সময়ে।

আর বল কেন ভায়া। তবে এ-সময়ে না-বলে এমন অসময়ে বললেই ঠিক হত।

কথা বলার যে এমন বিপদ হতে পারে আগে তা যদি একটু জানা থাকত। কী কথার পিঠে কী কথা। সত্যি তখন তার সঙ্গে ওর সম্পর্কের যে-নিবিড়তা তাতে তার বেশ একটু লজ্জা পাওয়ার কারণ ছিল বইকি। ছোটমামা তার মানসিক অবস্থা ধরতে পেরেছিলেন। কারণ সবটাই তাঁর স্বেচ্ছাকৃত।

ইট্ ইজ এ ডে অফ ডেজ; কি বল? স্মৃতিজ্ সাকসেস্ ইজ ইওরস্ য়্যাণ্ড ইওর সাকসেস্ ইজ মাইন—কি মানছ তো? কী রকম রিক্রুট আমার দেখতে হবে তো, সত্যিই যোগাযোগ সব কিছুই করেছেন ছোটমামা।

অতীশদাকে একদিন অফিসে ডেকে বলেছেন, একটি সিরিয়স ছেলে আছে আপনার জানাশোনার মধ্যে, মানে বেশ লেখাপড়ার চর্চা রাখে—

অতীশদা প্রথমটায় ঠিক আন্দাজ করতে পারেনি। চোখের চাউনিতে বুঝিয়েছিল, আরেকটু খুলে বললে ভাল হয়। অতীশদার থেমে থাকার ধরনে কিছু বুঝতে কষ্ট হয়নি তাঁর।

মানে আর কি পড়াতে হবে একটি মেয়েকে, থেমে থেমে বলেছেন ছোটমামা।

কি পড়াতে হবে? প্রশ্ন করেছে অতীশদা।

আপাতত ম্যাট্রিক।

ও! আমার খুবই পরিচিত একটি ছেলে আছে, বলে দেখব না কি? হেসে উত্তর দিয়েছে অতীশদা।

বলুন না, এখুনি বলুন।

তারপর অতীশদার কথা মত ছোটমামা অ্যাপয়েণ্টমেণ্ট রেখেছেন তার সঙ্গে।

একদিন গ্রীষ্মের সন্ধেয় তাঁরই সঙ্গে সে ওদের বাড়িতে আসে। সেই প্রথম দিন। সেদিনটার কথা কিন্তু মধ্যেকার এতগুলো বছরের সমস্ত কিছুকে ছাপিয়ে চোখের সামনে ভাসে।

তার পাশে বসে আছে এই স্মৃতিরেখা, সেদিন সন্ধেয় কী রকম ছিল।

অনেক পাতলা আর লাজুক ছিল। একবার আড়চোখে তাকিয়ে নেয় তার দিকে। না, ওর চমক ভাঙতে চায় না। কি ভাবছে কে জানে। স্মৃতির ভাবনার মধ্যে ঢুকতে ইচ্ছে করে। আর সেদিন ?

সে বসেছিল মুখোমুখি একখানা সোফায়। ছোটমামা দুজনের মাঝামাঝি দাঁড়িয়ে ছিলেন একটা পিয়ানোয় ঠেস দিয়ে। কোন কথাই বিশেষ বলেন নি পরিচয় করিয়ে দেওয়া ছাড়া—এই আপনার ছাত্রী, কথাবার্তা কয়ে নিন।

স্মৃতি হাত তুলে নমস্কার জানিয়েছিল ওকে। ও ডান হাতটা কপালের কাছে তুলেই নামিয়ে নিয়েছিল নিতান্ত অভ্যাস বশে। জিজ্ঞাসা করেছিল, কী কী পড়াতে হবে তোমাকে ?

বাংলাটায় আমার অসুবিধে বেশি। ইংরিজিটাও দেখাতে হবে।

তার বাংলা জ্ঞান সম্বন্ধে ছোটমামা বোধ হয় ভাগনীর কাছে ফলাও করে কিছু বলেছেন। পরে সসম্ভ্রম দৃষ্টি ও দুয়েকটি কথায় যেন এইটাই প্রকাশ পেয়েছিল

আমায় বঙ্গভাষায় বিদুষী করার জন্যেই আপনার এখানে আসা।

সব কথার শেষে ছোটমামা তার দিকে তাকিয়ে একটু হাসি টেনে বললেন, তা হলে শুভস্য শীঘ্রম, পরে ভাগনীর দিকে চেয়ে বললেন, কি বল—

মামার দিকে চোখ তুলে মাথা নেড়ে জানিয়েছে, তবে এই ব্যবস্থাই রইল। পরে সে সোফা ছেড়ে উঠে দাঁড়াতে স্মৃতিও উঠে দাঁড়াল। সলজ্জ চাউনি মেলে রেখেছিল মাত্র কয়েক পলক। তারপর চোখ নামিয়ে নিয়েছিল। ও তো স্পষ্ট করে তাকাতেই পারেনি স্মৃতির দিকে। বেশ মনে আছে, ঠিক মেয়েদেরই মতো লজ্জা করেছে ওর। অন্তত সেই সন্ধেয় তো পালাতে পারলে বাঁচে এমন অবস্থা।

তারপর থেকেই শুরু হয়েছে নিয়মিত বিদ্যাচর্চা। কি করে যে কেটেছে দিনগুলো একটার পর একটা। ঠিক ঝড়ের মত। প্রথম প্রথম যখন দুয়েকটা দিন যেতে পারেনি ঠিক বুঝতে পারত না স্মৃতির মনের অবস্থা। পরে তার অভিমান, রাগ সবকিছু প্রকাশ হতে লাগল এক এক করে। একটা কি দুটো দিনের অনুপস্থিতির পর আবার যেদিন

গেল, সেদিন সে বইপত্তর নামিয়ে রেখেই প্রথম কথা বলল, আজ আর বেশিক্ষণ পড়তে পারব না। একটু বেরুতে হবে মা'র সঙ্গে।

ও হয়তো একটা মেজাজ তৈরী করে গেছে আজ সন্ধ্যেয় ভীষণ একটা কিছু করবে, মানে বিদ্যাদান কাকে বলে একবার দেখাবে। কিন্তু ওই সামান্য কটা কথায় সব ওলোটপালট হয়ে গেছে। একটি মুহূর্তে মনে হয়েছে সমস্ত সন্ধেটা মাটি। পরে বেরিয়ে এসে রাস্তায় যখন পা দিয়েছে, তখন দেখল হয়তো ওদের মাঝারি রকমের মোটরখানা ধাঁ করে বেরিয়ে গেল তার পাশ দিয়ে জোরে একবার হর্ন দিয়ে তাকে সচকিত করে। সমস্ত রাস্তাটা তখন ওর মনে হয়েছে ফুরোবে না। হঠাৎই জলে উঠেছে সমস্ত মনটা স্মৃতির এই অহেতুক ব্যবহারে। কোন মানে হয় এ ধরনের অভিমানে। বাবা বড় চাকরি করেন, ব্যবসা দেখেন তো মেয়ে ধরাকে সরা জ্ঞান করতে শিখছেন। বুঝত যদি কষ্ট করে লেখা-পড়া শিখতে হত হাজার গণ্ডা মেয়ের মত।

আবার অনেকদিন হয়তো দেখাই পায়নি। বাড়ির চাকরের মুখ থেকেই শুনেছে কোথায় বেরিয়েছে সন্ধের আগেই। ফিরতে দশটা হবে তো বটেই। অর্থাৎ আজ আর তার অপেক্ষা করার কোন প্রশ্নই ওঠে না। যেহেতু পড়ানোর সম্ভাবনা সম্পূর্ণ অনিশ্চিত।

ফিরতি পথে শুধু রাস্তাটা ক্লান্তিকর মনে হয় তা নয়, রাত্তিরে বিছানায় গা ঢেলে ভাবতে শুরু করলে সমস্ত দিনটা মিথ্যে মনে হয়, অনেক রাত পর্যন্ত জেগে জেগেও ঘুম আসার নাম নেই। কি করে স্মৃতিকে ভাল করে শিক্ষা দেওয়া যায় সেই নিয়ে ফন্দি আঁটতে ইচ্ছা করে।

ঠিক করে সকাল থেকেই, আজ অফিসের পর বন্ধু-বান্ধবদের কোন আড্ডায় গিয়ে কাটাবে সন্ধেটা। কিন্তু অফিসের ছুটির পর বিকেলের শেষে সন্ধের মুখে-মুখে সব পরিকল্পনা ভেস্তে যায়। চা-য়ের সঙ্গে কিছু খেয়ে, শরীরের ক্লান্তি ভেঙে আবার সজীব হয়ে ওদের বাড়ির রাস্তায় পা-ফেলা।

সে গাম্ভীর্য রক্ষা করতে পারে না। স্মৃতির হাঁটাচলাফেরায়, দুয়েকটা ভাঙা ভাঙা কথায় এইটাই যেন প্রমাণিত হতে চলেছিল, সে যা করছে তাই হবে। গাম্ভীর্য খসিয়ে মনে হয়েছিল তার, যেন রাগে ফেটে পড়বে

সে। কিসের এত তেজ? বাবার চাকরি আর ব্যবসা তো? প্রথম দিনই তার লক্ষ্য করা উচিত ছিল, মেয়েটার চোখের দৃষ্টিতে সাম্রাজ্ঞীর শাসনভঙ্গির অনেকখানি প্রশ্রয় পাচ্ছে কোথায়। মস্ত বড় বড় কাল দুচোখের দৃষ্টিতে এমন নির্মমভাবে অহঙ্কার ছিটোবে যে তার মত অনেক কটা মানুষ সেই দৃষ্টির সামনে নিজেদের হীন মনুষ্যত্ব চিন্তা করে লজ্জায় সংকোচে এতটুকু হয়ে যাবে। যেন মাইনে করা চাকর রেখেছে। সত্যিই, শুধু মাসের শেষে টাকাটা যদি হাতে না আসত।

নিপুকে মাঝে মাঝে ডেকে বলত, দুর শালা, ছেড়ে দেব পড়ান। প্রেস্টিজ থাকে না।

খবরদার। ও কাজটি করিস নে—নিপুর অদ্ভুত মুখভঙ্গিতে হাসি পেয়েছিল।

না সকালের চাকরিই যথেষ্ট। সন্ধেটা আড্ডা দেব।

সকালের চাকরি ছাড়তে হয় ছাড়। কিন্তু সন্ধের চাকরি? খবরদার ছাড়িস নে। ওটা পার্মানেণ্ট সার্ভিস, ছাড়লেই ঠকবি—এই বলে রাখলুম, নিপু ঠিক সতর্ক করার ভঙ্গিতে বলে হাসতে হাসতে।

বেশ, তবে তুই নে।

মাথা খারাপ নাকি। তোর চাকরি আমায় স্যুট করবে কেন?

নিপুর ঠাট্টাটা উপভোগ্য। কিন্তু আসল যে-কথাটা নিপুর সমস্ত কথাগুলোর মধ্যে প্রচ্ছন্ন ছিল সেটাই তাকে বেশি ভাবাল। বলতে গিয়েও যেন বলেনি কথাটা নিপু। বাস্তবিক মাসের শেষে যখন নগদ একশটি টাকা খামে মুড়ে স্মৃতি ওর হাতে তুলে দিত তখন ওর হাত সরত না। ভীষণ লজ্জা-লজ্জা করত। স্মৃতি হাতে ধরে আছে খামখানা, সে মাথা নিচু করে চোখের এক কোণা দিয়ে লক্ষ্য করে, কিন্তু হাত বাড়িয়ে নেয় না। খুব দ্রুত, বিশেষ মনোযোগসহ একখানা বইয়ের পাতা উলটিয়ে যায়। তারপর হয়ত এক জায়গায় হঠাৎই থেমে পড়ে বলে, হ্যাঁ এই পাতাটা, তাড়াতাড়ি খামখানা টেবিলের একপাশে রেখে ঝুঁকে পড়ে পাতাখানার ওপর।

কোনও কৈফিয়ৎ দিতে হয় না কবে এল কবে এল না, কখন এল কখন গেল। একেক সময় তার মনে হয়েছে ফেরৎ দেয় টাকাটা। আর ওর

বাবা ? তাঁর সঙ্গে যখনই দেখা হয়েছে একমুখ হেসে জিজ্ঞাসা করেছেন, কেমন দেখছেন মেয়েকে। তখনি সলজ্জ হয়ে উঠেছে তার দৃষ্টি, না না বেশ বুদ্ধি আছে। আমার তো মনে হয় ভালই করবে।

রাস্তায় নেমে পকেটে হাত দিয়ে টিপে টিপে দেখেছে খামখানা। পথ হাঁটতেই অন্যরকম লাগে। প্রতি মুহূর্তে অনুভব করা যায় পকেটে টাকাটার ভার। অফিসে সারা মাসের ক্লান্তিকর খাটুনির পর সামান্য কটা টাকা যখন হাতে এসেছে সব কিছু ভেবে মনে একটুও স্বস্তি পায়নি। ওপরওয়ালারা ভাবে কৃতার্থ করছে। যেন চোরের মত চুরি করে নিয়ে যাচ্ছে লুকিয়ে মাইনেটা পকেটে। আর চাকরি তো নামেই চাকরি। এক্স্ট্রা টেম্পোরারি, কবে আছি কবে নেই তার ঠিক নেই। খেয়াল খুশি মতো হঠাৎই দেবে একদিন গলা ধাক্কা দিয়ে ভাগিয়ে। মাকে বাড়িতে ফিরে সাজিয়ে গুছিয়ে কত সান্ত্বনার কথা শোনাতে হয়েছে, নিজের ভবিষ্যত তথা চাকরির ভবিষ্যত সম্বন্ধে। আর তলে তলে খোঁজ রাখতে হয়েছে, নতুন কোন চাকরির। আর স্মৃতির বাবার দেয়া টাকাটা ? কোন কৈফিয়ৎ নেই, মাথা হেঁট করার কিছু নেই। টাকাটা নিয়ে বাবাকে, মেয়েকে ধন্য করা ;— তার মত শিক্ষক ওর বাবা কি টাকা ছড়ালেই পাবেন নাকি ? শুধু মাঝে মাঝে স্মৃতির ব্যবহার যা পীড়াদায়ক। না হলে গলা বুজে আসে, স্মৃতির বাবার কথা ভাবলে কৃতজ্ঞতায়।

আচ্ছা, ওটা অহংকার না অভিমান ? অভিমান যদি হয় তো কিসের অভিমান ? ভাল না-বাসলে কেন অভিমান করবে ? তবে সত্যি সত্যিই ভালবাসে তাকে ? বাস্তবিক কি ছেলেমানুষ সে ? এটুকুও বুঝতে পারে না, স্মৃতি তাকে ভালবেসেছে।

ওই তো বসে আছে। এখন দৃষ্টি কেমন আনমনা। সামনের চলমান গাড়িগুলোকে দেখছে। মাঝে মাঝে চোখ তার বেঁকে ঘুরে যায় আলিপুরের রাস্তাটার দিকে। কী দেখছে সে ? রাস্তার ওই চকচকে গাড়িগুলোকে। নামই ও শুনেছে কিন্তু চেনে না কোনটা কোন মডেল। স্টুডিবেকার, ডজ, এ্যাম্বাসাডর, রোল্সরয়েস—নামগুলো আওড়ালেই মনে হয় এ মুহূর্তে নিজেকে অন্তত কোন সদাগরী অফিসের

করেসপ । ক্লার্ক মনে হবে না। নামের মাহাত্ম্যই শুধু এতখানি। ও নাকি ওর বাবাকে, আরো ছোট ছিল যখন, প্রায় বলত মাঝে মাঝে, কবে একটা বড় গাড়ি কিনবে—উঁ—বা-বা, আতুরেপনা করে ভেঙে পড়ত বাবার পিঠের ওপর। স্মৃতিই ওকে চিনিয়েছে কোনটা কী। ও—তাই নাকি, পরম বিস্ময়ে চোখ তুলে শুনেছে ও তার কথা। পরে ঠিক যে-কথা বললে হঠাৎ রেগে উঠতে পারে, সে-কথাটাই বলেছে, আচ্ছা মোটরগাড়ির ব্রোকারদের ইনকাম কিন্তু মন্দ নয়, ধর তোমার কাছ থেকে রোজ একটু একটু শিখে, জেনে—

থাক আর বলার দরকার হবে না, স্মৃতি ওর পরিহাস বুঝতে পেরে থামিয়ে দেয়। কিন্তু সত্যি কি শুধু পরিহাসই করতে চেয়েছিল? একটা চাপা বেদনাকে বা ব্যর্থতাকে অক্ষম অহংকার দিয়ে ঢাকতে চায়নি? ওর বুদ্ধি যদি আরো গভীরে যেত নিশ্চয়ই বুঝত কাঁটা কোথায়। মোটরগাড়ির প্রসঙ্গে ওকে একটু খোঁচা দেওয়ার সুযোগ নেওয়া? একটু পরেই মনে হয়েছে, ও কিন্তু সম্পূর্ণ বিনা-উদ্দেশে বলেছে। নিজের মনের খেয়াল খুশি মেটাতে মানুষ যেমন কোন কিছু বলে বা করে অনেক সময় বিনা কারণেই হালকা করে মন। ওকে ব্যথা দেয়ার কথা জ্ঞাতসারে চিন্তা করতেই পারে না। স্মৃতির দিকে আবার ভাল করে চোখ মেলে দেখে। কোথায় মন চলে গেছে তার। চোখের পাতা দুটো থেকে থেকে ওঠানামা করে আর চোখের দুটি তারা মাঝে মাঝে চলমান গাড়ি দুয়েকটির বক্রগতিকে অনুসরণ করে।

জলের মধ্যে, অনেক সময় লক্ষ্য করে দেখেছে, কোথাও কোথাও, থেকে থেকে, ঘাসাচ্ছন্ন খানিকটা জায়গা মাথা উঁচু করে যেন ঠিক ভাসছে। ছোট একটা ভাসমান দ্বীপের মত। যেন পাড় থেকে নৌকা বেয়ে ওই অদূরের দ্বীপের কাছে পৌঁছাতে হয়। দূরত্ব স্বল্প হলেও জলের গভীরতা অনেক। ভাবতে মজা লাগে, এখান থেকে এক লাফে জল ডিঙিয়ে ওই দ্বীপের মতো সবুজ ঘাসাচ্ছন্ন জায়গাটুকুর ওপর গিয়ে পা ফেলছে। এই মজার চিন্তা থেকে যে-হাসির কথাটা প্রায় লাফিয়ে উঠে আসে মনের একেবারে তলা থেকে, সেটা ওকে এখুনি জিজ্ঞাসা করে কয়েক বছর আগেকার এক স্নিগ্ধ অতীত সন্ধ্যাকে পুনরুজ্জীবিত করবে? ওকে এই

বর্তমান থেকে ছিন্ন করে তার কিশোরী অবস্থার সেই ভাবপ্রবণ বা কখনও অকারণ হাস্যোজ্জ্বল সন্ধ্যায় ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া প্রাথমিক চিন্তায় এক-পলক অসম্ভবই মনে হয়। কিন্তু কথাটা যখন মনে এসেছে ও হারাতে চায় না। বিশেষ করে স্মরণ থেকে উদ্ধার করা। স্মৃতির মৌনতা ভাঙা দরকার, এটাও তার মনে হল।

একটি মুহূর্ত ভেবে নিল, আজ এখানে তার কোন কথায় আঘাত পেতে পারে কি ও? না, আঘাত পাওয়ার মত কোন কথাই বলেনি সে। কথাটা ভেবে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলতে পারে। তারপর ভাবলে অভিমান? অভিমান হেতুই কি অবিচ্ছিন্ন তন্ময়তা? কার ওপর এই অভিমান, তার ওপর, কিংবা বাড়ির কারো ওপর? হঠাৎ কোন উড়ো কথা টুকরো চিন্তা মনে আসায়? না, হয়ত বা অনেকদিন পরে নিজের প্রিয় জায়গাটিতে আবার এসে বসতে পারায় কোলাহলের, যানবাহন চলাচলের শহরেও নৈঃশব্দ্যকে নিস্তব্ধতাকে নিবিড় করে পেতে চায়, অনুভব করতে চায় অস্তিত্বের সবটুকু দিয়ে, চেতনার সর্বত্র শৈথিল্য ছড়িয়ে।

তোমার মনে আছে, তোমাকে পড়াতে শুরু করার কয়েকটা দিন পরে আমি তোমার বিদ্যে বুদ্ধি নিয়ে একটা কথা কী বলেছিলাম—

কথাগুলোর একটিও মনে হয় না স্মৃতির কানে গেছে। ও কি বাতাসে ছুঁড়ছে নাকি কথাগুলো, স্মৃতির হাবভাবের অপরিবর্তনে ওর এমন মনে হওয়াটা আশ্চর্য কিছু নয়। কিন্তু ও আনমনা উদাসীন দৃষ্টি মেলে বেশিক্ষণ বসে থাকেনি। ঘাড় ফিরিয়েছে। ওর দৃষ্টি থেকে ধরা যায়, দীর্ঘ শব্দ তার কানে গেছে, কিন্তু অন্যমনস্কতায় কথাগুলো কোন অর্থ হয়ে কানে পৌঁছয় নি। তাই তন্ময়তা ভাঙলেও মনে করতে পারে না কী কথা বলেছে অনিন্দ্য।

এ্যাঁ—কী বলছিলে, স্মৃতির কণ্ঠ থেকে কেমন অলসভঙ্গিতে প্রশ্নটা থেমে থেমে বেরিয়ে আসে। ও ধরতে পারে ওর অবস্থাটা।

বলছিলুম তোমার বিদ্যে বুদ্ধি প্রসঙ্গে আমার কথাটা মনে আছে? ফিরে জিজ্ঞাসা করে।

না, আমার অত মনে থাকে না।

তা মনে থাকবে কেন?

থাকলে কি আর পড়াশুনোর এই গতি হত ?

আমি ত প্রত্যেকটা কথা মনে রাখতে পারি, বিষ্টের বাউণ্ডারী আমার জানা আছে, চারিদিকে জল আর জল, স্থলের চিহ্নমাত্র নেই। আর তুমি কি বলেছিলে উত্তরে—

নিজের কথা প্লাস আমার উত্তর ?

হ্যাঁ, এক্‌কেবারে নির্ভুল, বলব : আর আমি মাঝখানে দ্বীপ হয়ে বসে আছি। সত্যি আমার এত ভাল লেগেছিল কথাগুলো, কি করে অমন গোছানো কথাগুলো যে চট করে তোমার মাথায় এসেছিল—

ওর কণ্ঠের অকৃত্রিমতায়, গাঢ় অনুরাগে স্মৃতি যে নিজের বুদ্ধির প্রশংসায় বেশ সলজ্জ হয়ে ওঠে তা অনুমান করতে বিন্দুমাত্র ভুল হয় না।

জলের মাঝখানে তফাতে তফাতে ছড়ানো ওই উঁচু উঁচু সবুজ ঘাসঢাকা জমিগুলোর দিকে স্মৃতির দৃষ্টি নিয়ন্ত্রিত করে ও আবার বলল, তুমি অনেকটা ও-ধরনের দ্বীপের মত, নয় ?

ভেবে ভেবে কথাও বার করতে পার ; ওর ছেলেমানুষীর দিকে স্মৃতির কটাক্ষ নাকি ?

ভাবতে হবে কেন, না-ভাবতেই আসছে।

ভারি প্রাণের কথা, বলেই স্মৃতি ওর দিকে কটি মুহূর্ত তাকিয়ে থাকে। তার চোখের দিকে পাল্লা দিয়ে সে তাকিয়ে থাকতে পারে না। এই ত সেদিন কেমন লাজুক আর ভীরু ছিল। দিনে দিনে যেন সাহস বেড়ে চলেছে। কোথা থেকে ও এমন সাহসিকা হয়ে উঠেছে ভাবলেও অবাক হতে হয়। একটি পুরুষকে, নীরব থেকে বা সামান্য দুয়েকটি শব্দ করে, শুধুমাত্র চোখের দৃষ্টিতে বিপর্যস্ত করা যায়, এ শিক্ষাও তার স্মৃতির কাছ থেকে নিয়মিত গ্রহণ করতে হয়।

আর শুধু দৃষ্টিই বা কেন ? কথাও কি কিছু কম জানা আছে স্মৃতির ? এই তো সেদিন। আই. এ. পরীক্ষার ফল বেরুবার পর। ওর মতো আলুমাটিচাল করে বেড়ানো মেয়েও যে এ-পরীক্ষায় কৃতকার্য হতে পারে এ বিশ্বাস কোনোদিন স্মৃতির বাবার ছিল না। এবার তাঁর পুরোপুরি বিশ্বাস হল এই, যে তাঁর মেয়ের কৃতকার্যতা মূলত কেন সর্বাংশে তারই।

সে যেন আস্তে আস্তে কোনো একটা দাবিকে কায়েমী করতে চলেছে। স্মৃতির মুখ থেকে তার বাবার মনের কথাটা বা স্বীকারোক্তি একবার বাজিয়ে নিতে ইচ্ছে হল। নিজের সাফল্যের গর্বের কথা স্মৃতিরেখার চোখের দিকে তাকিয়ে তারই মুখ থেকে শোনার প্রলোভন জেদের মতো পেয়ে বসল। বেশ একটু হাল্কা সুরেই সে আরম্ভ করতে চেয়েছিল।

ত্যাখো, সত্যি কথা বলতে আর বিদ্যের দৌড় আমার নেই। এবার ক্ষান্ত হতে হবে। আবার কি চাও, ম্যাট্রিক পড়ালুম, ইণ্টারমিডিয়েট পড়ালুম—

বি. এ. (বিয়ে)তে আপত্তি কেন? ওকে আর শেষ না করতে দিয়ে ফস্ করে বলে বসেছে স্মৃতি। স্মৃতির অর্থপূর্ণ দৃষ্টিও সায় দিয়েছিল তার বিশেষ উদ্দেশ্যের সমর্থনে। যা ভেবেই বলুক সে কথাটা, ওর কাছে কিন্তু একটি অর্থই গ্রহণযোগ্য মনে হয়েছিল। আর তা ছাড়া স্মৃতিরেখা কথাটা শেষ করার সঙ্গে সঙ্গেই অমন বিশেষ অর্থবহ দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল কেন। তাকে একটু বিচলিতও মনে হয়েছিল পরক্ষণে।

স্মৃতির চোখের দিকে একটিবার তাকিয়েই সে মাথা নামিয়েছিল, চোখ নিচু করেছিল দীর্ঘ সময়ব্যাপী। মাথা ওর ঝিম-ঝিম করছিল। মনে হয়েছিল কান দুটোয় রক্ত জমে উত্তপ্ত করে তুলবে। ভেবেছিল, কী বেপরোয়াই কথা বলতে শিখেছে। না, সব অর্থটাই তার মনগড়া? নিজের দুর্বলতা দিয়েই কি সে ওর সব কিছু বিচার করছে?

সেদিন সন্ধ্যার এই কথাটা স্মৃতির মনে থাকবার কথা। যদি মনে না থাকে তো বুঝতে হবে কথাটা আসলে প্রাণের নয়। অর্থাৎ নেহাৎই আচমকা বলেছে, জিভের ডগায় এসে গেছে তাই। না, ওটা অন্তরের কথা। ওই কথাটাই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে নানা আকারে এতদিন বলে এসেছে। কখনো তার অর্থের কাছাকাছি সে যেতে পেরেছে, কখনওবা অস্পষ্টতা হেতু ধরেও ধরতে পারে নি। আর সেদিনই যেন সুযোগ মিলে গিয়েছিল। এবং সে সুযোগ তৈরী করেছিল অনিন্দ্য নিজেই। অতএব যে-প্রশ্ন স্মৃতির কোনো বিশেষ একটি দিনের সাময়িক প্রশ্ন মাত্র নয়, যেটাকে সে হৃদয়ের নিভৃতে লালন করেছে, তার কথা জিজ্ঞাসা করে সে স্মৃতির মুখচোখের অবস্থা এক মুহূর্তে পালটে দিতে

পারে। আর স্মৃতির মুখের চেহারার আকস্মিক পরিবর্তনেই ধরে ফেলবে তার মনে কী আছে।

তার চিন্তায় ছেদ পড়ল, স্মৃতির কণ্ঠস্বর কানে এল। প্রশ্নের চমকানিতে নিজের কথা সে কখন হারিয়ে ফেলল মনে থাকে না। গির্জেটার দিকে আঙুল তুলে তার দৃষ্টি আকর্ষণ করে স্মৃতি নতুন কিছু আবিষ্কারের ভঙ্গিতে বলে, ঠিক যেন তোমাদের অরুদি, ওই যে ওই তো রাস্তাটা ধরে গোল হয়ে ঘুরে যাচ্ছে।

ওর চোখ প্রথমে ঠিক জায়গায় পড়ে না। বলে, কোথায় বলো তো, মনে মনে বুঝতে পারে ওর চোখে কৌতূহলের ছায়া পড়েছে। আর স্মৃতিও সেটা লক্ষ্য করে দ্বিগুণ উৎসাহিত হয়ে ওর চোখ ছুটিকে সঠিক স্থানে নিবদ্ধ করতে চেষ্টা করে। বলে, ওই তো নীল গাউন পরে, ছিপছিপে লম্বা মতো, সঙ্গে একটা লোকও তো রয়েছে।

ওর কথা মতো গির্জের ওই ধারটার দিকে তাকায়। দেখতেও পায় মেয়েটিকে। বেশ তন্বী, নীল গাউনে দীর্ঘ মসৃণ পা-ছুটির বহুলাংশ আবৃত। গায়ের অংশ বাহুর পাশ দিয়ে অনাবৃত। পিঠেরও উপরিভাগ দেখা যায়। পাশের সঙ্গীর একটি বাহু সে নিজের একটি বাহুর মধ্যে টেনে এনেছে। স্মৃতি শুধু পাশের সঙ্গীটির কথাই উল্লেখ করেছে। ওদের চলার ভঙ্গি কি তার নজর এড়িয়েছে। ও তাকিয়ে থাকে যতক্ষণ ওই যুগল মূর্তিটির দিকে, স্মৃতিও নীরব থাকে। ওকে ভাল করে নিরীক্ষণ করার অবকাশ দেয়। ওর মনে হয় এ মুহূর্তে ও-দৃশ্যটা ছুজনেরই কাছে সমান অর্থপূর্ণ।

খালি অরুদির মাথার পেছনে যা আলগা-বাঁধা খোঁপা, স্মৃতিরেখা বৈপরীত্যটুকু ধরে দেয়।

খুঁটিয়ে দেখলে দুর থেকে অন্তত তাই মনে হওয়ারই কথা। অরুদির কায়দা করে বাঁধা আলগা খোঁপাটা শুধু মাত্র একটি রিবনের ফাঁসে কেমন আলতো ভাবে ঝুলে থাকে। আর ওই মেয়েটির শ্যাম্পুকরা চুল ঘাড় অবধি ঝুলছে।

কি, ঠিক অরুদির মতো না? জিজ্ঞাসার মধ্যে অরুদির চেহারার তারিফটাও যেন প্রচ্ছন্ন রয়েছে।

হ্যাঁ অনেকটা প্রায়।

অনেকটা কেন? প্রায় হুবহু মিল বলতে পার, স্মৃতি প্রতিবাদ করার মতো বলে। এই নিয়ে এখন দীর্ঘ তর্কে নামা যায়। তর্কের এমন নানা বিষয়ের কথা ভেবে ভীষণ হাসি পায়। তুচ্ছাতিতুচ্ছ বিষয়ে স্মৃতির তর্কের উৎসাহ কিন্তু অক্লান্ত।

তা যা বলেছ, হুবহু প্রায়, কথায় সায় দিয়ে ও হাসি টেনে আনে।

স্মৃতিরেখা ধরতে পারে, এটা ওর মনের কথা নয়। যেন তর্ক এড়াবে বলেই ওর কথায় সায় দেয়। ওর মন কিন্তু চোখের সঙ্গেই ঘোরে গির্জের ওই চারপাশটায়। স্মৃতি ওর দৃষ্টি ওদিকে ফিরিয়েছে বলেই চোখ এইবার ভাল করে গিয়ে পড়ল গির্জেটার ওপর। পরিচ্ছন্ন সমান সবুজ ঘাসের জমিতে আকাশের দিকে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে গির্জেটা। গির্জের মাথার ওপরে এখানকার আকাশ কী নিবিড় নীল। এই শহরের নিরন্তর অবিশ্রান্ত কোলাহল থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে ওখানে যেন একটি স্বতন্ত্র জগৎ রচনা করেছে অনাবিল পরিবেশে। নীল গাউন-পরা ওই শৌখীন তন্বী মেয়েটি তার প্রিয়তমের হাত ধরে ওই ক্যাথিড্রালের দিকে এগুচ্ছে যখন, তখন একটি কথাই তার সমস্ত মন ভরে তোলে, ওরা দুটিতে যেন সেই শান্তিময় স্নিগ্ধশ্রী জগতের অনাবিল পরিবেশের দ্বার তাদের সামনে উন্মুক্ত করে দিয়ে গেল। গাছগুলো এক সারিতে দীর্ঘ দেহগুলি উঁচুতে তুলে এই গোধূলির আকাশকে মিনতি জানাচ্ছে, এই অপরূপ সুনীল আকাশের কমলা রং আর সেই কোমল কমলা রং-এর পটভূমিকায় কটি কালো পাখির দিনশেষের শেষ পাখামেলার পরম তৃপ্তিকে তুমি কেন মুছে দেবে। আর এর সঙ্গে মাঝে মাঝে গির্জের সান্ধ্যধ্বনি বুকের মধ্যে থেকে থেকে মোচড় তুলবে, কত পুরোন কথা ফিরিয়ে আনবে। কান্নার জন্যে যারা তৈরী হয়েছে, তারা কান্নার শুচিতায় হৃদয়কে স্নান করাবে। সব কিছু মিলিয়ে তার চোখের সামনে দিয়ে চলচ্চিত্রে দেখা কোনো একটি পরম মনোরম দৃশ্য পার হয়ে যাচ্ছে মনে হয়। যা ধরে রাখতে পারলে খুব খুশি হয় মন। কিন্তু ধরে রাখতে পারে না। ক্ষণস্থায়ীত্বের হাত থেকে মানুষ এমন ঐশ্বর্যকেও রক্ষা করতে পারে না? হঠাৎই মনে হয় সে কি কোনো শিল্পী হতে

পারত না ? অস্তমান গোধূলির ম্লানপ্রভ আলোয় রহস্যময় আবছায়ায় দাঁড়ানো ওই প্রশান্ত ক্যাথিড্রালের নিঃশব্দ মূর্তিটার দিকে বার বার চোখ তুলে যে তার ছবিতে তুলির শেষ রেখাটি বুলোচ্ছে।

আয়ারা পেরামবুলেটরে করে শিশুদের বেড়াতে এনেছিল। সারা অপরাহ্ন ছুটোছুটি করেছে শিশুদের দল। এইবার আয়ারা তাদের আস্তে আস্তে তুলছে সব পেরামবুলেটরে। গির্জের এই শান্ত পরিবেশে ওই শিশুদের কোলাহলই মনে হবে একমাত্র শব্দ, তাদের উদ্দাম ছুটোছুটি এক বিস্তৃত শোভা। কোলাহল শেষে ওই শিশুদের গৃহে ফেরার পর, আর কিছু পরে শহরের যত পাখির নীড়ে ফেরার পর আকাশ অন্ধকারে অস্বচ্ছ হবে। কেমন একটানা এক শব্দে সমস্ত জায়গাটা নির্জনতাকে জাগিয়ে রাখবে। চোখে না দেখেও ও মনে মনে কল্পনা করে নিতে পারে ছবিটা। অন্ধকারে কত শতাব্দী আগেকার আর্ত বন্দী সময়কে মাটি থেকে খুঁড়ে মুক্তি দিয়ে ওই ক্যাথিড্রালটা সমস্ত রাত্রি বিনিদ্র দাঁড়িয়ে আছে। মাথার ওপরে কয়েকটা তারা এদিক-ওদিক ছড়ানো। তাদের আলোয় তার দুঃসাহসিক কাজের সাক্ষ্য।

মাকে এ-জায়গায় আনতে হবে একদিন। মা এ-জায়গাটা দেখে নি তাই। মা'র শুধু লেক, উট্রাম ঘাট আর ইডেন গার্ডেন। এ-জায়গায় এলে মা আর ইডেনগার্ডেন পছন্দ করবে না কোনোদিন, বল, মাকে একবার জায়গাটা চিনিয়ে দেওয়া উচিত না ? কলকাতায় এমন একটা জায়গা আছে মা এখনও জানে না, স্মৃতি কথাগুলো বলে যায় অন্তরঙ্গ কণ্ঠে, যেন জায়গাটার অভিনবত্বে হঠাৎ গভীর মুগ্ধ হয়েছে। তারপর তাকিয়ে থাকে তার দিকে। স্মৃতির কথার মধ্যে অনিন্দ্যর রুচির প্রশংসাটাই বুঝি মুখ্য। পশ্চিম আকাশের আলো স্মৃতির চোখের ওপর পড়ে তার দৃষ্টিকে আকুল করে তোলে।

স্মৃতির মা'র প্রসঙ্গ তার এ সময়ে কেমন অনাহুত মনে হল। প্রয়োজনের খাতিরে শুধু উত্তর দেয়, হ্যাঁ বেশ ভালই তো জায়গাটা। বেড়াতে যাঁরা পছন্দ করেন ভালই লাগবে তাঁদের।

স্মৃতি সম্ভবত ওর কথার প্রচ্ছন্ন অপ্রসন্নতা উপলব্ধি করতে পারেনি।

না পারবারই কথা। ওর বলার ভঙ্গিতে উৎসাহ না-থাকতে পারে, বিশেষ অনিচ্ছাও কিছু প্রকাশ পায় নি। স্মৃতিরেখা ওর নিজের কথার খেই ধরতে চায়, ফের বলে, মা'র যে কী একঘেঁয়ে পছন্দ। লেক আর ইডেন গার্ডেন। গঙ্গার ধারটা তবু ভাল। ইডেন গার্ডেনে ওই প্যাগোডায় বসবে, তারপর আমায় ডেকে বলবে, রেখা দেখত ভাল আইসক্রীম পাস কিনা। আমায় আবার দেখতে হবে কাছাকাছি কোথায় আইসক্রীম ফিরি করছে। আর এখানে বসলে মা'র আইসক্রীম খাওয়ার ইচ্ছেই মনে আসবে না।

স্মৃতির সব কটা কথা হারিয়ে গেলেও ইডেন গার্ডেন আর প্যাগোডা হারায় না। স্মৃতির পড়ার টেবিলের মাথার ওপরে দেয়াল ঘেঁষে ছোট্ট ফ্রেমে বাঁধানো ফোটোখানার কথা মনে পড়ে। ছবিতে প্যাগোডার সামনে দাঁড়িয়ে আছেন ওর মা বাবা, আর তাঁদের দুজনের মাঝখানে স্মৃতিরেখা। বাবা প্রিয় বাচ্চা কুকুরটাকে কোলে চেপে আছেন। ছোট সুখী একটি পরিবারকে জীবন্ত করে রেখেছেন ছোট্ট একখানি হালকা শৌখীন ফ্রেমের মধ্যে। শুধু পরিবারের প্রিয়জন দুটিকেই নয়, পরম প্রিয় পোষা ক্ষুদ্র প্রাণীটিকেও। রবিবারের এক শীতের সকালে ছবিখানা তোলা হয়।

তারপর এই ফোটো থেকেই স্মৃতির মাকে মনের মধ্যে কতবার গড়েছে ভেঙেছে। ছবিটা তৈরী করেছে অনেকটা এভাবে। উট্রাম ঘাটের ধারে বা ইডেন গার্ডেনের কোনো এক কোণায় গিয়ে গাড়ি থামালেন স্মৃতির বাবা। দরজা খুলে দিলেন বাঁ পাশের, স্মৃতি নামল। নিজের দিকের দরজা খুলে নামলেন। তারপর পিছনের দরজা খুলে হাত ধরে স্ত্রীকে নামতে সাহায্য করলেন। কুকুরটাও লাফ দিয়ে নেমে পড়ল। শব্দ করে গাড়ির দরজা বন্ধ করলেন। পরে গাড়িতে চাবি দিয়ে এসে দাঁড়ালেন স্ত্রী আর মেয়ের পাশে। তারপর হাঁটা শুরু করলেন এক পাশে মেয়ে অন্যপাশে স্ত্রীকে নিয়ে। বাচ্চা কুকুরটা লাফিয়ে দৌড়ে একবার এগিয়ে যায় আবার অনেকক্ষণ পিছনে পড়ে থাকে। থামার অবকাশে পকেট থেকে দামি পাইপ বার করেন। স্মৃতির মা'র ঢাকাই কাপড়ে ঢাকা ভারি শরীর বাতাসে বিলিতি ফুলের গন্ধ ছড়িয়ে মন্থর

গতিতে এগিয়ে চলে। স্মৃতির মা'র পদক্ষেপেই বোঝা যায় স্বামীর গর্বে তিনি নিজেকে আপাদমস্তক মুড়ে রেখেছেন। সুন্দরী মেয়ের মা হওয়ার গর্বও কম কথা নয়, একথা তাঁর চালচলনে যেমন বরাবরই ধরা পড়ে, তেমনি কথাটা ধ্রুব সত্য হয়ে ওঠে যখন সেই মেয়ে অভিনব সাজে সেজে তাঁর পাশে পাশে হাঁটে।

স্মৃতির মা'র প্রসঙ্গে এত কথা তা'র এখুনি মনে আসবার কথা নয়। কিন্তু কেন এল? এটা ভেবে দেখবার কথা। সত্যিই কি মনে এসেছে না মনে মনে সে ভেবে তৈরী করে নিয়েছে। তবে কোনো খোলা পথে কথাগুলি আসেনি মনের মধ্যে। আসার জন্যে তার মনই দায়ী, কথাগুলো নয়? কেন? কেন না এ-মুহূর্তে সে নিজের মা'র কথাটাই বার বার মনে করেছে। মনে করেছে বা ভেবেছে না-বলে, বার বার মনে পড়েছে বললেই ভাল হয়। আর সে-কারণেই কি স্মৃতির সামান্য সাধারণ নিরপরাধ কথাগুলো এমন অপরিসীম অভিমান, না অভিমান নয়, অনিরুদ্ধ যন্ত্রণাকে সবেগে ঠেলে দিয়েছে চেতনাকে পাথর করে তুলবে বলে। সে তো সেই প্রচণ্ড ধাক্কা অনুভব করেছে, এক নিমেষে নেমে এসেছে মার যন্ত্রণার অতল গভীর খাদের একেবারে শেষ ধাপে।

স্মৃতিরেখার শেষ কথাগুলোর মধ্যে সঠিক কোনো প্রশ্ন না-থাকলেও, নিশ্চয় আশা করেছে কথাগুলোর সমর্থনে ও আর কিছু বলবে। কিন্তু ওকে চুপচাপ থাকতে দেখে প্রথমটা অস্বাভাবিক গম্ভীর হয়ে ওঠে, পরে স্বাভাবিক কণ্ঠেই প্রশ্ন করে, কী হল? হঠাৎ এমন চুপ করলে?

না ওঠ, উঠতে উঠতে ও বলল, ভাবছি আমার মা'র কথা।

কী হয়েছে? কণ্ঠে উৎকণ্ঠা, স্মৃতি উঠতে উঠতে বলে।

না হয় নি কিছু। হবে আর কী? ভাবছিলুম, বাবা মারা যাবার পর একদিনের জন্যেও মা বাড়ির বাইরে পা ফেলে নি কোথাও। আর বাবা বেঁচে থাকতেই বা কি? আমি তো এখন মনে করে বলতে পারি কবে কবে কোথায় গেছে মা। জান, তুমি হয়তো বিশ্বাস করবে না, একদিন পরিষ্কার একখানা কাপড় পরে গায়ে অগুরু কিংবা সস্তা সেণ্টের গন্ধ ছিটিয়ে সামান্য একটু সিনেমা দেখতে যাওয়া বা বড়লোক আত্মীয়ের বাড়িতে বেড়াতে যাওয়ার ছুতোয় তাদের ঐশ্বর্য দেখার

লোভ মা'র জীবনে একটা ঘটনা আর আমারই তো মা। আমি, কারো সুখ সহ্য করতে পারি না।

হাঁটতে হাঁটতে ওরা ট্র্যামলাইনের কাছাকাছি এসে গেছে। এত মন্থর হেঁটেছে যে আদৌ হেঁটেছে কিনা বুঝতে পারে না। স্মৃতি সমানে মুখ নিচু করে হেঁটেছে। ওর কথার সব তাৎপর্যটুকু না-ধরলেও যেটুকু ধরেছে তাতে মনে হয় ও আজ আর মাথা তুলতে পারবে না, বা হয়তো ইচ্ছা করেই তুলবে না। পশ্চিম আকাশের আলোর ভগ্নাংশে স্মৃতির মুখ একটি বার মাত্র চোরের মতো দেখে নিল। লজ্জায় নিদারুণ বিষণ্ণতায় অপরাধীর মতো মুখের চেহারা হয়ে উঠেছে তার। তার মুখের দিকে চেয়ে এবার মনে হল, কী সে এতক্ষণে সত্যি সত্যিই করেছে। বেশ তো, সব বলার পর শেষের কথা কটা না-বললেও পারত।

একটি প্রচণ্ড আঘাতে স্মৃতিরেখার সুখী হওয়ার, খুশি হওয়ার যত আবদারে আত্মরে কথাগুলোকে ঠিক নিঃসাড় করে দেওয়ার জন্মে যেন সমস্ত শক্তির বিনিময়ে প্রাণপণে তৈরী হওয়া। কেন এমন হল? সামান্য কথায় ফেরবার মুহূর্তটিকে স্মৃতিকে অহেতুক মূক করে রাখল। নিজের বাক্‌শক্তিকে ধিক্কার দিতে ইচ্ছে হল। স্মৃতি এখন কিছুতেই আর মুখ খুলবে না। লজ্জায়, অভিমানে, জড়তায় সে সমানে এমনি নীরবে দাঁড়িয়ে থাকবে যতক্ষণ না বাস বা ট্র্যাম কিছু একটা আসে। আর এখন কোনো অপ্রয়োজনীয় কথা বলে যে স্বাভাবিক করে তুলবে, তাও সম্ভব নয়।

ট্র্যাম এল একখানা। ট্র্যাম এসে থামার কিছু আগে থেকেই ও তাকিয়েছে বার দুই তিনেক। স্মৃতি ঠিক ওর চোখে চোখ রাখতে পারে নি। ট্র্যাম এসে যখন থেমেছে, তখন স্মৃতিরেখা তাকিয়েছে দু-চারজন যাত্রীর দিকে যারা নামছে। তারপর ওঠবার ঠিক মুহূর্তটিতে চকিতে তার দিকে একবার ফিরে চোখে চোখ রেখেছে। তখন লক্ষ্য করে দেখেছে ওর চোখ বিষাদ, ম্লান। হেসে স্বাভাবিক হওয়ার বিন্দুমাত্র চেষ্টা করে নি।

ট্র্যামটা চলে যাওয়ার পরই বিষণ্ণতা নির্জনতা সবকিছু একজোটে তাকে পেয়ে বসে। অন্যদিন হলে হয়তো একটা কেন তিনটে ট্র্যামও ছাড়ত। আজ একটা ট্র্যামও মিস করতে চায় নি। আর সে অন্যদিন হলে? স্মৃতিকে বাসে বা ট্র্যামে তুলে দিয়েই ফুটপাথে উঠে এসে অনতিবিলম্বে সিগারেট ধরিয়েছে। সারাটা রাস্তা স্মৃতির কথায় বিভোর হয়ে এসপ্ল্যানেডের দিকে এগিয়েছে।

আর আজ? সমস্ত শরীর ভারি ঠেকছে। বিশেষ করে পা ছুটো। বার বার মনে হচ্ছে খালি, তার বাস আসতেই কি এত দেরি?

॥ ৫ ॥

আঘাত পেলে নিজেকে যেমন বিশেষ ক্ষেত্রে মৃতের সামিল মনে হওয়াটাও অস্বাভাবিক কিছু নয়, তেমনি কখনো কখনো সম্পূর্ণ ইচ্ছার বিরুদ্ধে আঘাত দিয়ে ফেলে অনুশোচনায়, আত্মপীড়নের জ্বালায় দগ্ধানো যে কি নিঃসীম অন্তর্জ্বালা সেটুকু বোঝাবার মতো সমব্যথী মনই বা মেলে কোথায় সব সময়। যদি বা সমব্যথী কেউ থেকে থাকে, তাকে যখন নির্বিচারে দুঃসহ আঘাত হানে মানুষ তখন তার শেষ সহানুভূতির, সমবেদনার নিঃসংশয় আশ্রয়টুকুও হারায়। বাড়ি ফেরার পথে তার বার বার এ-কথাটাই মনে এসেছে। সমস্ত রাস্তাটুকু ট্র্যামের জানলা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে থেকেছে। একমাত্র বাতাসের বেগের স্পর্শ আর ট্র্যামচলার শব্দ ছাড়া কিছু স্মরণ করতে পারে না। ভেবেছে অনেক, অনেক কিছু ঝড়ের বেগে, কিন্তু ভাবনার গতির চেয়ে অনেক দ্রুত ছুটেছে ট্র্যাম। ট্র্যামের হু-হু গতি তার বিরামহীন দ্রুতগতি ভাবনাকেও অতিক্রম করে গেছে। ভেবেছে বাড়ি যখন পৌঁছবে তখন দেখবে সূর্যের শেষ শক্তিটুকুও ক্ষয় হতে হতে সম্পূর্ণ নিঃশব্দে লুপ্ত হয়েছে আকাশের পশ্চিমাংশ থেকে। কিন্তু তা হয় নি। কারণ অনেক তাড়াতাড়ি তাকে বাড়ির কাছে এনে ফেলেছে দ্রুতগামী ট্র্যাম। গোধূলি তখন যাকে বলে ঠিক মরো-মরো।

মনকে ভাবনা মুক্ত করতে চেয়েছে, হাল্কা করতে চেয়েছে, নিজেকে আবার যথার্থ প্রকৃতিস্থ দেখতে চেয়েছে। কিন্তু ফেরার মুখে সব কোথা থেকে এলোমেলো হয়ে গেলো। যে-দুঃস্বপ্নকে প্রাণপণ তাড়াতে চেয়েছে সেই দুঃস্বপ্নই মস্ত মহীরুহ হয়ে সহস্র শাখার অসংখ্য মৃত্তিকামুখী ঝুরিতে তাকে বন্দী করেছে যেন নাগপাশে। স্মৃতিরেখা বেদনার প্রলেপ হয়ে আসতে চেয়েছে, কিন্তু হয়ে উঠতে পারল কই। স্মৃতি তো একটি মাত্র

বেদনাকেই সহস্রমুখী করে চেতনার আনাচে-কানাচে ছড়িয়ে রেখে গেল। কী আশ্চর্য, স্মৃতি যখন এসেছিল, তার পিছনে নীরবে বসেছিল, তাকে সঙ্গে করে তাদের পরম প্রিয় জায়গাটিতে বসে ভালবাসার নীরব ভাষা দৃষ্টির গভীর আলোয় যত মালিন্যকে মুছে ফেলতে চেয়েছিল তখনো দুজনের কেউ বুঝতে পারে নি, বিন্দুমাত্র অনুমান করতে পারে নি, আজকের এই অপরাহ্ণের গোধূলিপ্রভা সামনের অন্ধকারের নিশ্ছিদ্র নির্দয় রাত্রিকে তাদের হাতে তুলে দিয়ে যাবে। এ যেন কোনো অপ্রতিরোধ্য ভয়ঙ্কর সর্বনাশের পর কপালে ঘন ঘন করাঘাত করা আর অস্ফুট শব্দে নিয়ত উচ্চারণ করা, একী হল।

ভেবে অবাক হবারই কথা। কোথা থেকে এত আলো জমা হয় আকাশে। আর পশ্চিম আকাশে রংয়ের সঞ্চয়ই বা এমন অশেষ হয় কি করে। এখনো অবশিষ্ট যেটুকু আলো তাতে চেনা পরিচিত জনের দাঁড়ানো বা বসার বহুদেখা ভঙ্গি থেকে চিনতে পারা যায় তাকে কিছু দূর থেকেও। এই আলোয় তার মুখ চোখ আলাদা করে কিছু দেখা যাবে না। তার সারা অবয়বের বহির্রেখাটুকু থেকে অনুমান করা যায় তার নাম, পরিচয়।

এই অস্বচ্ছতাকে অন্ধকার থেকে আলাদা করে দেখার কৌতূহল এই চলমান ব্যস্ত শহরে কারো নেই। এ-শহরটাই তো এক কারখানা। সারাদিন এখানে কাজ চলছে। অবকাশ, অবসর নিয়ে গল্প কথা ঠাট্টার মতো শোনায়। যদি ইলেকট্রিকের আলো না-মেলে তো ল্যাম্পের আলোয় কাজ চলবে। আর অস্তিত্বকে, বাঁচার প্রয়োজনকে শহরবাসী একান্তে উপলব্ধি করতে পারে। বাড়িতে ফিরে সে আশা করেছিল প্রয়োজন মতো আলো জ্বলবে বাড়িতে। কিন্তু তলায় ছাড়া ওপরের কোনো ঘরে আলো জ্বলছে না। সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠেই বাঁক নেয়ার মুখে প্রায় স্তম্ভিত হল। মুমূর্ষু গোধূলির শেষ বেলার আলোয় আকাশ পাণ্ডুর। আর সেই আকাশের দিকে মুখ ফিরিয়ে মা দাঁড়িয়ে আছে চৌকাঠে একটি পা রেখে। দুয়ের মধ্যে স্বাভাবিক মিল খুঁজে পেল সে। বাইরের ওই প্রদোষালোকের অসহ্য যন্ত্রণাবিদ্ধ আকাশ আর এখানে এই আলোআবছায় ঘরের মধ্যে মা'র শীর্ণ মূর্তির বহির্রেখা।

মা কি ওই গোধূলির অসহ্য আকাশের রঙে মিশে এক হয়ে যেতে চায়। সারা জীবন ধরে মা কি শুধু এই ক্ষণটির অপেক্ষায় এখনো ধৈর্য ধরে আছে। নিজের জীবনের সমস্ত যন্ত্রণা, ক্ষোভ, অভিযোগ, অপূর্ণতা ও বঞ্চনার সব কিছুর নিখুঁত প্রতিলিপি মা এই ক্ষণটিতে আকাশের ওই পশ্চিম দিকে তাকিয়ে থাকলে পেতে পারে, মনে হয়।

যেখানে দাঁড়িয়ে ছিল একটি পা-ও নড়ল না সেখান থেকে। আজই তার আকস্মিক মনে হল এ দৃশ্য। তবে এমন করে হয়তো মা দাঁড়িয়ে থেকেছে কখনো কখনো এমনি আলো-অন্ধকারের সন্ধিক্ষণে। যা তার চোখে পড়ে নি। হয়তো ছোড়দি দেখেছে মাঝে সাঝে। টেনে এনেছে মাকে ঘরের মধ্যে, আলো জ্বেলেছে, আর মা'র মনের ভাব লঘু করতে চেয়েছে মুহূর্তে অন্ধকারকে তাড়িয়ে খুব সহজেই। ও তো কই পারছে না সুইচ্ টিপে ঘরের ইলেক্‌ট্রিক আলোয় বাইরের অন্ধকারকে ঘরে ক্ষণস্থায়ী করতে মাত্র কটি সেকেণ্ডে। ও ভেবেছে, কতকাল মনের চেতনার অবচেতনার স্তরে মা এই অন্ধকারকে বাসা বাঁধতে সম্মতি দিয়েছে। আর সেই অন্ধকার জমতে জমতে জমাটবদ্ধ হয়ে মাকে অনড় পাথর করে তুলেছে, অপরাহ্ণে বা প্রায়-সন্ধ্যার মুহূর্তগুলিতে এমনি বিবশ আনমনা করে রেখেছে।

মাথার ওপর থেকে আঁচল খসে ঘাড়ের ওপরে এসে পড়েছে। কয়েকটি চূর্ণ কেশ বাতাসে এলোমেলো কাঁপছে। বিষণ্ণতার সর্বাংশ দিয়ে নিজের অবয়বকে মেলে দিয়েছে ওই আকাশের শেষ সীমা অবধি। ভেতরে ভেতরে কান্নায় টুকরো টুকরো হয়ে গেছে। এখন মা'র নীরবতা ভাঙলে মা চমক থেকে উঠে যখন তাকাবে সেই দৃষ্টির মধ্যে ধরা পড়বে মা'র অসার জীবনের অনন্ত শূন্যতাবোধ। তারপর সেই শূন্যতাবোধ, জীবনের অর্থহীনতা সব কিছু থেকে কারো ডাকে সচকিত হয়ে মা মুখে অস্ফুট আওয়াজ তুলবে। ফিরে আসতে চাইবে স্বাভাবিক কথার প্রসঙ্গে। এমন কি পেটের সন্তানের কাছেও মা লজ্জাকে তাড়াবার জন্যে আঁচলের সবটুকু দিয়ে মুখ ঢাকবে অল্পবয়সী নারীর মতো। কিন্তু বেশিক্ষণ কথা বলতে গিয়েই ফের নিজের অস্বাভাবিক মানসিক অবস্থাকে অজ্ঞাতেই প্রকাশ করে ফেলবে। মা কি সত্যিই বোঝে না—বেদনা

যেখানে অপার সেখানে মানুষ অখণ্ড নীরবতার আশ্রয় নিয়েও কিছু করতে পারে না। কিংবা হয়তো কথা বলে সহজ হওয়ার চেষ্টা করতে গিয়ে নিজের অসহায় অস্তিত্বকে, অশান্ত চিত্তকে আরো বেশি লক্ষণীয় করে তোলে।

খুব সন্তর্পণে ঘরে ঢুকল। মা'র কাছাকাছি দাঁড়িয়ে পিছন থেকে ডাকল, মা যেন চিত্তের তন্ময়তা থেকে মাকে এমন সজাগ করে তোলার জন্যে এই ডাকের মধ্যেই ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছে। মা বাস্তবিক ডাকে একটু সচকিত হয়েছে। ভাবতে পারে নি এত সকাল সকাল ঠিক সন্ধের মুখেই ফিরবে। স্মৃতি যে এসেছিল আর ও যে তাকে নিয়েই বেরিয়েছে, তা মা দেখেছে। আর তাইতেই মার বিস্ময়। এমন নিশ্চুপ পিছনে দাঁড়িয়ে থেকে মাকে যে এই অবস্থায় ধরে ফেলবে তা মা চিন্তা করতে পারে নি। কারণ স্মৃতিরেখার সঙ্গে বেরুলে তার তো ফেরার সময় এটা নয়। আরো কিছুক্ষণ বসে, গল্পকথায় পথ হেঁটে স্মৃতিকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে তারপর যদি নিজে বাড়ির পথ ধরত তবে এ-সময় সত্যি বাড়ি পৌঁছনোর কথা নয়।

কীরে, সকাল সকাল ? মাকে স্বাভাবিক হতেই হয়।

কই সকাল সকাল, ভাল করে তোমার মুখ দেখা যাচ্ছে না পর্যন্ত, মার প্রশ্নের জবাবদিহি করতে হয়। স্মৃতির প্রসঙ্গ চাপা রাখার প্রয়োজনেই কি কথাগুলো বলার তাৎপর্য ? মনে মনে সত্যি কথাটা মেনে নেয়।

মুখ দেখা যাচ্ছে না, না আরো কিছু। মা'র সামান্য কথা কটির অর্থ কিন্তু মাত্র একটি। সে মনে যা স্বীকার করেছে বাইরের প্রকাশে তাকে অগ্রাহ্য করেছে।

কথা শেষ না-করেই মা ওর মাথার চুলগুলোকে অবিন্যস্ত করে দেয়। তারপর হাতটা ঘাড়ের ওপর বুলিয়ে পিঠের মাঝামাঝি এনে কিছুক্ষণ রাখে। এই সময়টা মনে হয় নিজের বিদ্যাবুদ্ধির অকারণ চাপল্য, নিজের ক্ষমতার অহেতুক আস্ফালন, আশাতিরিক্ত আত্মপ্রত্যয়, সব কিছুকে মা'র এই ব্যবহারের কাছে কী ছেলেমানুষী মনে হতে পারে। তার এই ছেলেমানুষীর প্রতি মা'র মনোভাবের কাছে আত্মসমর্পণ করার তৃপ্তি সে অনুভব করতে পারে।

মা যে বেশি কথা কইতে পারবে না এ তো জানা কথা। স্মৃতির সঙ্গে তার আলাপ ব্যবহারের চিরাচরিত প্রথায় মাঝে মাঝে ওলোট-পালোট ঘটে না এমন তো নয়, কিন্তু আজ কেমন এক দুর্ঘটনা ঘটল। যদি না-ঘটত তবে কি মাকে পাওয়া যেত এমনি অপ্রত্যাশিত। বিশেষ করে এই পটভূমিকায়। মা কি সন্দেহ করেছে স্মৃতির সঙ্গে তার পরিচয়ের যে দীর্ঘকাল সেখানে কোথাও কিছু এমন অবাঞ্ছিত ঘটেছে যা তাদের নিবিড় সম্পর্ককে যোজন পথের তফাতে এনে ফেলেছে। কেন মা'র এই ভীতি? মা তাকে স্নেহ করে? আর সে? তার কি অধিকার কতর্ব্য কিছুই নেই? আজ মা'র এই বিশেষ চেতনাকে জীবনধারণের প্রবল অনিচ্ছাকে গভীর অনুসন্ধিৎসায় পরীক্ষা করে দেখে। ঠিক সুতোর জট থেকে একটি একটি গিঁট আলগা করার মতো, বহুক্ষণ ধৈর্য ধরে, সময় নিয়ে।

কিছু খেয়ে তো বেরুস নি, অনেক কটি মুহূর্ত থেমে থাকার পর মা কথা বলল। ঘরের অন্ধকারে মা'র নিচু গলার আওয়াজও বেশ জোর শোনাল।

না, ওর গলার স্বর ওর নিজেরই কানে যায় না এমন অস্ফুট। অনেক সময় চিন্তা গলার নালিকে এমন রোধ করে বসে যে কথা বার করা মুশকিল। আর চরম অবস্থায় গলার শির ফুলে দপ্ দপ্ করে, একটি কথাও তবু বেরুবে না মুখ দিয়ে, শেষকালে সব ব্যথা ফোঁটা ফোঁটা করে চোখের জলের সঙ্গে নির্গত হবে। আজ তারো কি সেই অবস্থা হবে না কি।

চা করি, একটু চা খা, মা বলে, এতক্ষণের অস্বাভাবিক অবস্থা থেকে মাত্র কয়েকটি কথায় ক্রমে ক্রমে নিজেকে মুক্ত করে। কণ্ঠের স্নেহে আচ্ছন্ন করে রাখে তার মানসিক ক্লান্তিকে। সে কি পারত যন্ত্রণার পাঁকে অনিমেষ কটি প্রহর আবদ্ধ থেকে ঠিক স্বল্প পরেই শান্ত স্বাভাবিক হতে। এও কী মা'র কর্তব্যবোধ? মনের ঠিক এই অবস্থাতেও?

ও কথা আর বলে না বিশেষ। কপালটা, চোখ দুটোকে মা'র বাহুর উপরাংশে আর কাঁধে ঘষে। কতক্ষণ দাঁড়িয়ে আছে অন্ধকারে মা'র সঙ্গে? শ্বেতাদি বা এমন কি স্মৃতির সঙ্গেও কি দাঁড়িয়ে থাকতে পারত

এই ভাবে এমন অন্ধকারে। হয়তো পারত ছোড়দির সঙ্গে কিছুক্ষণ কিন্তু অন্ধকারকে আর নিথর সময়কে এমন পরম নির্ভর, বিশ্বাসী আশ্রয় মনে করতে পারত কি? এইখানেই কি মা আর সবায়ের থেকে স্বতন্ত্র হয়ে দূরে সরে গেছে। যন্ত্রণার আঘাত, বঞ্চনার দুঃস্থতা, নৈরাশ্যের ভয়াবহতা সব কিছুর নিকট স্পর্শ পেয়েও মা আবার তাই স্বাভাবিক হতে পারে সময়ের প্রয়োজনে।

ঘর থেকে বেরুবার সময় মা আলোটা জ্বেলে দেয়। এও কী কর্তব্যবোধ? তবে এতক্ষণ জ্বালো নি কেন? অন্ধকার তো অনেকক্ষণ ঘরের দেয়ালগুলোকে অস্পষ্ট করে তুলেছে। তবু কেন তুমি সঙ্কীর্ণ আলোর এত অসুবিধের মাঝখানেও আলো না-জ্বেলে দাঁড়িয়েছিলে?

আলোটা নিভিয়ে দিয়ে যাও, মা'র ঘর থেকে ঠিক বেরুনোর মুহূর্তেই সে অনুরোধ করে মাকে।

সে কী! অন্ধকারে বসে থাকবি? ফের ঘরে পা দেয় মা।

চোখ দুটো টনটন করছে কেমন, কথাগুলো বলার সময় ওর শুধু মনে হয়েছিল, তুমি এতক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিলে কী করে?

কেন? মাথা ধরে নি তো?

না, সামান্য একটু।

গরম চা খা, ছেড়ে যাবে, আশ্বাস দিয়ে যায় মা। আর বেরুবার সঙ্গে সঙ্গেই আলোটা নিবিয়ে দিয়ে যায়। কটি সেকেণ্ড ঘরে আলোটা জ্বলেছে। মা'র শেষ কটি কথার অবসরে। তারপর ঘর আবার অন্ধকার। এই অন্ধকার তার আরো কিছুক্ষণ প্রয়োজন।

মা ঘর অন্ধকার রেখে বেরিয়ে যাবার পর সে আবার নিজের চেতনার পাশে এসে দাঁড়াতে পারে। মাকে নির্জনতা থেকে মুক্তি দিয়ে মা'র মনের অথৈ স্তব্ধতায় মাথা ডুবিয়ে রাখতে চায়।

কিসের এক নিবিড় যন্ত্রণায় সমস্ত শরীর মন মোচড় দিতে থাকে। বাইরের এই গোধূলির আকাশ আজ না-দেখলে সে মা'র যন্ত্রণার কোনো পরিমাপ পেত না। এই আকাশ, এই গোধূলির ক্ষণ, চারপাশের এই দুর্লভ আলোর রং অনিন্দ্যর কাছে তাই পরম সত্য লগ্ন। বাস্তবিকই তাও পূর্ণতা দিয়ে ধরে রাখতে পারে না। আজ এই আকাশের

কিছুক্ষণ আগের অপসৃয়মাণ আলোর পটভূমিকা ছাড়া মা'র সারাজীবনের ব্যর্থতা, ক্ষোভ ও বঞ্চনার হিসাব নিকাস তাই অসম্পূর্ণ নয় শুধু, অসম্ভবও।

স্মৃতিকে অকারণ দুঃখ দিয়েছে বলে মনে অনেক কথা তোলপাড় করেছে। আসলে নিজের মন অজ্ঞাত কোন বেদনায় আহত। আর স্মৃতির সহজ নিতান্ত স্বভাব অনুযায়ী কথাগুলো তাই একটার পর একটা ক্ষোভকে জাগিয়ে মনকে ক্ষেপিয়ে তুলেছে। কিন্তু বাড়ি ফিরে মাকে যে অবস্থায় দেখেছে তাতে প্রথমটা ব্যথার অসহতা সাময়িক হবে মনে করেছে। মা চা তৈরী করবার জন্যে বেরিয়ে গেলেই অন্ধকার ঘরে কড়িকাঠের ওপর একটা কম্পমান আলোর দিকে চোখ রেখে সে ভেবেছে মা'র কথা। রাস্তা থেকে কিসের আলো এসে ঠিকরে পড়ছে কড়িকাঠের মাথায়। ওর এক মুহূর্তে মনে হয়েছে স্মৃতিকে কেন্দ্র করে ওর যত কথা, সহানুভূতির অনুকম্পার, ও সব ফিরিয়ে নেবে। মা'র এই কিছুক্ষণ আগের চেহারাটা একবার দেখাতে পারলে স্মৃতি নিঃসন্দেহে মানত কেন ও অমন রূঢ় হয়ে উঠেছে বিনা কারণে। আর এই কারণটাই চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিত। আবার কিসের অসহতায় অস্ফুট উচ্চারণ করে: একটুও মিথ্যে বলিনি আমি। সমস্ত সত্যি। তোমাকে যতটুকু বলেছি তা দিয়ে মা'র দুঃখের কাহিনীর যদি সামান্য কণাটুকুও তোমায় বোঝাতে পারতুম। তোমার মাকে তুমি ছেলেবেলা থেকে যেমন দেখে আসছ, আজো তাই। পরিবর্তনকে তোমরা যেমন চেয়েছ তেমনি এসেছে। তাই কোথা দিয়ে এল বুঝতে পারনি। ভাগ্যের চাকা গড়িয়ে ক্রমান্বয়ে সৌভাগ্যের দিকে গেছে। আর মা'র?

মা তার মেয়েলি গল্পের টুকরো টুকরো অনেক অংশ শুনিয়েছে নানা দীর্ঘ অবকাশের মুহূর্তে ছোড়দিকে বসে বসে। মা-মেয়ের মনখোলা কথাবার্তার কিছু কিছু কখনো সখনো সে আড়াল থেকে শুনেছে, কখনো বা শুনেছে ছোড়দির মুখ থেকে।

বিয়ের দুচারটে বছর পর বাবার একবার প্রয়োজন হল একশো টাকার। নিতান্ত অধিকারবোধে তরুণী স্ত্রীর কাছে যুবক স্বামীর প্রেমের

আবদারের মতো করে বাবা বলেছে মাকে, তোমার বাবার কাছ থেকে চেয়ে দাও না টাকাটা। একটু সামলে উঠেই আমি দিয়ে দেব।

মা নীরব থেকেছে। লজ্জায় মাথা নিচু করে বাবার অসম্ভব কথাগুলোর পাশ কাটাতে চেয়েছে। ভেবেছে এই নীরবতা বাবাকে ওই প্রশ্নের আর কোনও জের টানতে দেবে না। কিন্তু বাবা চেয়েছিল, মা অবশ্যই কিছু একটা বলবে। তাই আবার কথাটাকে ঠেলে দিয়েছে, কি চুপ করে রইলে যে? দরকারে অদরকারেও কি আত্মীয়-স্বজনের কাছ থেকে একটা উপকার পাওয়া যাবে না?

মা বিচলিত হয়েছিল, লজ্জায় গলা বুঁজে এসেছিল মা'র। খুব নিচু গলায় বলেছিল, থাকলে আর দিতে কি? থাকলে তো।

মা'র কথাকে বিশ্বাস করেও মা'র বাবাকে যেন পুরোপুরি অবিশ্বাস করেছে বাবা। তাই খোঁচাটা পরোক্ষে সামনে উপস্থিত মা'র ওপর গিয়ে লাগল, থাকলেও কতো পেতুম জানা আছে, ইচ্ছে থাকলে না-থাকলেও দেয়া যায়, ধার করে লোকে দেয়।

যেন সব দোষ মা'র। মা যেন স্বেচ্ছায় বারণ করেছে মা'র বাবাকে টাকাটা কোনখান থেকে জোগাড় করে এনে দিতে। তখন যে মা কী ভীতুই ছিল—কথাটা বলেছে ছোড়দি। গল্পের উত্তেজনায় মা'র অসহায় অবস্থা কল্পনা করে ছোড়দি মা'র পক্ষ নেওয়ার মত করেই বলেছিল, বাবারও ঠিক গোঁয়ার্তুমি চেপে বসেছিল। একটা ভাল মত কৈফিয়ৎ তলব না-করে কিছুতেই ছাড়বে না। মা'র মৌনতাকে কিছুমাত্র ঠাঁই দেয়নি। ওটা কোন উত্তরই নয়। আবার নিজেকে প্রস্তুত করে নিয়ে সমস্ত পৌরুষকে উত্থিত করে অসীম গর্বে বলেছে, বললে তো স্বীকার করবে না কিছু এমনি তোমাদের (অর্থাৎ এমনি তোমাদের পরিবার)—শুধু তোমাকে উদ্ধার কেন, তোমার—

আমার বাবাকেও উদ্ধার করেছ, বাবার কথায় বাধা দিয়ে মা জড়িয়ে জড়িয়ে, আঁচলে চোখ মুছতে মুছতে বলেছে।

নিজেদের নিঃসম্বল দারিদ্র্যের কথা স্বভাবতই মা'র মনে এসেছে। যা করা স্বাভাবিক মা'র পক্ষে মা ঠিক তাই করেছে। মা'র তখন যে-

বয়স তাতে গভীর লজ্জা, নিদারুণ অভিমান প্রকাশের এ ছাড়া কোন সোজা পথ ছিল না। বয়সের ধর্মানুযায়ী সবচেয়ে সহজ পথ বেছে নিয়েছিল, যেন আত্মরক্ষার দ্বিতীয় কোন পথ খোলা ছিল না।

বাবা মা'র এ-ধরনের ব্যবহারের জন্যে একটুও প্রস্তুত ছিল না। আত্মগর্বের, পৌরুষপ্রকাশের ফল যে এমন শোচনীয় হতে পারে তা বাবার জানা ছিল না সে বয়সে। কোথায় যে আঘাত দিয়েছে তা বুঝতে বাবার দেরি হওয়ার কথা নয়। হয়নিও। একেবারে মর্মমূলে গিয়ে বিঁধেছে বাবার কথাগুলো।

কিন্তু সবই তো বাবা স্বেচ্ছায় জেনে-শুনে করেছে। দরিদ্র পিতার অসহায় কন্যাকে স্ত্রী বলে গ্রহণ করেছে, বিনিময়ে কোন প্রত্যাশা ছিল না বাবার। আর মা'র অহঙ্কার ছিল শুধু, বাবা মা'র কোমল শ্যামল মুখশ্রী দেখে নেশাগ্রস্ত হয়েছিল। মেয়ে দেখার পর বিন্দুমাত্র দেরি করে নি বাবা। যত শিগগির আর সস্তায় বিয়ের পাট চুকিয়েছিল।

বাবার তখন ভবিষ্যত কল্পনা করারই কথা। ভাঙা বাড়ি আর সামান্য জায়গা জমি যা ছিল দেশে, সব বেচে কিছু টাকার মালিক হয়েছে। ইচ্ছে করলে বাবা যে দেখে-শুনে হিসেব করে লাভ-লোকসান খতিয়ে বিয়ে করতে পারত না, তা তো নয়। সবে বি. এ. পাশ করেছে। তারুণ্য ও স্বীয় বুদ্ধিতে অগাধ বিশ্বাস বাবাকে তখন কোন নৈরাশ্যে ঢাকতে পারত না। তাই ওরকম বিয়ে করে বাবা যে নিজের লাভ বা ভবিষ্যত উন্নতির কথা কিছুমাত্র চিন্তা করে নি বরং নিঃসম্বল কোমলমনা স্নিগ্ধা একটি মেয়েকে নারীজীবনের এক কঠিন সমস্যা থেকে রক্ষা করে ঔদার্যের পরিচয় রেখেছে, তার জন্যে মা'র কৃতজ্ঞতার শেষ নেই। শুধু বিয়েই করে নি, মা'র কোমল শ্যামলশ্রী রূপকে যথার্থ মর্যাদা দিয়ে মা'কে গ্রহণ করেছে। মা'র বাবা অন্তত বাহ্যিক ব্যবহারে একটুও জানতে পারেন নি এ ব্যাপারে কৃতজ্ঞতা দেখানর কিছুমাত্র থাকতে পারে। অর্থাৎ দয়া বা করুণার সামান্য কিছুও প্রকাশ পায় নি আগাগোড়া বাবার কোন ব্যবহারে। যদিও সর্বক্ষণ মা'র বাবা কৃতজ্ঞতাবোধে আচ্ছন্ন করে রেখেছিলেন নিজেকে। ছোড়দিকে বলেছিল মা, ওই ব্যাপারের খবর

মাঝরাতে নাকি বাবা ক্ষমাও চেয়েছিল মা'র কাছে, মা'র নাম ধরে ডেকে। বাবার কণ্ঠটা যেন কানে আসে।

বিয়ের ঠিক আরো কটা বছর পরে বাবা বেশ বুঝতে পারল একক জীবনের দায়িত্ব আর দ্বৈতজীবনের নানা ছোট বড় দায়-দায়িত্ব একেবারেই এক কথা নয়। মোটা ভাতকাপড় ছাড়াও তরুণ স্বামী হিসাবে তরুণী ভার্যার টুকিটাকি শখ, নানা ইচ্ছার প্রতি স্বাভাবিক কর্তব্য আছে। আর শখ মানুষের অল্প বয়সেই থাকে, মা হবার পর ছেলেমেয়েদের শখই তখন মায়েদের শখ হয়। এত জানা সত্ত্বেও বাবা একদিন মা'র একটা বহুদিনের শখের জিনিস নষ্ট করেছিল।

লুকিয়ে মার শখের একটা আংটি বাবা বার করে নিয়েছিল মা'র তোরঙ্গ থেকে। বেশ কটি দিন কেটে গেলে মা একদিন আবিষ্কার করল তোরঙ্গে আংটিটা নেই। কেঁদে ফেলেছিল প্রিয় শখের বস্তুটি অমন না বলে-কয়ে উধাও হয়ে যাওয়ায়। আতিপাঁতি করে খুঁজেও যখন পেল না, বুঝল নিশ্চয় বাবার কাজ এটা। বাবাকে বলল একদিন, সত্যি বল কোথায় গেল আমার আংটি। তুমি ছাড়া আর কে আছে যে নেবে?

বাবা সত্যি কথাটা গোপন করতে চেয়েছে। বলেছে, আংটিটার প্যাটার্ন এমন চমৎকার এক বন্ধুর বিয়েতে ঠিক ওই রকম একটা তৈরী করিয়ে দেবে। ওই রকমের আরেকটা আংটি গড়াতে দিয়েছে বাবা। বোধ হয় হয়ে গেছে এতদিনে। দুটোই নিয়ে আসবে এক সঙ্গে। তারপর মাকে অবাক করে দেয়ার মত করে বলেছে, দেখলে একেবারে ধরতেই পারবে না, কোনটা তোমার আর কোনটা নতুন গড়ানো। তোমারটাও পালিশ করে রাখতে বলেছি।

শেষকালে একদিন ধরা পড়ে গেল। আসলে ব্যাপার ওসব কিছুই নয়। টাকার দরকারে আংটিটা বাঁধা রেখেছিল। সুদ দু চার পয়সা করে মাস বছর ঘুরে বেড়ে যায়। ছাড়িয়ে আনব করে করে আর আনা হয় নি। আংটিটা হাত ছাড়া হয়ে যায় শেষ পর্যন্ত। মার খুব আশা ছিল বাবা হয়তো শেষ পর্যন্ত ছাড়িয়ে আনতে পারবে।

মার বয়স অনুপাতে ক্ষোভের বাহ্যিক রূপটা কিছু মাত্র অতিরিক্ত নয়। মা মুষড়ে পড়েছিল। তারপরে বাবার সামনে বা আড়ালে যখনই ভেবেছে কথাটা, কেঁদেছে।

বাবা মোটে কল্পনাই করতে পারে নি। আংটি বাঁধাদেয়া থেকে এমন দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। মাকে অনেক করে বুঝিয়ে সান্ত্বনা দিয়ে শান্ত করেছে। হাতে টাকা এলেই মাকে গড়িয়ে দেবে আংটি একটা। মা বলেছিল, ওই পাথর কোথায় তুমি পাবে? ওটা কোথাকার জান?

বাবা বলেছে, ওর চেয়ে ভাল স্টোন তোমায় দেবে।

মা মোটেই খুশি হয় নি ওতে, বলেছে, ভাল মন্দ বুঝি না, ওই জিনিস তো আর পাব না। এসব সত্ত্বেও মার মনে কোথায় ক্ষীণ আশা ছিল, হয়তো নতুন আংটি একটা পেতেও পারে। কিন্তু বাবা আংটি গড়ানোর প্রসঙ্গটা নানা কারণে দূরে সরিয়ে রাখতে চাইল। এড়িয়ে যেতে চাইল কথাটা। ইচ্ছে করেই যেন ভুলে যেতে চাইল। মা ক্রমে বুঝতে পারল আংটি আর কোনদিনও গড়ান হবে না। কথাটা পাড়ার আর কোন আগ্রহ দেখান ভুলে গেল। তারপরে আস্তে আস্তে ভুলে যাওয়ার চেষ্টা করল। তবু কি ভুলতে পেরেছিল মা বাস্তবিকই?

সারা জীবন এমন করে সামান্য লোকসান থেকে বৃহৎ লোকসানের ক্ষতি স্বীকার করে মা শেষ পর্যন্ত বাবার মৃত্যুর বঞ্চনাকে যেদিন অনুভব করল সেদিন আর কোন বঞ্চনার জন্যে মনে এতটুকু ভয় মাত্র রাখল না। অনেক সামান্য ব্যাপারেও ধরা পড়ত মা নিজেকে সরিয়ে নিয়েছে সবায়ের কাছ থেকে দূরে, অনেক সংক্ষিপ্ত করে ছোট করে নিয়ে আত্মস্থ হয়েছে নিজের নির্জন সঙ্কীর্ণ জগতের মধ্যে।

এসব চিন্তার সঙ্গে একটি অনুভব বা উপলব্ধি প্রায় সমান্তরাল গতিতে চলেছিল। সর্বক্ষণই মনে হচ্ছিল, কিছুক্ষণ আগের ওই চঞ্চলতার কথা ভেবে, স্বচক্ষে দেখে, এই শহরের অবিরাম ব্যস্ততা যেন মানুষের জীবনের স্থবিরতাকে ক্ষণিকে গতিশীল করে তুলতে পারে; এখন এই ঘরের মধ্যে বসে কড়িকাঠের ওই ছিটকে আসা আলোর দিকে অপলক চোখ তুলে সেই বিশ্বাসের কণামাত্রকেও চিন্তায় ঠাঁই দিতে পারা যায় না। মনে হবে শুধু, ঘনায়মান অন্ধকারে অস্তিত্ব ধারণের এই নিদারুণ

অসহ্যতায় চারিপাশের সব কিছু তাকে মা'র অর্থহীন অস্তিত্ব নিয়ে ব্যঙ্গ করতে চায়। ঘরের মধ্যে বাইরের কোলাহল, জীবন্ত মানুষের নানা কণ্ঠস্বর, বাইরের আকাশের পক্ষবিস্তার যে এমন অস্পষ্ট হয়ে আসে, গুটিয়ে আসে ছোট হয়ে, আর সেই আকাশের গাঢ় কমলা রঙ যে এমন নিষ্প্রভ হয়ে হঠাৎই আচমকা মিলিয়ে যায় তা আগে তার জানা ছিল না।

মা'র পায়ের শব্দ কানে আসতেই সজাগ হয়ে ওঠে। উঠে বসে সোজা হয়ে চেয়ারটায়। মা ঘরে আলো জ্বেলে দেয়ার সঙ্গে সঙ্গেই কড়িকাঠের ওপর থেকে অদ্ভুত আলোটা কোথায় মিশে যায় চক্ষের নিমেষে। ওখানে যে খানিকটা আলো কোথা থেকে এসে অদ্ভুত ভাবে ঝুলছিল তা আর এখন মনে পড়ারই কথা নয়। আর ওই রহস্যময় আলোটা অদৃশ্য হয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই এতক্ষণের যত রাজ্যের ভাবনার তোলপাড়কে মুছে দিয়ে গেল।

মা ঘরে ঢুকল, হাতে চায়ের কাপ। মা'র হাতে গরম চায়ের কাপ দেখে চায়ের তৃষ্ণাটা অনুভব করল। এই মানসিক ক্লান্তি জানবার কথা মা'র, মা-ই জেনেছে। চায়ের জল ফুটোতে, চা তৈরী করতে যে সময়টুকু লেগেছে তারই মধ্যে কি মা মুখের চেহারা পাল্টিয়েছে, যেমন ক্লান্তি বা ঘাম, মুখের ভাঁজ, অবাঞ্ছিত রেখা তুলে ফেলবার বা ঢাকবার জন্যে মেয়েরা প্রসাধন করে। মা রান্না ঘরে বসে চায়ের সরঞ্জাম পাশে নিয়ে কী করে যে মুখের চেহারায় এই আগাগোড়া পরিবর্তন টেনে এনে তাকে প্রায় বিস্মিত করে দিতে চাইল, তা তার ভাবনারও অনেক বাইরে—দূরে।

কিছুক্ষণ আগের ওই আকাশটার কথা আর ওই আকাশের কচিৎ-দেখা বর্ণের কথা ভেবেই তার মনে হল। মা'র বাইরের অবয়বের আর মনের এই পরিবর্তনের জন্যে ঘরের চৌকাঠের ওপাশে কিছুক্ষণ আগে যে আকাশটা দেখেছিল, সেই আকাশের অসাধারণ পটভূমিকাই তো সব। কিছু আগে দেখা মা'র ওই উদাসীন মূর্তি, সংসারবিমুখ পলাতকা চাহনি আর এখনকার এই কর্তব্যনিষ্ঠ চেহারা এ দুয়ের মধ্যে যে বৈপরীত্য তা নিঃসংশয়ে এই আলো-জ্বালা ঘরের অন্ধকার-তাড়ানো ঔজ্জ্বল্য, আর বোধ

হয় চিরকালের জন্যে হারিয়ে যাওয়া ঘণ্টাখানেক আগেকার ওই ক্ষণদৃষ্ট আকাশের বিরল বর্ণের সমাবেশ।

মাকে এখন একটি মাত্র প্রসঙ্গ নিয়ে আরো সহজ, স্বাভাবিক, ঘরোয়া করে তোলা সম্ভব। তার চিন্তার খুব কাছাকাছি হয়ে মা'র কণ্ঠস্বর কানে বাজল, অর্থাৎ মা'র কথাগুলো তার চিন্তাকে এত দ্রুত অনুসরণ করেছে যে শেষ পর্যন্ত অতিক্রম করে গেছে। তার মনের চিন্তা কানের পর্দায় কথা হয়ে বাজবার আগেই মা'র প্রশ্ন শুনতে পেয়েছে, এমন করে অন্ধকারে বসে আছিস, কী হয়েছে সত্যি করে বলতো ?

বললুম তো মাথাটা ধরেছিল—

চা খেয়ে কমেছে ?

হ্যাঁ, হ্যাঁ, ও কিছু নয়—যে কথাটা তোমায় বলছিলুম, বলার শেষে একবার পর্যবেক্ষণের মত করে তাকায় মা'র চোখের দৃষ্টিতে। নতুন কিছু একটা শোনার কৌতূহল মা'র দু চোখের দৃষ্টি আচ্ছন্ন করেছে, গলার আওয়াজেই ধরা পড়ে স্পষ্ট মনের উদ্‌গ্রীব ভাব, কী কথা।

ওই তো অতীশদাকে জিজ্ঞাসা করবে বলছিলে—

মা'র মুখ দেখে মনে হয় সূত্রটা ধরতে পারছে না। ওর চালাকিই তবে মা'র অসুবিধের কারণ। ওতো চেয়েছিলও এই। যেন অকৃত্রিম কণ্ঠে এই স্বাভাবিক, ও বর্তমানের একটি মাত্র প্রশ্নকে উত্থাপন করতে চাইছে।

আরে ছোড়দির ব্যাপারে অতীশদা যে কী বলবে যেন ওর মাকে।

হ্যাঁ, আমিও বলছিলুম তাই, কথাটা খুলে বলাটাও তো দরকার একবার ; মা প্রিয় বাঞ্ছিত প্রসঙ্গে অপ্রত্যাশিত ফিরে আসতে পেরেছে যেন। মা'র কণ্ঠে উৎসাহের আতিশয্য, সে কেন, উপস্থিত থাকলে যে কেউ ধরতে পারত।

ও নিজে নিঃসংশয় হয়েছে এ ব্যাপারে। অতীশদার হ্যাঁ-কে না করবার শক্তি কারো বা কোনও কিছুর নেই। মাকে অহেতুক কথা বলাবার, কথা কয়ে অন্যমনা চিন্তা, ব্যথাতুর ভাবনা থেকে মুক্তি দিয়ে খুব স্বাভাবিক করার চেষ্টাতেই প্রসঙ্গটা তুলেছিল। এবার যেন নিশ্চিন্ত করবার জন্যেই বলল, অতীশদার মা এতদিনেও কি আঁচ করেন নি

কিছু। সবই ভাল জানেন। অতীশদাওতো মাকে ফাইনাল কিছু জানায় নি এখনও।

এমন দুয়েকটা সাধারণ ইংরেজী কথার অর্থ এড়িয়ে গিয়েও মা আন্দাজ করতে পারে সবটাই। বলে, তবু একটা মতামত তো দরকার।

মতামতের আর কি আছে। তুমি অতীশদাকে ডেকে বল একদিন। অতীশদা সোজাসুজি গিয়ে জিজ্ঞাসা করবে।

তার অর্থ নিশ্চয়ই পরিষ্কার হয়েছে মার কাছে। অর্থাৎ অতীশদা কী করবে না করবে তুমি আমার কাছ থেকেই জেনে নিতে পার।

পারুলের মনের ইচ্ছেটাও আমি বুঝতে পারি। বয়সের আর বাকি আছেটা কী। যেমন কপাল, নইলে আমার পেটে আসতে যাবে কেন মরতে।

ও ধরতে পারে গোপন ব্যথাটার যথার্থ কারণ। যত কথাতেই যাও আর যেমন ভাবেই ওল্টাবার চেষ্টা কর, মা সেই ঘুরে ফিরে নিজের কপালের কথায় ফিরে আসবে। দোষারোপ করবে নিজের হত ভাগ্যকে। যেন সামান্য উপায়টুকু থাকলে নিজের ভাগ্যের সঙ্গে ছোড়দির বা তার ভাগ্যকে জড়াত না।

সান্ত্বনার কথাই, মা যাতে না ধরতে পারে, কণ্ঠস্বর এমন সহজ ও স্বাভাবিক করে সে বলে, না ওটা কোন কথা হল না। ছোড়দির বয়সে আজকাল আখছার মেয়েরা বিয়ে করছে। লেখাপড়া শিখতে শিখতে, তারপর চাকরি জোগাড়ের চেষ্টায়—ওর আর শেষ করার প্রয়োজন হয় না।

বাকি কথাগুলো কী হতে পারে মা আন্দাজ করতে পারে। শেষেরটুকু সম্পূর্ণ অবিশ্বাস করার মত মা উড়িয়ে দিতে চায় একেবারে নিরুত্তর থেকে। নিজেকে সামান্য একটু গুছিয়ে নিয়ে তারপর আস্তে আস্তে ঘরের বাইরে পা দেয়।

ছোড়দি ফিরল শ্বেতাদিদের ওখান থেকে। শ্বেতাদিদের বাড়িতে ছোড়দি যখনই গেছে, ফিরেছে একমুখ হাসি নিয়ে, অনেক উৎসাহ নিয়ে। শ্বেতাদির বিয়ের পর ইদানীং ছাড়াছাড়ি হয়ে গিয়েছিল। যাওয়া আসা কমেছিল অনেক। আর তা ছাড়া বিয়ের পর শ্বেতাদি কলকাতা ছেড়ে অনেক দূর চলে যাওয়ার ফলে ছোড়দি শুধু যে প্রাণের বন্ধুটিকে হারিয়েছে তা-ই নয়, এই কলকাতাকে ভাললাগার কেন্দ্র বস্তুটিকেই হারিয়েছে। দূর প্রবাস থেকে শ্বেতাদির চিঠি এসেছে, অতএব এখানে যেহেতু শ্বেতাদি নেই এখানের বাড়ির কথাও তার মনে থাকবার নয়। শ্বেতাদির মা জানেন বরাবরই যে শ্বেতাদি ছাড়া এ-বাড়ির আকর্ষণ ছোড়দির কাছে কোনদিন প্রবল হতে পারে না। তবু তিনি যে মধ্যে-মধ্যে ওঁদের বাড়িতে যাওয়ার জন্যে ছোড়দিকে বলেন নি তাও সত্যি নয়। এবারে অনেকদিন পরে মেয়ে তাঁর কাছে এসেছে, এ-কারণেই তিনি ছোড়দিকেও তাঁদের বাড়িতে দু-চারটে দিন থাকার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন মেয়ের কাছে যদিও এ-ব্যাপারে তাঁর মেয়ের ইচ্ছাই তাঁর ইচ্ছার প্রাথমিক কারণ, মনে হয়।

এবার যখন ফিরবে তার খুব আশা ছিল ছোড়দির মুখেচোখে এমন একটা ভাব লক্ষ্য করবে যাতে মনে হবে এই অকথ্য একঘেঁয়ে বাঁচার হাত থেকে ছোড়দি নিজেকে অনেকখানি মুক্ত করেছে। এই কলকাতা ছেড়ে যেন অনেক দূরে স্বাস্থ্যকর জলহাওয়ায় কটা দিন হাসি খুশির হাল্কা আবহাওয়ার পরিবেশে কাটিয়ে দেহের না-হোক মনেরও খানিক পরিবর্তন নিয়ে ফিরল। কিন্তু ছোড়দির মুখ দেখে যে-কোনও লোকেরই যা মনে হওয়াটা স্বাভাবিক, তারও তাই হল। যদিও প্রথমটা যত কম জটিল মনে হয়েছিল, আসলে একেবারেই তা নয়। সব কথা

খুলে বলেছে শ্বেতাদি। শ্বেতাদির মাও এসে কেঁদে ফেলেছেন। লুকিয়ে রাখার মত কথাটাও লুকোন থাকে না। কিছু রেখেঢেকে বললেও জানেন শ্বেতাদির সঙ্গে ছোড়দির কথাটা নিয়ে খোলাখুলি আলাপ হবে। শ্বেতাদির কথা যত মনোযোগ দিয়ে আর গম্ভীর হয়েই শুনুক ছোড়দি, শ্বেতাদির মা'র কান্নাজড়ান স্বরে বেশ বিচলিত হয়েছে। নিজেই যেন অপরাধী। অনেকদিন ধরেই অনেক কিছু শুনেছেন শ্বেতাদির মা। আর নিশ্চয় অপেক্ষায় ছিলেন শ্বেতাদির কলকাতায় আসার। এলেই বলেছেন বড় মেয়ের দুর্বুদ্ধির কথা। শ্বেতাদি শুনেছে সব একটি একটি করে। তাদের বাড়িতে শ্বেতাদির ব্যবহারে কেউ বিন্দুমাত্র অনুমান করতে পারে নি কথাটা। ছোড়দিকে নিজেদের বাড়িতে এনে, কয়েকদিন রেখে কথাটা বলেছে, আলোচনা করেছে, একটা সুরাহা খুঁজেছে। বলাইবাবু আর অরুদিকে নিয়ে কানাঘুঁষো অনেক কথাই কানে আসছিল শ্বেতাদির মা'র। তারপর বলা নেই কওয়া নেই যেদিন বলাইবাবুর মা'র কাছ থেকে হঠাৎই উড়ো চিঠির মতন একখানি পত্র হাজির হল সেদিন কিন্তু একেবারে মুষড়ে পড়লেন। কি বলবেন, কি লিখবেন এই ভেবে নিরুত্তর রইলেন। কিন্তু বলাইবাবুর মা'র কাছ থেকে খান দুই পত্র পরপর এসে হাজির। এবারে আর কিছুই করবার থাকল না। স্বামীর কাছ থেকে যতটা সম্ভব দূরে রেখেছিলেন কথাটা। আর তাছাড়া একটু-আধটু কানে গেলেও তিনি গায়ে মাখতেন না। তারপরে স্বামী গেলেন বাইরে। বিশেষ কাজে গেছেন। ফেরার নির্দিষ্ট সময়ের এদিক-ওদিকও হতে পারে একটু। ফাঁকা বাড়িতে অঞ্জন, চাকর আর ঝিকে নিয়ে থাকা। মনের অশান্তি, অস্থিরতা দ্বিগুণ হয়ে জ্বলছে। শ্বেতাদির আসার খবর পেয়ে যেন হাতে স্বর্গ পেলেন। এই মেয়েটির কাছেই সংসারের যাবতীয় সমস্যার সমাধান খোঁজা যায়। শ্বেতাদি ফেরবার পর খুব আস্তে আস্তে ভেঙেছেন কথাটা, পরে বলাইবাবুর মা'র চিঠি মেয়ের হাতে তুলে দিয়ে বলেছেন, আর আমাকে তোদের মা বলিস নে শ্বেতা।

ছেলে তাঁর এ-ব্যাপারে বিন্দুমাত্র জ্রক্ষেপ করতে চায় না। অঞ্জন বেরিয়ে যায় অনেক সকালে। নিজের ভবিষ্যতের উন্নতিতে সে কাজের

মধ্যে আপাতত বর্তমানে নিজেকে ডুবিয়ে রাখবে। সংসারের আর পাঁচটা বাজে কাজের ঝামেলায় নিজের সময় ও স্বাস্থ্য সে নষ্ট করতে চায় না। হাবভাবে এইটাই জানিয়েছে তার মাকে, তুমি যা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছ, অমন ব্যাপার বড়দির বয়সী মেয়েদের নিয়ে, তাদের রূপ ও চাতুর্য নিয়ে হামেশাই ঘটছে আজকাল। কথাটা বলেই হয়তো নজীর তুলেছে। কিংবা হয়তো বয়স্ক সংসারী লোকের ভঙ্গিতেই বলেছে, শুনবে না তো আমার কথা, ধরে-বেঁধে বিয়ে দাও। চুকে যাক ল্যেঠা। তোমার কথার ওপর আবার কথা কি! বছরের পর বছর মেয়ে পড়ছেন। শিক্ষয়িত্রীর আদর্শ জীবন গড়বেন!

কিংবা কখনো হয়তো উত্তেজিত হয়ে বলেছে, সে যে জলজ্যান্ত পুরুষ এটাই প্রমাণ করার কোন এক অপ্রত্যাশিত সুযোগ পেয়ে, লিখে দাও তোমার মেয়েকে এতদিন মানুষ করে বড় করেছ তুমি। আর আজ বাইরের সাড়ে-সাতজন তার ভবিষ্যতের মঙ্গলের জন্যে উপদেশ পরামর্শ দিতে সাহস পায়। তার সম্বন্ধে যারা এ-কথাটা রটাচ্ছে তারা একটুও ভেবে দেখে না এতে সেই মেয়ের বা তার পরিবারের কিছুমাত্র ক্ষতি হবে না। তাঁর মেয়েকে যারা নাচাতে চায় তারা কি ভেবে দেখে না মেয়ের যা শিক্ষাদীক্ষা তাতে হুট করে অমন কাঁচা কাজ সে করবে না।

কিন্তু এমন কড়া কথায় স্পষ্ট করে চিঠি কিছুতেই শ্বেতাদির মা লিখতে পারেন নি। বাধা পেয়েছেন মনের কোথায়। ভেবে দেখেছেন চিঠির কথাগুলো। কোন কিছু একটা সত্যিসত্যি না-ঘটলে, এমন করে লেখবার মানুষ তো তিনি নন। তাই একটু অপেক্ষা করেছিলেন, শ্বেতা এলে, একবার ভেবে চিন্তে দেখতে বলবেন কথাটা। তারপর মেয়েকে কড়া চিঠি দিয়ে ফেরার কথা জানিয়ে, বলাইবাবুর মাকে খুব শান্ত ও যুক্তিপূর্ণ একখানি দীর্ঘ পত্র দেবেন। তাতে ফল ভালই ফলবে। কারণ তিনি জানেন মেয়ে সে মেয়েই। যদি এ নিয়ে আর বেশ কিছু দূর গড়িয়ে যায় কথাটা তা হলে মন্দ বই ভাল তো হবে না। বলাইবাবুর গায়ে আঁচটি পর্যন্ত লাগবে না। অরুদি কি ভেবে দেখেছে কথাটা এক মুহূর্তও? খেয়াল খুশি মত যা ইচ্ছে করে যাচ্ছে পরে

একটা কিছু ঘটে গেলে ? অরুদির কি মাত্রা জ্ঞানও নেই। সারাটা জীবন এমন হা-হা হো-হো করে কাটাবে। মানুষের ক্লান্তি বলেও তো থাকে।

বিয়ের চেষ্টা করেছেন শ্বেতাদির মা। মেয়ে নাকি মোটেই রাজী হয় নি। ভাল জায়গায় পাত্রস্থ করা এমন শক্ত নয় শ্বেতাদি বা অরুদির মত মেয়েকে। আর তাছাড়া অরুদির সৌন্দর্যের চটক সহজেই কেমন টানে পুরুষদের। শ্বেতাদির বিয়ে হয়ে গেল। অরুদি নিজের ইচ্ছে তার বাবাকেও জানাল। অরুদির বাবা মেয়ের ইচ্ছাকেই প্রাধান্য দিলেন। দেখে-শুনে ছোট মেয়ের ব্যবস্থা করলেন বিয়ের। কোনো ইচ্ছাই শ্বেতাদির এ-ব্যাপারে নিজের বলতে ছিল না। বিশেষ করে বাবার যদি তেমনি সাধ হয়ে থাকে, শ্বেতাদির বাধা দেওয়ার কিছু নেই। অরুদি এই সুযোগে হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। অরুদির বাবাও সাব্যস্ত করলেন মেয়ের যদি পড়াশুনো নিয়েই থাকতে ইচ্ছে, বেশ তাই থাক। কোন আপত্তি নেই তাঁর। আজকাল তফাৎ নেই ছেলেমেয়ের। দিব্যি লেখাপড়া শিখে মেয়ে হয়েও ছেলের কাজ করছে। বুঝিয়েছেন স্ত্রীকে, তোমার তো আর দশটি নয়, ওই একটিই রইল। ওর জন্যে আর এত ভাবনা কিসের। স্ত্রী যদি প্রতিবাদের কণ্ঠে কিছু বলতে গেছেন তো, মেয়ের কাছ থেকে শুনেছেন, আমার জন্যে মা'র যদি খুব অসুবিধে হয়তো, এখন থেকে নিজেই আমি খুব চালিয়ে নিতে পারব বাবা। যেটুকু লেখাপড়া শিখেছি তাতে আমার চলে যাবে। মেয়ের এ-কথার উত্তরে যে কী বলবেন তা ভেবে পাননি বাবা। স্ত্রীও নীরব হয়ে রইলেন, আর তিনি স্ত্রীর মুখের দিকে তাকিয়ে যে দৃষ্টি মেলে রাখলেন তার ভাষা মাত্র একটি, ইচ্ছে থাকলেও আমি নিরুপায়। আজকালকার মেয়ে, তার ওপর লেখাপড়া শিখেছে, বয়সও হয়েছে সমস্ত বুঝে চলার।

শ্বেতাদির মা এই ভাবে কথা কাটাকাটি করেছেন কখন স্বামীর সঙ্গে, কখন বা মেয়ের সঙ্গে। কোন মীমাংসা হয় নি শেষ পর্যন্ত। মেয়ে বিয়েতে রাজী হয় নি। বাবার কাছ থেকে কথা আদায় করেছে, নিজের শখ মত পড়াশুনো সংগীতচর্চা শেষ না-করে কিছুতেই মা'র

ইচ্ছা মত বিয়ের জন্যে তৈরী হবে না। অগত্যা শ্বেতাদির বিয়েরই সব ব্যবস্থা করতে হয়েছে।

বছরের পর বছর ফেল করে অরুদি শুধু বছর মাসই পার করেনি, বয়স বাড়িয়েছে। ক্লাব, আড্ডা, নাচ-গান-থিয়েটারের মহড়া দিয়ে বেড়িয়েছে। অরুদির বাবা অল্পদিনেই বুঝলেন, যে-কথা তাঁর স্ত্রী এতদিন বোঝাবার চেষ্টা করেছেন। তবু করার কিছু নেই। সংসারে সব সন্তানের কাছ থেকে পিতামাতার একরকম প্রত্যাশা থাকতে নেই, একথা বুঝিয়েই মনকে প্রবোধ দিয়েছেন। যাক ছেলে তো তাঁদের মানুষ হয়ে গেল। আর ছোট মেয়ে বাবা মা'র নিতান্ত বাধ্য হয়ে, জীবনের স্বাভাবিক ধর্ম মেনে নিয়ে, খুশি করেছে, সুখী করেছে তাঁদের।

পড়াশুনো করলে যার হত সে-ই ছাড়ল লেখাপড়া, বলেছেন দুঃখ করে কতবার মা। তবু তাঁর স্বামীর ইচ্ছাই মেনে নিয়েছিলেন সব রকমের বিরুদ্ধতা সত্বেও। আর অরুদি, সত্যি বলতে কি গায়ে হাওয়া দিয়ে পার করে দিল কৈশোর আর যৌবনের প্রারম্ভ। না-হল শ্বেতাদির মত সংসারের দায়িত্ব ঘাড়ে নিয়ে ঘরনী, না-হল সত্যিকারের সফল বিদ্যাচর্চার কোন সুষ্ঠু ফল। যার কথা বাবা মা বা বাড়ির আত্মীয়স্বজন দশজনের কাছে গল্প করে নিজেরাও গৌরবের ভাগ নিতে পারে। তবু তা-ই হয়েছিল। সংসারে সব ব্যাপার যেমন হিসেব মত ছকের বাঁধা-ঘরে পা-ফেলে চলতে পারে না, তেমনি এই সংসারেরও অনেক কিছু এলোমেলো হয়ে গিয়েছিল। বাড়ির সকলের ধারণা ছিল ছোট মেয়ের যা মাথা তাতে সে-ই বাড়ির আরেকটা ছেলের কাজ করবে। আর বয়স একটু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই যাকে বিয়ে দিয়ে পর করার কথা ভেবেছেন সে-ই রইল আইবুড়ো হয়ে এতখানি বয়স পর্যন্ত। আশ্চর্য এই এক ব্যাপারে অর্থাৎ মেয়েদের বয়স বাড়ার প্রসঙ্গে শ্বেতাদির মা'র সঙ্গে তাদের মা'র গভীর মিল খুঁজে পেল। পয়সার তো কোন অভাব নেই, তবু মেয়ের বিয়ে নিয়ে তাঁর এই উৎকণ্ঠা কি কম কিছু। ছোড়দির বিয়ে নিয়ে মা'র অবস্থা তো নিজে চোখেই দেখছে সে। এই তো কটাদিন আগের কথা। ছোড়দি যখন প্রাইভেটে বি. এ. পাশ করার

কথা গল্প করেছে মা'র কাছে, মা আর না-পেরে থামিয়ে দিয়েছে। বলেছে, ছাখ, আর আদিখ্যেতা করিসনে পারুল। আজ বি. এ. পাশ করলে, কাল তোর বিয়ে হয়ে যাবে মনে করেছিস? কানের কাছে আর পাশ পাশ করিসনে। পাশ করা মেয়ে নয় চাকরি করে, নয় বড় ঘরে যায়। হবেটা কী তোর পাশ করে?

সত্যিই ভেবে দেখার মত কথাটা। বড় ঘরে যাওয়ার স্বপ্ন কি সত্যিই পীড়া দেয় ছোড়দিকে? আর পাশ করে চাকরি করার কথা কখনও ভেবেছে। একা-একা ট্রামে বাসে হুট হুট করে উঠে, এই অসম্ভব ভিড় ঠেলে গা-ঘেঁষাঘেষি করে পথ চলে, কর্তা-ব্যক্তিদের মন জুগিয়ে বিনা প্রতিবাদে অন্যায় অবিচার মেনে নিয়ে, ঘাড় হেঁট করে মুখটি বুঁজে, ছুটিছাটার দিন ছাড়া তিনশো পঁয়ষট্টি দিনের ক্যালেণ্ডার পার হয়ে আসতে পারবে ছোড়দি?

আর অরুদির কথা একেবারে স্বতন্ত্র। যত কথাই মুখে বলুক অরুদি। এমন কি নিজের সামান্য কোন দায়িত্ব নেওয়ার জন্যেও প্রয়োজন বোধে একটা চাকরি নেওয়ার কথা কখন বোধ হয় ভেবে দেখে নি অরুদি। তাই নিজের খেয়াল খুশি আবদার ইচ্ছে মেটাবার জন্যে যত কথাই মুখে বলুক, আসলে কাজের সময় যে একেবারেই তৎপর হবে না একথা অরুদির বাড়ির লোক কেন যারা তাকে ছু চারদিন দেখেছে তারাও নিশ্চিন্তে ভেবে নিতে পারে।

অঞ্জন একদিন ডেকে বলেছিল অরুদিকে, খুব ব্যস্ত হয়ে কাঁধে ক্যামেরা ঝুলিয়ে কোথায় বেরুতে যাচ্ছিল অরুদি তখন, একটা কাজই তোর হবে, আমি ভেবে দেখলুম—খুব ব্যস্ত?

অঞ্জনের মুখের কথায়, চোখের দৃষ্টিতে যে পরিহাস ছিল তা অরুদির নজর এড়াবার নয়। হাতঘড়ির দিকে একবার চোখ নামিয়ে নিয়েই জিজ্ঞাসা করেছে, কী বলবি বল, অঞ্জনের বাকি কথাগুলোকে যেন ইতিমধ্যেই উপেক্ষা করতে চাইল।

ভেবে দেখলুম ছবি তোলাটাই হবে তোকে দিয়ে। একটা কাজ করনা, একটা স্টুডিও করে ফেল না। এত হাঁটাহাটি দৌড়ঝাঁপের কোন দরকার হবে না—

অঞ্জনের কথার শ্লেষ কিন্তু অরুদিকে বিঁধেছিল। মনে মনে যে চটেনি একটু তাও নয়। বেশ ভেবে চিন্তে একটা উত্তর দেয়ার ইচ্ছে ছিল বোধ হয় অরুদির। কিন্তু সময়াভাবে যে উত্তরটা জিবের ডগায় এল তাতে মনের ঝাঁঝটাই প্রকাশ পেয়েছিল বেশি।

হ্যাঁ, বাকি আছ তুমি, এবার তোমার পরামর্শটা—কথা শেষ করার প্রয়োজন হয় নি অরুদির—খুব তাড়াতাড়ি, প্রায় একরকম লাফিয়ে, সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে গেছে। অঞ্জনকেও কথা বলার কোন অবকাশ দেয় নি।

অঞ্জনের কথার মধ্যে যত ঠাট্টাই থাক, একথা সে কেন, যারা অরুদিকে চেনে সবাই মানে, ফোটো তোলার হাত শুধু ভাল নয়, বেশ ভাল। অরুদি কেবল নিজের বাড়ির লোকেদের নয় বন্ধুবান্ধব আত্মীয়স্বজন যত লোকের ফোটো তুলেছে কেউ তার তারিফ না-করে পারে নি। সবাই প্রায় একবাক্যে স্বীকার করেছে, নিপুণ ক্যামেরাম্যানের দক্ষতা আছে তোমার, অরু। ও ভেবেছে বেশ তো, অরুদির মাও যেমন ভেবেছেন, বেশ ভাল মতই ক্যামেরার চর্চা করুক না কেন অরুদি। দশটা জিনিস নিয়ে মাথা ঘামিয়ে হৈ হৈ করতে গিয়ে শেষ পর্যন্ত কোনটাই করল না। আসলে মনের অস্বাভাবিক চাঞ্চল্য আর অস্থিরতাই সব কিছু মাটি করছে অরুদির। না হল ঠিক মত পড়াশুনোর চর্চা, না গানবাজনা, না ছবি তোলা। কতবার যে ইদানীং ওর মনে হয়েছে কথাটা। আর এসে ছোড়দি মাকে যে সব কথা বলেছে অরুদি সম্পর্কে তাতে ওর কেবলই মনে হয়েছে, স্বচ্ছলতার এও একটা অভিশাপ নাকি?

এবারেও তো হঠাৎ একদিন ধরে বসল অরুদি, বললে তো তুমি কিছুতেই বিশ্বাস কর না মা। এই দেখ, শুক্লা লিখেছে। চমৎকার ক্লাইমেট ওখানে এখন, ওখানকার ক্লাইমেট কখন খারাপ হতে পারে কোনও সময়ে?

যাবি যা। আমার বলার কি আছে, গরমেই লোকে যায় ওসব জায়গায়।

এখন আর বৃষ্টি কোথায়, শীত পড়ার ঢের আগেই তো চলে আসছি।

আমার গোড়াতেই ভুল হয়েছে তোর সঙ্গে তর্ক করা। আমার কোন

কথাটা তুই শুনেছিস একবারে, আর বচসা করতে চান নি তিনি মেয়ের সঙ্গে।

অরুদিও জানে এমন করে মাঝামাঝি অবস্থায় থেকে যে কোন ব্যাপারে মা'র মত দেয়া অভ্যেস। এর বেশি সম্মতির অপেক্ষায় তাই দাঁড়িয়ে থাকে নি। বন্ধু শুক্লার ওখানে যাওয়ার ব্যবস্থা করেছে। শুক্লার বাবা শিলংএর স্থায়ী বাসিন্দা হয়েছেন চাকরি ছাড়ার পর। এই সেদিন তাঁর স্ত্রী বিয়োগের পর, মেয়েকে আর পুত্রবধুকে নিয়ে দিব্যি আছেন নতুন কায়দা মাফিক বানানো বাড়িতে। শুক্লার শেষ চিঠিতে ছিল; তোদের জানাশুনো এক ভদ্রলোক এখানে এসে অস্থায়ী ভাবে আছেন কিছুদিন। তাড়াতাড়ি চলে আয়। এখন কিছু বলব না। খুব অবাক হচ্ছিস। আয় না, এলেই দেখতে পাবি। কবে আসছিস?

ভারি মজারই কথা বটে। আর শুক্লাটাও তেমনি। খালি ধোঁকা দেবে; একটুখানি কিছু শুনল তো এতখানি করে লিখবে। মতলব, যত তাড়াতাড়ি সে এখান থেকে রওনা দেয়। তবু এটা নিয়ে যে অরুদি ভাবে নি অনেক কথা তা-ও ঠিক নয়। নিজের হিসাব মত মেলাতে পারে নি কিছু। মনের মধ্যে একটা কৌতূহলকে সমানে চেপে রেখে আর একটি দিনও না-পিছিয়ে কাঁধে ক্যামেরা ঝুলিয়ে, ছোট্ট সুটকেসে দরকারি জিনিসপত্তর গুছিয়ে একদিন ট্রেনের কামরায় গিয়ে উঠে বসল। শুক্লার ওখানে যাওয়া হচ্ছে আর তারই সঙ্গে চিঠির ওই ছোট্ট খবরটুকু, দুয়ে মিলে আনন্দ, উত্তেজনা আর কৌতূহলের সংমিশ্রণ সমস্ত মনটাকে সারা পথ দুলিয়েছে।

শুক্লাদের ওখানে এসে ওঠবার পর অরুদি বুঝলে জায়গা পাল্টানোর তাগিদ যেমন মানুষ নিজের অজান্তেই অনুভব করে তেমনি এই তাগিদের পিছনে আছে কী, মনের একঘেঁয়েমি আর বিশেষ মুহূর্তের একটানা নির্জনতা বোধ! নতুন জায়গায় নতুন মানুষের মুখ, নতুন কণ্ঠস্বর, হাসি আলাপ সবকিছুই মনের স্থায়ী নির্জনতাকে সাময়িক ভাবেও তাড়াতে পারে। আবার হয়ত নতুন জায়গার নতুন আকাশ মাটি পরিবেশ বহুদিনের পরিচিত পুরনো বন্ধুকে অনেক দিনের অদেখার পর ফের নতুন করে ফিরিয়ে আনল। কলকাতার বাইরে বিশেষ করে শিলং দার্জিলিং বা রাঁচীর মতো জায়গায়

বারোমেসে কোলাহল থেকে হঠাৎ ছিটকে এসে পড়লে স্মৃতির দরজাটা কখন হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ে আর সেই খোলা পথে পুরোন দিনের বিশেষ অপরাহ্ণ সন্ধ্যা-সকাল রোদ বা জলের আকাশ, আশ্বিনের ভোর, গ্রীষ্মের নিঃশব্দ মধ্যাহ্ন, শীতের ধোঁয়াটে বিষণ্ণ সন্ধ্যা অতর্কিতে পা টিপে টিপে কখন ঢুকে পড়ে, আস্তে আস্তে আস্তানা গাড়ে মনের মধ্যে। হঠাৎ-ই মনে হবে বা আমি কি কলকাতায় কোনওদিন ছিলাম, কোনওদিন থাকতে চেয়েছিলাম! কলকাতার বর্তমানকে না-হলে শিলং-এর এখনকার সদা ভাসমান মেঘের আকাশ, বা বিশ্রামঅন্তের বিষ্টির হালকা পশলা, পাইন গাছের পাতায় জড়ান বাতাসের দীর্ঘশ্বাস কেন নাকচ করে দেবে, কেন এমন অহেতুক পুরনো কথা, হাসি আলাপের ধ্বনিকে কানের কাছে নিরন্তর স্পষ্ট করে বাজাবে। অরুদির মত চঞ্চল মন, অস্থিরচিত্ত মেয়েরও না হলে কি করে এই শূন্যতা বোধ জাগতে পারে?

বলাইবাবুকে এই জায়গায় এমন সময় দেখতে পাবে এটা কিন্তু অরুদির চিন্তায় কখন স্থির ছিল না। শুক্লার চিঠিতে ওই খবরটুকু পাওয়ার পর অরুদি সম্ভব অসম্ভব অনেকগুলো নামের একটা তালিকা তৈরী করেছিল বটে। কিন্তু বলাইদা ছাড়া তিনি যেন আর কেউ হতে পারেন না এটা একবারও ভাবেনি। বলাইবাবুর সঙ্গে এই দেখা তাই কটা দিনের মধ্যেই অরুদির চিন্তায় বড় ওলোটপালোট ঘটিয়ে দিল। অরুদি নিজেকে যেন হঠাৎই অনুভব করল আরেকবার সম্পূর্ণ নতুন করে, নিজেকে আগাগোড়া ভেঙে। সময় পেলে, আবার গড়ে নেয়। থেমে থাকতে চায়নি অরুদি, গড়ার কাজেই লেগেছিল। সময় অল্প বলেই যেন অরুদির উৎসাহের অন্ত রইল না। কালক্ষেপ আর যেন সইল না অরুদির। শুক্লা অরুদির গোছান ভাবে আর গুছিয়ে কথা বলার কায়দায় অবাকেরও বেশি কিছু হয়েছিল।

বলাইবাবুর চোখে কিন্তু অরুদি দুচারটে দিনের মধ্যেই ধরা পড়ে গেল। আর নিজেকে ভিতরে ভিতরে ক্রমাগত গোটাতে লাগলেন বলাইবাবু। বাইরের ব্যবহারে সব কিছু ঢাকা রইল তাঁর।

অরুদির বলাইবাবুকে এখানে আবিষ্কার করে যে বিস্ময় ভাব, বলাইবাবুর তার কণামাত্রও নয়। তাঁর এক বন্ধুর কাছে এসে উঠেছিলেন

বলাইবাবু। অরুদির বন্ধু শুক্লার সঙ্গে ও তাদের পরিবারের সঙ্গে পরিচয় তাঁরই সূত্রে। শুক্লা বা তাদের পরিবারের কেউই অনুমান করতে পারেনি বলাইবাবুর সঙ্গে অরুদির সম্পর্কের ঘনিষ্ঠতা। শুক্লার চোখে তাই সব ব্যাপারটা একটু কেমন কেমন ঠেকেছিল বইকি। এল বেড়াতে তাদের এখানে আর সব সময়টাই কাটল বলাইবাবুর সঙ্গে গল্পে আড্ডায়, ঘোরাঘুরিতে। তারপরে শিলং থেকে বলাইবাবু গেলেন গৌহাটিতে কি একটা ছোটখাট কাজ সারবার জন্যে, সঙ্গে অরুদিও গেল। শুধু চক্ষুলজ্জার খাতিরেই যেন একবার বলতে হয়েছিল অরুদিকে, চল না শুক্লা, একটু মজা করে আসা যাক। ভালই লাগবে তুই সঙ্গে থাকলে।

শুক্লার বৌদি চোখ টিপে হেসেছিলেন শুক্লার দিকে চেয়ে। অর্থাৎ এটা কি তার প্রাণের কথা, সত্যিই কি ভাল লাগবে অরুদির শুক্লা সঙ্গে থাকলে?

প্রথম যেদিন বলাইবাবুর বন্ধুর বাসায় অরুদিকে নিয়ে এল শুক্লা, কি অবস্থা অরুদির।

আপনি! ঠিক এমনই বিস্ময়জড়ান, প্রায় কাঁপা গলায় কথাটা উচ্চারণ করেছে অরুদি। সমস্ত পথে শুক্লার কথা থেকে এতটুকু আঁচ করতে পারেনি, তাদের পরিচিত লোকটি শেষ পর্যন্ত বলাইদা।

খুব অবাক হলে, না। বল তো ঠিক কতদিন পরে দেখা; বলাইবাবুর চোখের দিকে তাকিয়ে ঠিক মনে হল অরুদির, হিসেব করছেন বলাইবাবু সময়টা। আর কি যে বলবে সে তা ভেবে পায় না অরুদি। ঠিক যেন বেকুব বনে গেছে। শুক্লার মনে হয়েছিল কি বিপদেই সে নিজে পড়েছে মাঝখান থেকে।

বেঁচে থাকলে তবে দেখা ঠিকই হয়, কি বল অরু?

এখন তো বিশ্বাস না করে উপায় নেই।

সব ব্যাপারেই কিন্তু তাই, প্রমাণ না পেলে আর কে কী বিশ্বাস করে।

আপনার জেরা করা স্বভাব এখনও গেল না, ভীষণ অন্তরঙ্গকণ্ঠে কথাগুলো বলার চেষ্টা করে অরুদি বলাইবাবুর সঙ্গে তার দীর্ঘ দিনের পরিচয়ের কথাটা যেন সবাইকে নিমেষে অবাক করে দেওয়ার জন্যেই বুঝিয়ে দেয়।

অবিশ্যি তুমি আমাকে যতটা জানবে—বলাইবাবু ইচ্ছে করেই যেন সবটা বলেন না। যেন অনেকখানি অসমাপ্ত রাখতে চান। তাকিয়ে থাকেন বন্ধুর মুখের দিকে। অরুদির মুখের দিকে তাকালে বুঝতে কারও অসুবিধে হত না, অরুদি প্রত্যাশা করেছিল এই, কিন্তু সলজ্জ ভাবকে ঢাকতে পারে নি। চুপ করে থাকেনি। ভেতরের দুর্বলতাকে সাময়িক ঢাকবার জন্যে কথা বলেছিল।

আপনার কথার প্যাঁচ এখন গেল না, আমার জানার কী আছে।

তোমরা খালি গালিগালাজই করলে আমায়, ঘরের দিকে চোখ রেখেই বুঝি কথার সুর আর বেশি হাল্কা করার ইচ্ছা দমন করলেন বলাইবাবু। শুক্লা যে ঘরের মধ্যেই আছে, একথাও বুঝি মনে পড়ল বলাইবাবুর। শুক্লার অন্তত তাই মনে হয়েছিল বলাইবাবুকে দেখে। কেন যে অমন অতিরিক্ত নৈকট্যের কথা সবাইকে জানাবার জন্যে বলাইবাবু অতি মাত্রায় উৎসাহী হলেন তা কিন্তু বলাইবাবুর বন্ধুও টের পাননি। সত্যি কথাটার কিছুমাত্রও যদি অনুমান করতে পারতেন তো ভুলটা করতেন কিনা কেউ বলতে পারে না। আর বলাইবাবুর মা'র কানে কথাটা না উঠলে সব ব্যাপারটা এত চট করে এমন গোলমেলে হয়ে উঠত কিনা যথেষ্ট সন্দেহ।

কথা ফুরতে না দেওয়াই ছিল অরুদির উদ্দেশ্য। নিজে থেকে প্রশ্ন উত্থাপন করে কথা টেনে নিয়ে যাওয়ার মত সুযোগ তৈরী করা অরুদির পক্ষে ঠিক এখুনি এখুনি সম্ভব নয়। প্রস্তুতির জন্যে একটা সময় তো দরকার। তাই বলাইবাবুর কাছ থেকেই কথা আসবে, কখন সম্পূর্ণ কখন বা অসম্পূর্ণ, অরুদির আসল ইচ্ছেটা, হাবভাবে শুক্লা কি ধরতে পারেনি। সামান্য ছুটো একটা টুকরো কথা বা কথার ভগ্নাংশের সূত্র ধরে অরুদি আলাপের গতি অনেক তীব্র ও উদ্দেশ্য যথার্থ তীক্ষ্ণ করার প্রয়াসী হয়েছিল।

যাক তোমাদের বাড়ির খবর বল, চেয়ারের পিছন দিকে মাথাটা অনেকখানি হেলিয়ে বাঁ হাতের পাঁচটা আঙুল ডান হাতের পাঁচ আঙুলের ফাঁকে গলিয়ে পরপর কটা মটমট শব্দ তুলে, মাথাটা দুই হাতের জোড়া তালুর ওপর আলগা ছুঁয়ে রেখে, আলসেমি ভাঙার ভঙ্গিতে খুব মামুলি অথচ নিতান্ত জিজ্ঞাস্য প্রশ্নটা বলাইবাবু করলেন।

ভালই আছে সব।

তোমার মা কেমন আছেন? বাবা...শ্বেতা...অঞ্জন, উনিই তো এখন হেড অফ দি ফ্যামিলি...বলাইবাবুর কথার উত্তরে যতটুকু হাসার প্রয়োজন ততোটুকুই হেসেছে অরুদি। আর এই হাসিই বলাইবাবুর কথার উত্তর।

মাসিমা, কোথায় এখন, বলাইবাবুর মার কথাই জিজ্ঞাসা করেছে অরুদি, এ প্রশ্নটাই এ মুহূর্তে সবচেয়ে সহজ খুব স্বাভাবিক।

মা তো দেশের বাড়িতে।

আপনি যান না?

হ্যাঁ, ওই মধ্যে ছুটিছাটার ব্যবস্থা করে যেতে হয়। না গিয়ে উপায় আছে।

তা হলে সেই ন-মাসে ছ-মাসে।

তা ছাড়া আর উপায় কি, ওই চিঠি দিতে হয় সপ্তাহে সপ্তাহে। কোনবার যদি একটু অনিয়ম হল তো মার কাছ থেকে ইয়া লম্বা ফিরিস্তি।

তা আপনারও বোঝা উচিৎ, বয়স তো নেহাৎ কম হল না—

বুঝি তো সবই, ওদিকে মা আর এদিকে চাকরি। বুঝতে, এই দুই দায়িত্ব ঘাড়ে চাপলে!

তা বলে মা'র দায়িত্ব—অরুদি যেন বলাইবাবুকে তাঁর ব্যক্তিগত পারিবারিক দায়িত্ব বিষয়ে একটু বেশি সচেতন করে তুলতে চাইল। শুক্লাও বুঝেছিল, ধীরে ধীরে, এমন কি বোধ হয় বলাইদারও অলক্ষ্যে, বলাইদার ব্যক্তিগত জীবনের দরকারি অদরকারি কথায় চলে আসছিল অরুদি।

কথাটা যা বলেছ খুবই সত্যি, কিন্তু বড় চাকরির দায়িত্ব যে এমন বড়, আগে জানলে, অর্থাৎ বলাইবাবু কথার কিছু প্রচ্ছন্ন রেখে, এইটাই বলতে চেয়েছিলেন যে আগে এমন জানলে তিনি কখন নিতেন না। আর অরুদির মুখের দিকে তাকিয়েই বলাইবাবু বুঝেছেন, কথাটায় অরুদি কোথায় এক ধাক্কা খেয়েছে।

কেন, আপনি আগের অফিসে এখনও আর নেই! অরুদি যেন কতকালের জড়ো করা বিস্ময় থেকে আচমকাই ফেটে পড়েছে। বলাইবাবুর

আপাঙ্গ যেন বার বার পরীক্ষা করে দেখতে চেয়েছে। হঠাৎই বা মনে হয়েছে, সত্যিই তো বলাইদার চোখমুখের আর সমস্ত চেহারার এই জৌলুষ তো আগে এমন করে কোনদিন চোখে পড়েনি। তবে কি এটা সাম্প্রতিক পরিবর্তন ?

কোথায় আছ তুমি, অফিস আমার ওইটাই, তবে পদোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে মাইনেটা যেমন হাজারের কাছাকাছি হয়েছে, রেসপন্সিবিলিটিও হাজারের কম নয়, থেমে থেমে ভেঙে ভেঙে কথাগুলো বলা শেষ করে, বলাইবাবু তাকালেন অরুদির মুখের দিকে, অনেকটা, অনিচ্ছায় বুঝি জানিয়ে দিলেন মাইনের অঙ্কটা। আর অরুদির মুখে চোখে অবাক হওয়ার অবিশ্বাস্য কোন কিছু শুনে বা দেখে, ক্রমপরিবর্তন লক্ষ্য করলেন। বলাইবাবুর কথা শোনার শেষে কি তাঁকে খুঁটিয়ে দেখেছিল অরুদি, এখন আর দৃশ্যটা খুব স্পষ্ট মনে পড়ে না শুক্লার। তবে কথা বলতে একটু সময় নিয়েছিল। অন্তরে পরাজয়ের গ্লানি অনুভব করে তাকে ঢাকবার জন্যে যে পরিহাসের প্রয়োজন, সেই হালকা উচ্ছলতায় সমস্ত কণ্ঠ আচ্ছন্ন করে অরুদিকে বোধ হয় বলতে হয়েছিল তাই :

সেই জন্যে গা ঢাকা দিয়ে বেড়াচ্ছেন, জানাশুনো কাউকে কিচ্ছুটি জানান নি।

না, না...কথাটা ঠিক তা নয় কিন্তু। দেখো, সবই ভাগ্য, আমিই কি কোনদিন ভেবেছিলুম। রিটায়ার করার কথা যার পৌনে পাঁচশোয়, সে রিটায়ার করবে কমপক্ষে বারো চোদ্দশোয়। কখন যে কোথায় নিয়ে যায় মানুষকে ভাগ্য। সবই এই, শেষের কথা কটি উচ্চারণ করার সঙ্গে সঙ্গে বলাইবাবু তর্জনী তুলে কপালের মাঝখানটায় পর পর কয়েকবার টোকা মেরেছিলেন। কেমন এক বিনয় করে কথাগুলো ছেড়ে ছেড়ে বেলেছিলেন বলাইবাবু। বাচনভঙ্গিতে একটা মিহি, সূক্ষ্ম রেশ তুলেছিলেন, জীবনের নানা সুখ দুঃখের। তাঁর কণ্ঠের আন্তরিকতা যে কোন শ্রোতাকেই স্পর্শ করতো, অরুদিকে তাই নিশ্চিত স্পর্শ করেছিল। কণ্ঠের বিনয় ও বেদনাকে অতিক্রম করে যেটা ঘোষণার মত বেজেছিল অরুদির কানে, সেটাও কিন্তু বলাইবাবুর পদমর্যাদার অবধারিত প্রমাণ। অরুদি তাই ধাক্কা খেয়েছে আবার। কণ্ঠস্বর না হয়

ঢেকেছে এলোমেলো অর্থহীন, হাল্কা কথা দিয়ে, কিন্তু মুখতো আর দু হাতের মধ্যে বা আঁচল দিয়ে ঢাকতে পারেনি অরুদি। বলাইবাবুর প্রত্যাশা তাই চোখের কয়েক পলক নিষ্প্রভ দৃষ্টির মধ্যেই পূর্ণ করেছিল।

দীর্ঘ অসাক্ষাতের পর প্রথম আলাপের জড়তা এমন করেই কেটেছিল। অরুদি নিজেকে কেন্দ্র করে আবার অনেক কথা ভাবতে শুরু করলে। সমস্ত জীবনের ভুল ত্রুটি সারবার জন্যে উঠে পড়ে লাগতে চাইল অরুদি। বলাইবাবু বুঝি অরুদির এই ক্ষিপ্রতা, উৎসাহ, প্রাণময়তা সব কিছুকে আরও বেশি সজীব করে তোলবার আগ্রহ দেখালেন, পরিবেশ আর অপরিচিত সমাজ এই দুইকেই যেন দায়ি করতে চাইলেন তাঁর অহেতুক চাঞ্চল্যের জন্যে। আর ভিতরে কোথায় কেবল পিছু হাঁটতে শুরু করেছেন। অরুদির মনে হয়েছিল বলাইবাবুর ব্যবহারের আতিশয্য কানে একটি মাত্র কথা নিঃশব্দে উচ্চারণ করেছে, অস্ফুট আওয়াজটি মাত্র না তুলে, জান অরু, ভুল-ভ্রান্তি জীবনে যা ঘটেছে তা ঘটেছে, জীবনে ভুল করার মুহুর্তগুলো যেমন অপরিমেয়, তেমনি স্বল্পায়ু জেনো সংশোধনের, সংস্কারের সময়।

আর অরুদির কানের কাছে শেষ সতর্কবাণীর মত কাজ করেছিল কথাগুলো। যা বলাইবাবু অবশ্যই শব্দ করে উচ্চারণ করেন নি, শুধু তাঁর ব্যবহারে বুঝিয়েছিলেন, এরপর কথা বললে তিনি ওই বলতে পারতেন। বলাইবাবুর ব্যবহারের সুস্পষ্ট ইঙ্গিত একটি মাত্র অর্থকেই জীবনে যথার্থ বাঁচার অর্থ বলে অরুদির কাছে প্রকট করেছিল, এস ভালবাসার ভেলায় দুজনে ভেসে পড়ি।

সময় যেন এরপর সত্যিই পাখা মেলেছিল। যে সময়কে মানুষ মনে করে কাটতে চায় না, সেই সময় যে এমন দুরন্ত গতিতে চলবে, ঘণ্টা মুহুর্তের তুচ্ছ হিসাবকে অগ্রাহ্য করে একেবারে দিবাবসানের অন্তিমে এনে ফেলবে, এ কথাটা অরুদির চেয়ে আরও বেশি উপলব্ধি করতে পারত না কেউ অন্তত ওই সব মুহুর্তে। সামান্য কটাদিন যে একপক্ষ কালকে এরূপ ত্বরিতে গ্রাস করতে পারে, অরুদির যেন মনে হয়েছিল, তেমন হলে শিলংয়ে থাকার মেয়াদ আর কিছুদিন বাড়িয়ে দেবে। শুরু অরুদির

ভাবগতিক দেখে একদিন বলে ফেলল, এবার মনে হচ্ছে এখানকার যথার্থ নাগরিক হতে চলেছিস ?

অর্থাৎ আর এ্যালিয়েন নয় পুরোপুরি সিটিজেন, এই বলছিস তো ? শুক্লার ঠাট্টার কথাটা এমনি করে লুফে নিয়ে বলেছিল অরুদি। বলেছিল, থাকতিস কলকাতায় তো বুঝতিস আমাদের মনের অবস্থা। না, জায়গাটা সত্যিই বেশ লাগছে রে ! তুই কি তাড়াতে পারলে বাঁচিস।

তাড়ালেই তুমি যাচ্ছ বটে। কোনও শক্তি নেই পৃথিবীতে তোমাকে এখান থেকে এক পাও হটায়, সঙ্গে সঙ্গেই ভেবেছিল শুক্লা। আর কথাটা প্রায় জিবের ডগায় এসে গিয়েছিল, কেঁচো খুঁড়তে গিয়ে সাপ বেরুবে এই ভয়েই বলে নি—সত্যি করে বলতো জায়গাটা ভাল, না কোন বিশেষ একজনের গুনেই জায়গাটা রাতারাতি ভাল হয়ে উঠেছে। শুক্লার চিন্তার মধ্যে সত্য ছিল কি পরিমাণে, তা নিয়ে যত প্রশ্নই উঠুক, বলাইবাবুর আকস্মিক উপস্থিতি অরুদির মনে যে ঝড় তুলেছিল, বিক্ষিপ্ত, অশান্ত করেছিল অরুদির চেতনার অতি অস্পষ্ট বা প্রায় সুপ্ত অনুভূতিগুলো, তার নিঃসন্দিগ্ধ প্রমাণ, একটি কেন একাধিক সংখ্যায় ছড়িয়ে রাখল অরুদি ক্যামেরার সদ্ব্যবহারে। উজাড় করে দিল ফোটো তুলে।

তার তোলা ফোটোয় বর্ণ-বৈচিত্র্যময় আকাশ আর অনাবিল গন্ধময় সবুজ স্নিগ্ধ মাটি, গাছ ঘাসপাতা যত বেশি স্পষ্ট ও সজীব হয়ে ফুটেছিল প্রায় তারও বেশি স্পষ্ট ও স্বচ্ছ হয়ে উঠেছিল উৎসাহী ফোটোগ্রাফারের সমস্ত মন। বলাইবাবু জীবনে এই প্রথম বুঝি শিখেছিলেন কেমন করে স্বাভাবিক পোজ নিয়ে দাঁড়াতে হয় ক্যামেরার সামনে। আর তা শিখেছিলেন একটি তরুণীর কাছ থেকেই। অরুদি যেমন করে দাঁড়াতে বলেছে, যে ভাবে বসতে আদেশ দিয়েছে, যে পটভূমিকা বেছে দিয়েছে, বলাইবাবু সব কিছুতেই দ্বিগুণ উৎসাহে সায় দিয়ে গেছেন। কিন্তু একটি কথা কোনও অবকাশের ফাঁকেই ভুলতে পারেন নি। বলাইবাবু বুঝেছিলেন, মানুষের জীবনে হঠাৎ একটা সময় আসতে পারে যখন রঙ্গমঞ্চের পেশাদার অভিনেতা কেন শৌখিন অভিনেতার অভিজ্ঞতা ছাড়াও, সে বাঁচার বিশেষ কোনও পর্যায়ে নিপুণ অভিনেতার কলাকৌশল

বা দক্ষতা দেখাতে পারে। অন্তত অরুদির সঙ্গে তাঁর এ-সময়ের নানা ব্যবহারে বলাইবাবু তাই করেছেন।

কী দেখছেন অমন গোয়েন্দার মত? আসামীকে খুঁজে বার করছেন যেন, অরুদি যখন কথাগুলো বলছিল বলাইবাবু নিবিষ্ট হয়েছিলেন তাঁর একখানা ফোটোর ওপর। বলা বাহুল্য অরুদির ক্যামেরায় তার নিজের হাতে তোলা ফোটোখানা। অরুদির কণ্ঠ থেকে বলাইবাবুর উদ্দেশে সম্প্রতি যে সমস্ত উক্তি নির্গত হয়েছে তার মধ্যে শুক্লা বা বলাইবাবুর বন্ধু একটি সুর বরাবরই খুঁজে পেয়েছেন। প্রথমটা যেমন বহুদিনের অসাক্ষাৎকে সামলে নিতে অরুদি সময় নেবে মনে হয়েছে, তেমনি মনে হতে পারে এখন, বলাইবাবুর ব্যবহারে সামঞ্জস্য থাকলেও, অরুদির কথাবার্তায়, চোখের দৃষ্টিতে, ইঙ্গিত বা ইশারায় এইটাই যেন সুবোধ্য হয়ে উঠেছে যে সহজ ও স্বাভাবিক সম্পর্কের উর্ধ্বে অন্য কোন সম্পর্ক রচনায় অরুদি তৎপর।

উঁ। না দেখছি তোমার কীর্তিকলাপ, ফোটোখানার ওপর থেকে চোখ না তুলেই অন্যমনস্ক চিত্তে কথার উত্তর দিয়েছেন বলাইবাবু। ভেবেছেন আবার একটুকরো কিছু আসবে প্রশ্নের আকারে অরুদির কাছ থেকে। কিন্তু তা যখন এল না, ফোটোর ওপর থেকে চোখ তুলতেই দেখতে পেলেন অরুদির দৃষ্টি তাঁর দিকে একাগ্র। কী রকম মোহময় আর স্বপ্নাচ্ছন্ন দৃষ্টি। বলাইবাবু কেমন বিহ্বল হয়ে গিয়েছিলেন সেই দৃষ্টির মুখোমুখি দাঁড়িয়ে। এসময়ে নির্জনতা তো দূরের কথা সামান্য কয়েকটি মুহূর্তের স্তব্ধতাও যেন অনেক দূর ঠেলে দিতে পারে পরিবেশকে, এই ভেবেই যেন বলাইবাবু কথা বলার প্রয়োজন তীব্র অনুভব করেই প্রায় সঙ্গে সঙ্গে বলেছেন, ফোটোয় নিজেকে এভাবে আবিষ্কার না করলে কি কখনও বিশ্বাস করতে পারতুম, আমিও বাংলা ছবির হিরো হতে পারি? কী বলছ অরু, আমার নিজের ওপর শ্রদ্ধা বেড়ে গেল। এক মা ছাড়া আমার চেহারার তারিফ করার দ্বিতীয় লোক জীবনে জোটেনি—খবরের কাগজে মুখ ঢেকে বসেছিলেন বলাইবাবুর বন্ধু। বলাইবাবুর কথা শুনেছিলেন। এবার মুখের ওপর থেকে কাগজ

সরিয়ে কথা বলেছিলেন, কিন্তু জুটেও তো যায়, আর কখন জুটবে কেউ বলতে পারে না।

কথা শেষ করার পর অরুদির মুখের দিখে চোখ তুলেই চকিতে সরিয়ে নিয়েছেন, আবার আড়াল করেছেন হাতে ধরা কাগজের ওপাশে। শুক্লা লক্ষ্য করেছে, নিছক হাসি-ঠাট্টার লঘু কথাটার ভিত্তি কিন্তু এক স্থির বিশ্বাসের উপর। আর শুক্লার অনুমান যে আংশিক সত্যেরও অধিক তার প্রমাণও তো মিলল অল্প ক-টা দিন পরে। বলাইবাবুর বন্ধু যে কাণ্ডটা করে বসলেন! কিন্তু একটা জমাট বাঁধা কাহিনীর পরিসমাপ্তি সবাই যেমন ভেবে বসে আছে তেমন না ঘটে, এলোমেলো ওলোটপালোট হয়ে গেল! সবাই বুঝি সমস্যা খোঁজে এ ওর মুখ চাওয়া চাওয়ি করে।

বলাইবাবুর বন্ধু খবরের কাগজের আড়ালে মুখ নিয়ে গেলে, আবার বলাইবাবুর কণ্ঠস্বর শোনা যায়, আমার মনে ঠিক কী কথাটা আসছে বলব অরু? তোমাকে শুধু এক্স্পার্ট ক্যামেরাম্যান বলাটা ভুল হবে, ইউ আর এ্যান আর্টিস্ট, ট্রুলি। শিল্পীর চোখ না থাকলে, ইমাজিনেশন না-থাকলে কেউ এমন ব্যাক্গ্রাউণ্ড বেছে দিতে পারে! আকাশের রঙ আর মাটির রঙ পর্যন্ত ধরা পড়ে তোমার ফোটোয়—

বলাইবাবুর বন্ধু কথাগুলোর প্রত্যেকটি স্বতন্ত্র ভাবে গ্রহণ করেছেন, বলাইবাবুর কণ্ঠের আবেগ অরুদির চিত্তে যে কম্পন তুলেছিল তার আন্দোলিত রেশ যেন তিনিও অনুভব না করে পারলেন না। অর্থাৎ বলাইবাবুর মন্তব্যের সততা তাঁর মনেরই সততার কথা বই কি। সন্দেহ করার কিছু মাত্র মেলে না বলাইবাবুর অনুরাগজড়ান কণ্ঠস্বরে।

ওই একটা যা ভুল করেছি না জীবনে, বলাইবাবুর প্রায় নিরঙ্কুশ প্রশংসায় যেন বিহ্বল হয়েই জীবনের মস্ত একটা ভুলের কথা মনে পড়েছে অরুদির, আর মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়েছে মনের কথাটা। অরুদি মুখের চেহারায়, চোখের চাউনিতে বলাইবাবুর প্রতি তার স্বাভাবিক কৃতজ্ঞতা বোধের খবরটাই জানায়।

না আমি ভাবছি তুমিও শেষ কালে গতানুগতিক পথ বেছে নিলে, স্কুল, স্কুলের পর কলেজ আর তারপর বিয়ে আর সংসার, গড়িয়ে গড়িয়ে এসে থামলেন বলাইবাবু।

শুক্লা এখন অনেক কথা ভেবে অনেকদুর এগিয়ে যেতে পারে বলাইবাবুর কথার প্রকৃত অর্থ খুঁজে পেয়ে। অরুদি বলাইবাবুর শেষ কথাগুলো মনের মধ্যে কি অনেকবার উচ্চারণ করেনি ? শুক্লার তো তা-ই মনে হয় এখন। অরুদির কণ্ঠের স্তিমিত অনুচ্চধ্বনি এখনো কানে বাজে, করব কী বলুন, নিজের স্বাধীন ইচ্ছের ওপরও বাবা মা'র ইচ্ছে আছে। অবিশ্যি আমিও কোনদিন ভাবিনি ছবি আঁকার চর্চার কথা—

মনে হয় অরুদি বলতে চেয়েছে, আমার মধ্যে সাধারণের অতিরিক্ত যদি বাস্তবিক কিছু থেকে থাকে তা অনুসন্ধান ও আবিষ্কারের ক্রেডিট আপনার। অর্থাৎ কোন একটি বিশেষ গুণের অধিকারিণী তার মধ্যে সেই বিশেষ গুণটির আবিষ্কর্তার কাছে কৃতজ্ঞ না থেকে পারে না।

এ ভুলটা তো তোমার আমার একার নয়, এটা আমাদের জাতিগত। জন্মেছি কেরানী হব বলে, কে শিল্পী করবে বল। নইলে একজনের এক একটা আশ্চর্য গুণ তার বাড়ির কারো চোখে পড়ে না, এমন কি বাপ মা'রও। আসল কথাটা কি জান, ওই বিশেষ ক্ষমতাটাকে গলা টিপে মারবার জন্যে সবাই উঁচিয়ে আছে। যদি ছেলেটা বা মেয়েটা সোজা পথ ছেড়ে বাঁকা পথ ধরে বসে। আর সে হাঙ্গামা সামলাতে এদেশের ক'টা বাপ মা রাজি—বলাইবাবুর কণ্ঠের গাম্ভীর্যে, কথাবলার ঢঙে, আর বক্তব্যের নিষ্ঠুর সত্যে, নিজের অজ্ঞাতে কখন হিরো হয়ে উঠেছেন, নিজেই জানেন না। শুক্লার তো নিঃসংশয়ে তাই মনে পড়ে। আর বলাইবাবুর বন্ধু, তিনি তো অরুদিকে নায়িকার স্থলে বসিয়ে যা ঘটছিল তার সঙ্গে আরও যা কিছু ঘটতে পারে, তাই যোগ করে পর পর সাজিয়ে সুনিশ্চিত সমাপ্তির দিকে এগিয়ে ছিলেন। তাঁর কর্মপদ্ধতির মধ্যে নিজের অনড় বিশ্বাসকে এমন স্থান দিয়েছেন তিনি, যে আর অপেক্ষা করা বা বন্ধুর সঙ্গে পরামর্শ করার দরকার মনে করেন নি। বন্ধুর মনের ইচ্ছেটা সম্পূর্ণ তাঁর অধিগত, তাই আচমকা অবাক করার উদ্দেশ্যেই তিনি কাণ্ডটা করে বসেছেন।

গৌহাটি গেলেন বলাইবাবু। শুক্লাকে সঙ্গে যাওয়ার অনুরোধ জানিয়ে অরুদিও শিলং ত্যাগ করল। শুক্লার বৌদি যদিও একেবারে নিঃসংশয়

হতে পারেন নি, বলাইবাবু অরুদির এই নাতিদীর্ঘ যাত্রা অনতিবিলম্বে কোন স্থায়ী উপসংহার খুঁজে নেবে, তবু বিশ্বাস করেছেন, এই যুগ্ম অভিযানের উপান্তে আছে উভয়েরই একনিষ্ঠ পরিকল্পনা। বলাইবাবুর বন্ধু তাঁর সুহৃদকে জানেন, জানেন তাঁর মন কোন খাদে ওঠানামা করে। মন তার একবার বসে গেলে কিছু একটা না করে সে ছাড়বে না। অতএব তিনি নির্ভুলই ভাবতে পারেন অর্থাৎ এইবার বলাই পাকাপাকি একটা কিছু ঠিক করবার মন নিয়েই এগচ্ছে আর যথাশীঘ্র ঠিকও করে ফেলছে,—এই ভাবনার সঙ্গে সঙ্গেই রওনা দিয়েছেন বাংলা দেশের এক শান্ত, নিভৃত গ্রাম অভিমুখে। বলাইবাবুর মা'র সঙ্গে দেখা করার প্রবল বাসনায়। বলাইবাবুর বন্ধুর মতলব তারিফ করারই মত বটে। এদিকে বন্ধুকে, না জানিয়ে, কিছু না বলে কয়ে, সরাসরি চমক লাগাবেন, আর ওদিকে বলাইবাবুর মা'র সঙ্গে কথাবার্তা বলে, আলাপ আলোচনা করে বলাইবাবুর বর্তমান মানসিক অবস্থার কথা উল্লেখ করে, শেষে বলবেন অরুদি সত্যিই পছন্দ করার মতো মেয়ে। আর তা ছাড়া অরু তো তাঁর অনেক-দিনের জানাশুনো মেয়ে। বলাইবাবু তাঁর বন্ধুর সঙ্গে এ-ব্যাপারে আলাপের সবচেয়ে মূল্যবান তথ্যটি এমন করে এড়িয়ে গেছেন যে তাঁর চিন্তায় একবারও এ-কথাটা আসেনি যে কোন অসতর্ক মুহূর্তে তাঁর আর অরুদির ব্যবহারের ক্ষীণ সূত্রটুকু ধরে তাঁর বন্ধু একটা কাণ্ড করে বসতে পারেন।

খুব খুশি হয়েছেন বলাইবাবুর মা। স্বামীর ভিটেতে প্রতিপত্তি আর খাতির তাঁর যথেষ্টই, দুয়েকটি ছোট উদ্বাস্তু পরিবারকে আশ্রয় দিয়েছেন অনেকদিনের আমলের বাড়িতে, সে কারণে সাধারণের কাছ থেকে প্রশংসা প্রাপ্তি তাঁর কাছে বর্তমানে অধিক কিছু নয়। তবু খুশি হন কলকাতার শিক্ষিত সমাজের ছেলে মেয়েকে দেখলে, আর পরিচিত বিশেষ কেউ হলে তো আর কথাই নেই।

এস এস বাবা পরিমল, বলাইবাবুর মা হাত বাড়িয়ে ছোট্ট চামড়ার সুটকেসটা নিতে গিয়েছেন।

ছাড়ুন মাসিমা, যা ভাবছেন তা মোটেই নয়—অর্থাৎ চোখের দৃষ্টিতে আর হাতের ভঙ্গিতে বোঝালেন বেশ ভারি আছে, নিজেই নামিয়ে

রাখলেন। বলাইবাবুর মা হেসেছেন, প্রসারিত হাত দিয়ে সুট্‌কেসটা স্পর্শ করেছেন একবার, নামিয়ে রাখার সঙ্গে সঙ্গেই।

তোমাদের আক্কেল দেখে সব বলিহারি যাই। হুটপাট করে এসে উঠবে, এটা কি কলকাতা শহর? খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা কি করতে পারব; বলাইবাবুর মা থামলে আসল কথাটা বুঝতে পারলেন পরিমলবাবু।

তা হলে বুঝতে পারছি মাসিমা এণ্টারটেন্‌মেণ্টের প্রবলেম্‌টাই এখন আপনার কাছে মুখ্য। কিন্তু আমার কাছে যে গ্রেটার প্রবলেমের সংবাদ আছে, বলাইবাবুর মা কি বুঝলেন বা কতখানি বুঝলেন, এ সব চিন্তা না করেই তিনি তাঁর উপস্থিতির আসল কারণটা জানাতে চাইলেন বিশেষ ভূমিকা ব্যতিরেকে।

ওঁর কথা কতটুকু শুনেছেন তা বলাইবাবুর মা-ই জানেন, শুধু নিজের কথায় ফিরে গিয়ে বলেছেন, দেখলে বুকটা একটু হাল্কা হয়। বলাই তো চিঠি লিখেই খালাস—

আমি তো বলাইয়ের সঙ্গে দেখা করেই আসছি মাসিমা।

পরিমলবাবুর কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই খুব অবাক হয়েছেন বলাইবাবুর মা।

বলাইয়ের সঙ্গে তোমার দেখা হয়েছে তবে। যাক ভালই হল। বলাই তো সঙ্গে এলে পারত, দুটোদিন একসঙ্গে থেকে যেতে।

না, ও গৌহাটিতে কি কাজে যেন গেল (বার বার মনে পড়েছে নিশ্চয় সঙ্গে অরুদির যাওয়ার কথাটাও), আমি এসেছি ওরই ব্যাপারে। একটা দরকারি কথা ছিল আপনার সঙ্গে।

বলাইবাবুর মা আশ্চর্য হওয়ার ভঙ্গিতে তাকিয়ে ছিলেন সামান্য ক-টি মুহূর্ত, তারপর হয়তো ভেবেছেন কি আর দরকারি কথা হতে পারে, মুখে বলেছেন, আচ্ছা হবে এখন সব, তুমি এখন একটু চা-টা মুখে দাও দিকি।

দরকারি কথাটা অনেক রকম দরকারি কথার একটা, অর্থাৎ এমন দরকারি কথা সকাল সন্ধ্যা দুবেলা সংসারে শুনতে হয়, এইমাত্র ভেবেছেন বলাইবাবুর মা। তাই কিছু বলার আগে, একখানা বড় সাদা খাম থেকে

যখন পরিমলবাবু অরুদির ফোটোখানা বার করতে যাচ্ছেন তখনও বলাইবাবুর মা'র একবার মনে হয়নি তাঁকে প্রায় হতবাক করে দেবার জন্যেই এই অতি বিস্ময়কর খবর নিয়ে ব্যস্ত দুতের মত পরিমলবাবুর নিশ্চুপ আগমন। ভাবতেই পারেননি বলাইবাবুর মা এই সংবাদকে ভিত্তি করে তাঁকে একটি পুরনো পরিবারের সঙ্গে তাঁর স্নিগ্ধ আলাপ পরিচয়ের সব সম্পর্ক ভেঙে ফেলতে হবে। আর দ্বিতীয় কোন বিবেচনায় না-গিয়ে। পরিমলবাবু বেশি সময় নেননি খাম থেকে ফোটোখানা বার করতে। বলাইবাবুর মা নিশ্চয় একটা কৌতূহল মনে মনে অস্বীকার করতে পারেন নি। তাকিয়ে ছিলেন তাই উদ্‌গ্রীব হয়ে সমানে। পরিমলবাবু ফোটোখানা বার করে বলাইবাবুর মা'র হাতে তুলে দিয়ে বলেছেন, দেখুন তো মাসিমা, মেয়েটি আপনার চেনাশুনোর মধ্যে পড়ে কিনা ?

তাঁর হাত থেকে ফোটোখানা নিয়ে বলাইবাবুর মা তাকিয়ে ছিলেন ফোটোখানার ওপর চোখ রেখে তা বেশ কিছুক্ষণ বই কি। তাঁর দৃষ্টিতে চিনেও চিনতে না-পারার অসুবিধা কিন্তু পরিমলবাবুর চোখ এড়ায়নি।

এ যে অরুর ছবি!—বলাইবাবুর মা'র কণ্ঠের যথারীতি বিস্ময় বলাইবাবুর বন্ধু লক্ষ্য করলেন, আর অনুমান করলেন বলাইবাবুর মা'র কণ্ঠের স্বাভাবিক বিস্ময় অতি স্বাভাবিক কথাটাই অনুক্ত রাখলে—অর্থাৎ একে তুমি দেখলে কোথায়, জানলে কি করে, কোথায় বা পেলে এর ছবি ?

হ্যাঁ, বলাইয়ের তো বেশ মনে ধরেছে, খুব পছন্দ। আমার তো মনে হয় ওদের বিয়েটা হলে—

বিনা প্রতিবাদে ধৈর্যসহ নীরবে প্রতিটি কথা শুনেছেন বলাইবাবুর মা যা যা বলবার ছিল পরিমলবাবুর। নিজে থেকে একটি কথাও আগে বলেননি। অসীম উৎসাহে প্রাণের কথা বলে গেছেন বলাইবাবুর বন্ধু। বন্ধুকে সংসারী দেখার ইচ্ছেটা তাঁর যথার্থই। আর তার বৈবাহিক ব্যাপারে সক্রিয় অংশ নেওয়ার দায়িত্ব তাঁরও কিছু কম নয়। সে কারণে বলাইবাবুর মা'র সঙ্গে বসে কথাবার্তা কয়ে তাঁর মতামত জেনে একটা পাকাপাকি বন্দোবস্তে আসবার জন্যে তিনি বিশেষ তৎপর হয়ে উঠেছিলেন। অবশেষে বলাইবাবু অরুদির পরস্পরকে ভাললাগা ও পছন্দ করার এক ও

অদ্বিতীয় প্রমাণ স্বরূপ বার করে দেখিয়েছেন অরুদির ক্যামেরায় অরুদিরই তোলা বলাইবাবুর একাধিক ফোটো বিভিন্ন ভঙ্গিতে, বলেছেন, সত্যিই মেয়েটা গুণী, যাই বলুন মাসিমা। রূপের সঙ্গে গুণের দেখাটাও মেয়েদের ক্ষেত্রে কিন্তু বেশি মেলে না, এটা অস্বীকার করবার উপায় নেই আপনার।

কিছুই অস্বীকার করেন নি বলাইবাবুর মা। তারিফও করেছেন অরুদির তোলা ফোটোর। কিন্তু আশ্চর্য হয়েছেন বলাইয়ের মত হল কি করে। জিজ্ঞাসা করছেন খুব অবাক হয়ে, বলাই তোমাকে নিজে মুখে বলেছে ?

মুখে বলার আর দরকারি বা কি ? আর ও তো কম লাজুক নয়। আপনার মত হয়ে গেলেই—আর ওকেও আমি একটু চমকে দেব। ও কি জানে মনে করেছেন নাকি, ওর এ-ব্যাপারে আমি আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছি।

বলাইবাবুর মা'র মুখ দেখে এবার যেন মনে হয়েছিল পরিমলবাবুর, তিনি কিছুটা আশ্বস্ত হয়েছেন। তাঁর নিজের বিশ্বাসই ঠিক, আর সেই বিশ্বাসের জোরেই বলেছেন, না, না তুমি সব জান না বাবা। বলাই তো সেদিনও বলেছে, বিয়ে ও করবে না তা তো নয়, আমি যেখানে ঠিক করব সেখানেই ও করবে—

পরিমলবাবু এরপরে বুঝতে পারলেন তিনি রহস্যের সব কিছু কেন, কিছুই জানেন না। যখন তাঁর কথা বলার পালা এল, একে একে সব কথাই সবিস্তারে বলেছেন বলাইবাবুর মা।

বলছিলুম কি বাবা বলায়ের ইচ্ছে হলে সত্যি সত্যিই আমার না করার কি আছে। কিন্তু বলাই তো নিজেই করবে না।

কেন মাসিমা ? পরিমলবাবুর কণ্ঠের অত্যধিক বিস্ময় কিন্তু একেবারেই অস্বাভাবিক নয়। কারণটা তো খুবই সহজ। যেভাবে অরুদি বলাইবাবুর সঙ্গে গৌহাটি যাত্রা করলে তাতে শুক্লা, শুক্লার বৌদি যেমন বেকুব বনেছেন, তেমনি নিঃসংশয়ের অধিক কিছু হয়েছেন পরিমলবাবু।

তুমি বলাইকে একটিবার সব জিজ্ঞাসা করলেই জানতে পারতে বাবা। আমি তো মা, ছেলের মন আমার চেয়ে আর বেশি জানবে কে বল ?

বড় অভিমানী ও—বলাইবাবুর মা'র কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কেমন বিব্রতবোধ করতে শুরু করলেন বলাইবাবুর বন্ধু। কি কথা যে এরপর জিজ্ঞাসা করবেন, কোন প্রসঙ্গে যাবেন, সবকিছু গুলিয়ে গেল। কোথা থেকে কি কাণ্ডটা ঘটিয়ে বসলেন তিনি। বাস্তবিক কি করেই বা বুঝবেন তিনি অরুদি বলাইবাবুর সাম্প্রতিক ব্যবহার থেকে যে বলাইবাবু এমন দক্ষ অভিনেতা হয়ে উঠেছেন। শুধু ভেবেছেন সব ব্যবস্থা পাকাপাকি করে অবাক করে দেবেন বন্ধুকে। শুধু অবাকই নয় এমন কলে ফেলবেন বন্ধুকে যে এবার তার পালাবার পথ থাকবে না। সারা জীবন শুধু মেয়েই দেখে যাবে? পছন্দ করার সময় আর হয়ে উঠল না জীবনে। বলাই কি জীবনে কেবল উচ্চাশারই স্বপ্নে মশগুল হয়ে থাকবে, যথেষ্ট তো পেয়েছে, আর কবেই বা বিয়ের কথা ভাববে। বেশি বয়সে বিয়ে করারও তো একটা সীমা আছে। এই সব ভেবেই বলাইবাবুর বন্ধু আর কালক্ষেপ করেন নি।

আজকে বলাইকে এমনটা দেখছ, চিরকালতো বলাই এমন ছিল না। আজ যেমন বলায়ের মনের খবর রাখছি তখনও তো রেখেছি বাবা, বলাইবাবুর মা বলেছেন কথাগুলো খুব ছেড়ে ছেড়ে আস্তে আস্তে, আর পরিমলবাবুর শুধু মনে হয়েছে তাঁর মস্ত একটা ভুলের সংশোধন করছেন। কথা শেষ করে অন্যমনস্ক হয়ে যেই চুপ করেছেন বলাইবাবুর মা, থেমে থেকেছেন ক-টি ক্ষণ, পরিমলবাবু 'হ্যাঁ, তারপর মাসিমা', বারবার আগ্রহের সঙ্গে এই বলে তাঁকে আবার নিজের অসম্পূর্ণ কথায় ফিরিয়ে এনেছেন।

এই অরুকে দেখছ, তখন এই অরুর জন্যেই ওর বিয়ের ব্যবস্থা করতে পারি নি। ছেলের মুখ থেকেও তো কথাটা একবার শোনা দরকার বাবা। বলাই হয়ত সব মুখ ফুটে বলত না, তবু আমি কি সব বুঝতে পারতুম না সবই বুঝতুম। ওর কাছ থেকে স্পষ্ট কিছু জানতে পারলুম না, তাইতেই তো একটি মেয়ের সঙ্গে ওর বিয়ের প্রায় ঠিকঠাক করেও কিছু করতে পারলুম না, বেশ মনে ধরেছিল আমার মেয়েটিকে, নিজের বয়সের স্বাভাবিক ধর্মানুযায়ী বলাইবাবুর মা কথাগুলো বলার অবকাশ পেয়ে যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন।

আচ্ছা মাসিমা, এই মেয়েটির বলাইকে অপছন্দ করার কি কারণ?

বাঁ হাতে ধরা অরুদির ফোটোখানার ওপর ডান হাতের কটি আঙুল দিয়ে মৃদু শব্দ তুলে প্রশ্ন করেছেন পরিমলবাবু।

পছন্দ অপছন্দ কার কি কেমন তা তো বলা চলে না বাবা। তবে ও মেয়ের রূপের তো বড় গর্ব ছিল। আর বলায়ের চেহারাটাই বা কি এমন বল? তা ছাড়া বলাই তখন মাইনে পেত কি?

কথা শেষ করে বলাইবাবুর মা এমন করে তাকিয়ে থেকেছেন শ্রোতার দিকে যে ভাবটা এ-ই—এইত ব্যাপার বাবা, সোজা কথায় দাঁড়ায় এই, এইবার বুঝে দেখ। পরিমলবাবুর মনে হয়েছিল যেন ঠিক হিসেব মিলিয়ে তাঁকে এক কাহিনীর অবধারিত উপসংহারে পৌঁছে দিল কেউ।

ব্যাপারটা এইবার সহজ, জলের মত, তরল হল বলাইবাবুর বন্ধুর কাছে। চোখের সামনে এসে দাঁড়াল অনেক আগেকার বলাইবাবুর চেহারাটা। একটি মেয়েকে ভালবেসে কেমন হিমসিম খাচ্ছেন বলাইবাবু, অপরাধীর মত চেহারা হয়ে উঠেছে তাঁর। আর মেয়েটি এমন একটি মেয়ে যার রূপের গর্বের কাছে, আর্থিক স্বাচ্ছল্যের অহংকারের কাছে বার বার নিজেকে বিপন্ন, অসহায় মনে করছেন বলাইবাবু। কোথায় ছিল বলাইবাবুর আজকের এই আত্মসচেতনতা, দৃঢ় আত্মপ্রত্যয় আর কঠের ব্যক্তিত্বময় গাম্ভীর্য। মনে পড়েছে তাঁর কেমন করে তাঁর বন্ধু অরুদির সঙ্গে কথা বলতে বলতে বার বার ভাগ্যের কথা পেড়েছেন, নিজের কপালে আঙুলের টোকা মেরে দেখিয়েছেন।

বলাইবাবুর অতীত নিয়ে যখন বলাইবাবুর বন্ধু বিলাপ করেছেন, তখন অরুদির বর্তমান ভেবে হৃদয় তাঁর এতটুকু আর্দ্র হয় নি। মনের কাথায় বিজয়োল্লাসের গর্ব অনুভব করে অসীম তৃপ্তি পেয়েছেন। বলাইবাবুর এই জয় তো শুধু তাঁর একার জয় নয়, পরিমলবাবুর মত অনেক পোড়-খাওয়া মধ্যবিত্তের মনের জ্বালা-জুড়ানর আনন্দ। অরুদির ধৃষ্টতার জন্যে এক মুহূর্তও ক্ষমা করতে পারেন নি তিনি অরুদিকে। বার বার ভেবেছেন, এই পুরস্কারই প্রাপ্য ছিল মেয়েটির। মনের ভাবনা মুখের কথা হয়েই গলা দিয়ে বেরিয়েছে, মার খেয়ে মার ফিরিয়ে দেয়ার সুযোগ আমাদের জীবনে বড় একটা আসে না। বলাই সে সুযোগ পেয়েছে,

আরও ফিরিয়ে দিয়েছে। ওর বন্ধু বলেই এতে খুশি না হয়ে পারছি না মাসিমা।

বলাইবাবুর মা পরিমলবাবুর ওপর তাঁর কথার প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করেছেন।

অরুদির ব্যবহারের নির্লজ্জ বেহায়াপনা যেন অতর্কিতে চতুর্গুণ প্রকট হয়ে ধরা পড়ল বলাইবাবুর বন্ধুর চোখে। শূন্যে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে কত কথাই বুঝি একে একে মনে করবার চেষ্টা করলেন তিনি। অস্ফুট গুঞ্জনে তিরস্কার করলেন যেন অরুদির সেই বেহায়াপনাকে। মুখ দিয়ে খালি উচ্চারণ করলেন, না না মাসিমা, বলেন কি, ভদ্রলোকের মেয়ে, কী কাণ্ডটাই যে করে বেড়াচ্ছে। চোখে না দেখলে বিশ্বাসই করতে পারবেন না।

ও মেয়ে বরাবরই ও রকম বাবা। তুমি দেখোনি—ভীষণ হুজুগে আর চঞ্চল।

—না মাসিমা, বলেন কি, তাহলেও বয়েস বলে তো একটা জিনিস আছে। আপনি সোজা লিখে দিন ওদের বাড়িতে। আর দরকার হলে আমার কথাও লিখতে পারেন। সচক্ষে দেখেছি সব, চোখ বুঁজে তো আর থাকি নি।

এই আসল কথাটা বলেই তাঁর যা কিছু বলার ছিল তা শেষ করেছেন পরিমলবাবু। আর পরিমলবাবুর কথামতোই বলাইবাবুর মা চিঠি দিয়েছেন অরুদি শ্বেতাদির মাকে। ভেবেছেন উত্তর পাবেন, না-পেয়ে আবার লিখেছেন।

আর এদিকে পরিমলবাবু শিলং-এ ফেরার পথে ভাবতে ভাবতে গেছেন, আশ্চর্য এই সংসার, না হলে যাকে প্রেমের বিরল ও নিটোল উপাখ্যান ছাড়া আর কিছু মনে হয় না তা অন্তঃসারশূন্য প্রেমের অভিনয় মাত্র। কিছুতেই ভুলতে পারেন না তিনি, ছবি তোলবার জন্যে অরুদির জায়গা খুঁজে বেড়ান আর অরুদির সব উৎসাহের মূলে ছিল একটি লোক, তাঁর বন্ধু, বলাইবাবু। বলাইবাবুর মা যা যা বলেছেন তা শুনে তিনি নিজের ভুল সংশোধন করেছেন, সর্বক্ষণ মনে হয়েছে তাঁর প্রতিটি পদক্ষেপে ভুল করেছেন। আবার ফিরে প্রশ্ন করেছেন নিজেকে;

মানুষ নিজের দেখা, নিজের জানাকে তবে এমন করে উড়িয়ে দিতে বাধ্য হয় ?

শুক্লা, শুক্লার বৌদিকে বলার কিছুমাত্র বাকি রাখেন নি বলাইবাবুর বন্ধু। শুক্লার কাছ থেকে এক টুকরো চিঠি পেয়েছে শ্বেতাদি। খুব সামান্য দু চারটে কথায় সান্ত্বনার সুর। অরুদিকে এখান থেকে নিয়ে যাওয়ার জন্যে কোন কৌশল অবলম্বন করতে লিখেছে। কারণ অরুদির বিশ্বাস বলাইবাবু হয়তো এবার এখানেই, আভাস ইঙ্গিত ছেড়ে স্পষ্ট কিছু বলে যাবেন। কিন্তু অরুদি একেবারেই বোঝে না যে বলাইবাবুর সঙ্গে তার আদৌ (কবে বা কোথাও) দেখা হওয়ার কোন সম্ভাবনা মাত্র নেই।

শ্বেতাদির মুখ থেকে সব শুনেছে যখন, ছোড়দি শ্বেতাদির দৃষ্টির অতলে নেমে গেছে। কী যে হচ্ছে শ্বেতাদির মনে। একমাত্র সশরীরে উপস্থিত থেকে শ্বেতাদির চোখের দিকে তাকিয়ে না-থাকলে কেউ ব্যাপারটার গুরুত্ব সামান্য কিছুও আঁচ করতে পারত না। অরুদির সব লজ্জা শ্বেতাদির সমস্ত মুখে দুঃসহ অপমানের অসংখ্য দাগের মত চোখে পড়ে যেন। ছোড়দির হাত ধরে বলেছে শ্বেতাদি, কি লিখলে সব চেয়ে ভাল হয় বলত পারুল। মা বলছে, হঠাৎ সব কিছু খুলে লিখলে যদি একটা অঘটন ঘটিয়ে বসে দিদি, কিচ্ছু বিশ্বাস নেই ও মেয়েকে—

—দাঁড়া, তাড়াহুড়ো করে তো লাভ হবে না কিছু। ভেবে চিন্তে করাটাই ভাল, কথাগুলো বলার শেষে লজ্জা পেয়েছে ছোড়দি। কাকে সে বুদ্ধি দিচ্ছে, এই কথাটা ভেবে।

শ্বেতাদি বুদ্ধি চেয়েছে ছোড়দির কাছে, আর ছোড়দি সব কথা মা'র সঙ্গে খোলাখুলি আলাপ করেছে, বুদ্ধি চেয়েছে তার কাছে। কখন এমন করে অরুদির কথা ভাবতে হয়নি তাকে, কখন যে ভাবতে হতে পারে জীবনে তাও ভাবেনি। সহানুভূতি আর অনুকম্পা মিশ্রিত একটা ভাবই তার চেতনাকে আচ্ছন্ন করে থাকে। এত অহঙ্কার আর আস্ফালন যে অরুদির তার এই ব্যর্থতা, এই নিদারুণ পরাজয় কিন্তু তাকেও বিচলিত না করে পারেনি। যে অরুদির কথা জীবনে কতবার সে যথার্থ গভীর ভাবে চিন্তা করেছে প্রায় এক আঙুলে গুনে বলতে পারে, সেই অরুদির কথাই যে তাকে এই সহানুভূতি ও নিষ্ঠার সঙ্গে ভেবে দেখতে হবে কে

জানত বাস্তবিক। তাই কিছুতেই পরিমলবাবুর মত একটা তীব্র পরিহাসের আনন্দে আপ্লুত হতে পারল না। অরুদির অপমানেও কষ্ট পেতে পারে, এই অনুভব আর উপলব্ধি জীবনে তার প্রথম।

ছোড়দিকে তাই প্রাণ খুলে বলে ও যা ভাবতে পারে সত্যি সত্যিই অরুদির ব্যাপারে, আমার মনে হয় কি জানিস, মাসিমা বা অঞ্জন হঠাৎ খুব অসুস্থ হয়ে পড়েছে এ-রকম একটা টেলিগ্রাম পাঠিয়ে আগে অরুদিকে নিয়ে আসা। তারপর খুব খোলাখুলি ভাবে সব ব্যাপারটা নিয়ে ওর সঙ্গে কথা বলা। এ-ছাড়া আমার মাথায় তো কিছু আসছে না। আর শ্বেতাদিকে বল, মাসিমার হয়ে গুছিয়ে বেশ ভাল করে একখানা চিঠি বলাইবাবুর মাকে লিখে দিতে। অঞ্জনকে গোঁয়ার্তুমি করতে বারণ কর। ওতে এখন কি ফল হবে।

—মাসিমা কিংবা শ্বেতার ভয়টা তুই ঠিক বুঝতে পারছিস না, ছোড়দি ওর মুখের দিকে চেয়ে থাকে, শুধু এইটুকু বলে। পরে ওকে নীরব থাকতে দেখে ফের বলে, হঠাৎ যদি না বলে কয়ে কোথাও চলে যায়, সব জানতে পেরে—

অরুদির জন্যে ছোড়দির আশঙ্কাটাও নেহাৎ কম নয়। কি বলছে ছোড়দি? তার মানে অরুদি নিরুদ্দেশ হয়ে যাবে? অরুদির বাবা বিজ্ঞাপন দেবেন কাগজের কলমে, যেখানে নিরুদ্দেশ লেখা আছে তার নিচে? কি লিখবেন? অরু, তুমি যেখানেই থাক শীঘ্র চলে এস। কিছু চিন্তা কর না। তোমার মা শয্যাশায়ী। ইতি তোমার বাবা। অর্থাৎ যে বিজ্ঞাপন কাগজে দেখে দেখে চোখ অভ্যস্ত, সেই বিজ্ঞাপনই একদিন সকাল বেলা চোখে ধাঁধা লাগাবে।

॥ ৭ ॥

কটা দিন ক্যাজুয়াল্ লিভ নেবার পর অফিসে আসার সময় খালি মনে হয় এতদিন যা করেছি সব ভুলে গেছি বোধ হয়। সামান্য কয়েকটা দিনের অনুপস্থিতি একেবারে অন্য মেজাজের মানুষ করে তুলেছে। অফিসের এই যত রাজ্যের করেস্‌পণ্ডেন্‌স ডিল করার বিরাট দায়িত্বের বহুলাংশ যে তার মত কর্তব্যনিষ্ঠ ব্যক্তির কাঁধে এ কথাটা অফিস কর্মকর্তারা আর কত ভাল করে বোঝাবেন তাকে। যখন একটানা ঘাড় হেঁট করে মুখ বুজে কাজ করে যায়, তখন ক্যালেণ্ডারে সপ্তাহ মাস হিসেব করে দেখার কোন ফুরসৎ থাকে না। সে তবু এক রকম ভাল। ইচ্ছা অনিচ্ছা, ভাল-লাগা, এ সব কিছু ভুলে গিয়ে কাজের মধ্যে নিমগ্ন থাকো অফিসের কাজ তুলে দাও। অফিসের ছুটি ছাটা সে একেবারে বরদাস্ত করতে পারে না। কয়েকটা দিন পরপর ছুটি থাকলে তাই সে রীতিমত বিপাকে পড়ে যায়। যেন অনেকদিনের তৈরী-করা একটা অভ্যাস কয়েকটি দিনের ছুটির বিশ্রামের অবসরে কখন এক ফাঁকে অন্তর্হিত হয়েছে। আর সেই পুরনো অভ্যাসের বশে পরিচালিত হওয়ার ক্ষমতা যেন লোপ পেয়েছে কোন অজ্ঞাতে। দীর্ঘ অবকাশের পর ছেলেবেলার সেই স্কুল খোলার দিনগুলোর কথাই বেশি করে মনে পড়ে। সমস্ত পড়া ভুলে যাওয়ার ভয়। আর এখানকার ভয়টা আরো বিপজ্জনক। কাজে মন জোর করে বসাতেই হবে, বসতে না-চাইলেও। এই দশটা পাঁচটা অফিসের সঙ্গে বাঁচার অস্তিত্ব যে গিঁটে বাঁধা, তা তো ঝুলন্ত অবস্থায় বাসের ফুটবোর্ডে দাঁড়ানো থেকে নির্দিষ্ট সময়েরও অতিরিক্ত পার করে অফিসের দরজা পেরোনো—এর প্রতিটি সজাগ মুহূর্তই মনে করিয়ে দিচ্ছে। ভালই বরং অফিসে যে বেশি ছুটিছাটার ব্যবস্থা নেই এতে তার কোন অনুযোগ নেই। ও এই যুক্তি দিয়েই বোঝাতে চায় শিবরতনবাবুকে, যাই বলুন স্যার, মাঝখান থেকে এই

দুচারটে দিনের ছুটি কি করে জানেন, কাজ করার ইচ্ছেটাকে একেবারে পঙ্গু করে দেয়।

ওর মনের আসল বেদনার রূপটা কিন্তু প্রবীণ শিবরতনবাবুর কাছে প্রচ্ছন্ন থাকে না। যদিও মনের একান্ত অভীপ্সাকে সম্পূর্ণ আড়াল করে ও কথা বলে শিবরতনবাবুর সঙ্গে। শিবরতনবাবুর মুখ দেখে অনুমানও করতে পারে শিবরতনবাবুর মানবিক অনুভূতির সবগুলোই এখন মরে যায় নি। তাঁর কথায় আরো পরিষ্কার হয় তার মনের যথার্থ ইচ্ছেটা। তার অন্তরের বাসনা একটা গোটা মূর্তি পায় শিবরতনবাবুর কথায়, কি জানো হে বাবাজী, মেজাজটাই তোমার অন্য জাতের, আমি সবাইকেই তো দেখছি এখানে। না, তোমার বয়সী ছেলে আর এখানে নেই? কি বল, কথা বলছ না যে, এম, এ পরীক্ষাটা দিয়ে স্রেফ কেটে পড়ো এখান থেকে। এখানে তোমাদের মত শিক্ষিত মন টেঁকে?

না না, ওটা কি বলছেন, আমার চেয়ে কম শিক্ষিত এখানে কে আছে। আপনার লেখাপড়া কি কিছু কম? ও প্রতিবাদ করে।

না হে না, ও লেখাপড়ার কথা আমি বলছি না। শিক্ষিত মন তুমি কাকে বলবে? বোঝাতে পার একটা লোক যে ভাবতে পারে, চিন্তা করতে পারে। অধীত বিদ্যার ব্যবহার যে জানে, বুঝতে পেরেছো? কোথায় পাবে তুমি সে রকম শিক্ষিত লোক এখানে। মনটাই নিজের মধ্যে নেই—তো অন্য কথা।

ও নিজের কথার একটি শব্দ মাত্র উচ্চারণ করার সময় পায়, শিবরতনবাবু ওকে থামিয়ে দিয়ে কথার তোড়ে ফের ডুবে যান, দাঁতের ওপর নিচ চারপাশ থেকে পানের চর্বিত অংশ জিবের ওপর মুখের মাঝখানে জড় করে বলেন, আমার কথা বলছ? আমি বাবাজী পুরনো মন নিয়ে পুরনো অফিসেই টেঁকে থাকব। আর কোথায় যাব এখন বলতে পার? কোথায় যাব? এই অফিসের গেট পেরোলেই যা দেখব দুচোখে সব নতুন। ভাবলেই ভয় করে। আমি তো ভাবতেই পারি না।

আপনার কথা মানছি। তবু আরেক দিকটাও তো—

এবারেও ওর কথা সম্পূর্ণ হয় না। ওর হাতের ওপর নিজের মোটা

ভারি আঙুলের চাপ দিয়ে শিবরতনবাবু বলেন, দেখ বাবাজী তর্ক করার সময় আমার নেই। ওটা এখন থাক। তবে যা বললুম, একেবারে বেদবাক্য। একটা এম. এ টেমে দিয়ে—আর শেষ না-করে একটা তুড়ি মেরে উর্ধ্বে শূন্যে হাত তুলে যা দেখালেন তাতে তাঁর কথাটাই আরেক বার কানে বাজে, স্রেফ কেটে পড়ো।

বুক পকেট থেকে চেনে-বাঁধা ছোট্ট মোটা গোল ঘড়িটা বার করেই চোখ দুটো বড়ো করেন, ব্যস্ত হয়ে ওর টেবিলের ওপর রাখা, ঢাকা কাঁচের গ্লাসের জলের দিকে হাত বাড়াতে যান, বলেন তোমার জলটা একটু নিচ্ছি বাবাজী—

হ্যাঁ হ্যাঁ খান, ও নিজেই হাত বাড়িয়ে কাঁচের গ্লাসটা এগিয়ে দেয় শিবরতনবাবুর দিকে। ঝকঝকে কাঁচের গ্লাসের তলায় জলের অবশিষ্টাংশ কাঁপতে থাকে। শিবরতনবাবু যখন কথা বলছিলেন ও মাঝে মাঝে তাকিয়ে থেকেছে জলভরা কাঁচের গ্লাসটার দিকে। আশ্চর্য পরিষ্কার স্বচ্ছ আর উজ্জ্বল দেখাচ্ছিল জলটাকে গ্লাসের মধ্যে। জলছাড়া গ্লাস আগের মতো সুন্দর মনে হয় না। ওর তেষ্টা না পেলেও গ্লাসে জল ভরে রাখার ইচ্ছায় বিনোদকে ডাকে, বলে, কুঁজো থেকে পরিষ্কার এক গ্লাস জল গড়িয়ে আনতো।

বিনোদ জল গড়িয়ে আনলে আগেকার মতো ঢাকা দিয়ে রেখে দেয় টেবিলের ওপর। তাকিয়ে থাকে ও ভাললাগার নেশায় প্রায় একদৃষ্টে জলের গ্লাসটার দিকে। নাক দিয়ে নিশ্বাস নেয় টেনে টেনে। শিবরতন-বাবুর গায়ের ঘামের গন্ধ, গোঁপের আগায় লেগে-থাকা কড়া নস্যির গন্ধ তার টেবিলের চারপাশে যেন বাষ্পাকারে ছড়িয়ে থাকে। হঠাৎ যদি চোখ বোঁজে তো মনে হওয়া অসম্ভব কিছু নয় যে শিবরতনবাবু তার মুখোমুখি এখন বসে আছেন সামনে। সমস্ত অফিসে শিবরতনবাবুই একটি মাত্র লোক যার কথায় ও স্মৃতির কথারই প্রতিধ্বনি শুনেছে। কতবার স্মৃতি ওকে বলেছে, কেন এম. এ-টা দিতে দোষ কি, ডিগ্রিরও একটা দাম আছে তো, সুযোগ থাকলে নিয়ে নেয়া উচিত। অন্তত স্মৃতির ব্যাপার হলে স্মৃতি নিজে তা-ই করত।

অনেক দিন যখন সন্ধ্যা পার করে দিয়ে মাথা হেঁট করে ঘাড় গুঁজে

টেবিলের ওপর ঝুঁকে পড়ে লেটার ড্রাফট করেছে তখন দেখেছে বিনোদ কখন একটা একটা করে অনেকগুলো আলো টেবিলের মাথার ওপর জ্বেলে দিয়েছে। কানের কাছে স্মৃতির কণ্ঠস্বর কী রকম উদ্দীপনা আর উৎসাহের মত বেজেছে। আর ভেবে অস্থির হয়েছে শুধু, আজ আর স্মৃতির সঙ্গে দেখা করার কোন সম্ভাবনা নেই। নিজের বন্দী অসহায় অবস্থার কথা যত ভেবেছে তত ক্ষেপে উঠেছে স্মৃতির বিরুদ্ধে। স্মৃতির সব উৎসাহ আর উদ্দীপনার কথা মনে হয়েছে সান্ত্বনার আর করুণার সুরের মত। অফিস থেকে বেরুবার পর মস্ত রাস্তায় চলমান ব্যস্ত জনতা আর গাড়িঘোড়ার ভিড়ে বার বার উপলব্ধি করেছে এত বড় ব্যস্ত কলহমুখর শহরে একটি মেয়ে, স্মৃতিরেখার মত একটি মেয়ে, তার মত বিশেষ একজনের কথা ভাবে, এর চেয়ে বেশি তৃপ্তিকর চিন্তা আর কি আছে। নিজের ভুল নিজেই ভাবতে পেরেছে, এই ভেবেই খুশি হয়েছে।

আর এই একমাত্র শিবরতনবাবুই, যাঁর কথায় ও স্মৃতির উৎসাহ, উদ্দীপনার সুর খুঁজে পেয়েছে এই এত বড় অফিসটায়। কথা শেষ করে শিবরতনবাবু চলে যাওয়ার মুখে আবার কখন কখন ফিরে এসেছেন। এখন আর আপাতত ফিরছেন না। ও দেখল শিবরতনবাবু তার দিকে পিছন করে নিজের চেয়ারে বসে ফাইলের স্তূপে দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছেন।

অরুদির কথা মন থেকে তাড়াতে পারছে না কিছুতেই। মনের অস্বাভাবিক চাঞ্চল্যকে বাইরের কপট গাম্ভীর্য দিয়ে ঢাকবার জন্যে ও অনেক সময় সিগারেটের সাহায্য নেয়। কথা না-বলে হঠাৎ চুপ করে থাকলে অনেক সময় নিজেকে অন্যের চোখে অস্বাভাবিক ঠেকছে মনে হতে পারে। অথচ একটা সিগারেট ধরিয়ে আস্তে আস্তে ধোঁয়া ছাড়ার মুহূর্তগুলিতে নিজের নীরবতাকে অপরের চোখে স্বাভাবিক, নিতান্ত সহজ করে তোলা সম্ভব। যতক্ষণ সিগারেটটা পুড়বে, একান্ত নীরবে মনে মনে কোন জটিল চিন্তাকে ভেঙে ভেঙে টুকরো টুকরো করে দেখা অসম্ভব কিছু নয়। বাইরের লোকের চোখে নিজেকে স্বাভাবিক প্রতীয়মান করার উদ্দেশে সিগারেট ধরানো তার কাছে অনেকটা ছদ্মবেশের সাহায্য নেওয়া।

বাইরের চওড়া বারান্দায় ও বেরিয়ে আসে। ও-পাশে লিফট। ক্রমাগত ওঠানামা করছে। সে লিফট-ম্যানের দিকে একবার তাকাতেই

লোকটি নামান লিফট আবার ওপরে তুলে আনে। ভাবে বুঝি ও নামবে। ও মাথা নেড়ে জানায়, এখন নামবে না। লোকটা বলা ঠিক হবে না, ছেলেটা। কিছুদিন হল ও কাজে লেগেছে। খুব চালাক চতুর। ওর আগে যে ছিল সে খুব পুরনো লোক। লম্বা ছুটি নিয়ে দেশে গেছে জনার্দন। যাবার সময় ওর কথা খুব করে বলে গেছে কি যেন নাম ছোকবার। মনে রাখার চেষ্টা করেও পারেনি। খুব কথা শোনে ওর। নামাবার সময় বিশেষ করে অফিসের বাইরের সাধারণ বেশভূষার লোকেদের একটু অবহেলা করে, অর্থাৎ তুলতে রাজি নয়, এই মনোভাব। এরই মধ্যে একদিন স্মৃতি হঠাৎ যখন সরাসরি তার সঙ্গে অফিসে দেখা করতে আসে, তখন ও অবাক হয়েছিল যে স্মৃতি তারই সঙ্গে দেখা করতে এসেছে। লিফটের সামনে, নামবার আগের কয়েকটি মুহূর্ত, স্মৃতিরেখা যখন তার সঙ্গে দাঁড়িয়ে ছিল, তখন প্রায় মুগ্ধ দৃষ্টিতে ও তাকিয়েছিল স্মৃতির দিকে। আর স্মৃতি চলে যাবার পরই বিশেষ সম্ভ্রমের চোখে তাকে দেখতে শুরু করেছে। এটা যেন ওর কাছে একটা নতুন কিছু আবিষ্কারের মত। এ-অফিসে ওর মত সামান্য কর্মচারীর (নিদেন পক্ষে ছোট একটা অফিসারও নয়) সঙ্গে স্মৃতির মত মেয়ের, যার রূপের জৌলুস, চেহারার মার্জিত ভাব যে-কোন অন্যমনস্ক পথচারীরও দৃষ্টি আকর্ষণ করে, দেখা করতে আসা ওই ছোকরার কাছে প্রায় অবিশ্বাস্য কিছু। ওর মনে হয়েছে জনার্দনের কথায় যত না কাজ হয়েছে তারও বেশি কাজ হয়েছে স্মৃতির এই আগমনে। কিংবা জনার্দনের কথার জোর প্রমাণ পেয়েছে স্মৃতির সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ আলাপ-পরিচয়ের নিদর্শনে। স্মৃতিরেখার মত অসামান্য মেয়েকে নিয়ে যে ঘুরতে পারে, সে লোকটা কি ভাল রকম বখসিস্ দিতে পারে না?

ছোকরার নাম মাঝে মাঝে যদিও বা মনে করতে পারে, স্থায়ীভাবে মনে রাখতে পারে না কিছুতেই। একেক সময় জেদ চেপে যায়। মনে করতেই। কত নাম পর পর আসে আর চলে যায়। তবু কি আশ্চর্য, কিছুতেই ছেলেটার নাম মনে আনতে পারে না।

একটা সিগারেট ধরায়। মোটা নক্সাকাটা লোহার রেলিং-এর ওপর একটা পা-তুলে নিচের দিকে তাকায়। শিবরতনবাবুর একটা কথা মনে করে আপনার মনে হাসে। শিবরতনবাবু হাসতে হাসতে একটা কথা

প্রায়ই বলেন, বাস করি কোথায় হে দেখতে হবে তো, একেবারে সপ্তম স্বর্গে। মনের মধ্যে ঘুরপাক খায় একটা অস্বস্তি। কেমন একটা জেদের মত পেয়ে বসে। কেন নামটা মনে আসে না ছেলেটার। মাঝে মাঝে অন্যমনস্ক হয়ে তাকায় ওধারে ব্রেবোর্ন রোডের দিকে। ও রাস্তাটা পেরিয়েই ও-পাশে বড়বাজারের হৈ হৈ আর নিরন্তর কর্মব্যস্ততা। ঠেলা গাড়িতে, লোকের মাথায়, লড়িতে, ট্রাকে ঠাসা বোঝাই মাল আর মাল। ওই একটি জায়গা মানুষের ব্যবসা বাণিজ্যের জগতে অমর হয়ে থাকবে, কেন-বেচা কোন দিন শেষ হবে না ওখানে। তা না হয় হল। বড়বাজারের প্রতি এই বিতৃষ্ণা কি তার কোন দিন যাবার নয়। কিন্তু কিছুতেই যে মনে পড়ছে না নামটা।

চোখ পড়ল আবার লিফটের দিকে। ওপরে উঠে আসছে লিফটটা। লিফটের বাইরের গোঙনি ভেতরের কোলাহল এতক্ষণ শোনা যায়নি। সপ্তমস্বর্গে এসে লিফটের দরজা খুলতেই দেখে অনাথ। বেশ চটা-চটা ভাব অনাথের। তাকে পেয়ে গেছে অনাথ। এবার যেন গলায় জোর আরও বেশি পায়। তার দিকে চেয়ে লিফটের ওই ছোকরাকে দেখিয়ে অনাথ বলে, কি আক্কেল লোকটার। বোতাম টিপছি তো টিপছিই এক ঘণ্টা ধরে। কই বাবা জনার্দন থাকতে তো আমাদের একটি বেলাও গণ্ডগোল হয়নি। যত হাঙ্গামা কি এই বক্তিয়ার এসে—

অনাথের সব অসুবিধের কথা এক মুহূর্তে ভেসে যায়। তার রাগকরা চটে-ওঠা সব তুচ্ছ হয়ে যায়, কানে লেগে থাকে বক্তিয়ার। অনাথ ওর কাছ থেকে অনেক কিছু আশা করছে, অনাথের মুখ দেখলেই টের পাওয়া যায়। ও অনাথের একটা হাতে চেপে ধরে বলে, বাঁচালি অনাথ, কিছুতেই ছোকরার নাম মনে করতে পারছিলুম না—বক্তিয়ার

মনের মধ্যে দুচারবার আওড়ায়—বক্তিয়ার, বক্তিয়ার। যদি আবার এক্ষুণি ভুলে যায়। অনাথের মুখ দেখে মনে হয় ওর কথায় অনাথ মনে করছে ও তার সঙ্গে ঠাট্টা ছাড়া কিছু করতে চাইছে না। তার এ ঠাট্টায় অনাথ যেন অপমানিত বোধ করছে নিজেকে। অনাথের এই সাময়িক অসুবিধে আর তার এই সাময়িক অস্বস্তি দুটোই যে সমান মূল্যের এটা কিন্তু অনাথকে শত চেষ্টা করেও বোঝান যাবে না।

এমন কি ঠিক এ মুহূর্তে মনে হয় তার অস্বস্তিটা অনাথের সামান্য একটু দেরি হওয়ার অসুবিধের চেয়ে অনেক বড়।

অনাথ ওর মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে যে রকম ঝাঁঝাল গলায় বলে, তাতে মনে হয় তার ওপর রাগটাও বুঝি অনাথের কিছু কম নয়, মনের আর দোষ কি। যা নাম একখানা, বক্তিয়ার—

কথা বলা শেষ করেই অনাথ দুহাতে ওর পাঞ্জাবির পাশের পকেটদুটো চেপে ধরে। অনাথের পাঁচ আঙুলে পকেট হাতড়ান দেখেই ও বুঝতে পারে সিগারেটের প্যাকেটটা একবার হাতের মুঠোর মধ্যে আনতে চায় অনাথ। ও অনাথের দুমুঠি থেকে পকেট দুটোকে মুক্ত করে। পরে সিগারেটের প্যাকেট থেকে একটা সিগারেট বার করে অনাথের হাতে দেয়। অনাথ ঠোঁটের ফাঁকে শক্ত করে চেপে পকেট থেকে দেশলাই বার করে সিগারেট ধরায়। তারপর বাঁ হাতে ঠোঁট থেকে সিগারেট সরিয়ে এক মুখ ধোঁয়া হুস্ করে ছাড়ে, ডান হাতে প্যাণ্টালুনের পকেটে দেশলাই ঢুকিয়ে রাখতে রাখতে বলে, ওটি বাবা নেভার মিশিং। সিগারেট থাক আর না থাক দেশলাই? অলোয়েজ রেডি। (দেশলাই ছাড়া দশটিই থাক কি বিশটিই থাক, একটিও ধরবে?) আর দড়ি থেকে সিগারেট ধরান লক্ষ্য করেছেন। দুয়েকটা বাবু-মার্কা লোককে দেখবেন, এই বুঝি শালা কেউ দেখে ফেলল। মাইরি। জাত যায় আর কি।

ইতিমধ্যে অনাথ আরেকবার ধোঁয়া ছাড়ে। তারপর বলে, পকেটের ওপর থেকে দেশালায়ের বাক্সে চাপ দিয়ে, সিগারেট না-থাক দেশলাই রেডি। অনাথকে সিগারেট না-দিয়ে উপায় আছে?

শিবরতনবাবু যখন ওর টেবিলে এসে কথা বলছিলেন, তখন ও লক্ষ্য করেছে, দূর থেকে তারকবাবু নিজের ফাইল থেকে মাথা তুলে তুলে শিবরতনবাবু আর ওকে কেমন খুঁটিয়ে দেখছেন। সেই তারকবাবু এইবার ফাঁক পেয়ে বেরিয়ে এসেছেন। কখন এসে অনাথের কাঁধে হাত চেপে বলেছেন, এমনি করে আর কতদিন চালাবে ভায়া?

সাধারণত বয়স্ক কর্মচারীদের সামনে সিগারেট খেতনা অনাথ প্রথম প্রথম অফিসে ঢোকার পর। এখন রাত্তিরে কলেজ করে পড়ে।

বয়স্কদের অনেকটা খাতির করে চলত, মাস্টারমশায়দের মত। আস্তে সে সব অভ্যেস ক্রমে চলে গেছে। এখানে সিগারেট খাওয়াটা, এমন কি বেশ বয়স্কদের সামনেও, ডাল ভাত খাওয়ার মত। তাই তারকবাবুর হস্তস্পর্শে সে বিন্দুমাত্র চমকায় না। আর তারকবাবুর মুখের কথা? ওতে অপ্রস্তুত হওয়ার কিছু নেই। শিবরতনবাবুর যেমন 'সপ্তমস্বর্গ', তেমনি তারকবাবুর 'কত দিন চালাবে'।

তারকবাবু এবার তাকে বলেন, আপনি কি সত্যিই আর টেবিলে ফিরছেন না?

মানে?

মানে আর কি, ঘড়িটা দেখলেই বুঝবেন।

ও তাড়াতাড়ি ঘড়িটার দিকে একবার চোখ নামায়। বলে, না এই সিগারেটটা পুড়িয়েই যাব।

না, আমি কি মানে করছিলুম সত্যি জানেন?

কি?

ওই শিবরতনদার কথায় বুঝি সত্যি আর ফিরছেন না। আপনার কানে কি মন্তর চালছে বুঝি না কিছু—

ও হেসে ফেলে। বলে, আপনি শুনলেন কোথেকে?

আরে সব না হলেও কিছু তো কানে যায়। আর শোনবারই বা দরকার কি। হাত মুখ নাড়া দেখেই তো বুঝতে পারি। আজ না হয় শুনিনি। আগে তো শুনেছি, আর কথাটাত সেই পুরনো।

বনমালিকে হাতে ফাইলের স্তূপ নিয়ে পাশ দিয়ে যেতে দেখে একটু হেলে বনমালির মুখের কাছে কান সরিয়ে এনে, একটু খাট গলায় জিজ্ঞাসা করেন, সায়েব কোথায় হে?

বনমালির কাছ থেকে বড় ছোট সব খবর একেবারে খাঁটি পাওয়া যায়। বলে, পোর্ট কমিশনারে—সব ওইখানে, পি. এ., সেক্রেটারি সব।

সব? তাই বল, না হলে এমন জমে—তারকবাবু সবায়ের গা-ঝাড়া দেয়া ভাবখানার কারণ এতক্ষণে খুঁজে পান।

—হ্যাঁ যে কথা বলছিলুম, চলুন না ক্যান্টিনটাও একবার সেরে আসা যাক।

ও আপত্তি করে না, অনাথের দিকে তাকায়। অনাথ ওকে অনুসরণ করে। সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে তারকবাবু ওর কাঁধে হাত রাখেন। কাঁধে হাত রাখলে ও কেমন অস্বস্তি বোধ করে, তা ছাড়া অপছন্দও করে। কাঁধটা উঁচু নিচু করে, পিঠটা বেঁকায়, তবু হাত সরান না তারকবাবু। নামতে নামতে বলেন, যা বলছিলুম—ওই শিবরতনের কথায় মাথাটা বিগড়োবেন না ভাই। এই অফিসে সারাটা জীবন শুধু লেক্‌চার মেরে গেল। আরে বাবা তুমি ছাড়নি কেন? ও সব লেক্‌চার ছেড়ে দিন, আজ একটা চাকরি ছাড়লে আরেকটা চাকরির কোন গ্যারান্টি আছে মশায়। বলে তো খালাস, খবরদার মাথাটা বিগড়োবেন না। পাশ করা ছেলে কি বলছেন, মেয়ে নেই? কটা চান?

না, লোকটা কিন্তু জানে, যাই বলুন, অনাথ বাধা দিয়ে বলে, আমায় খুব হেল্‌প করেছেন।

জানে কি কেউ কম—

না না, কি বলছেন? সংস্কৃত খুব পড়া আছে।

আরে ওরকম সংস্কৃতর নলেজ অনেক দেখা আছে।

আপনি বললেই হবে। আমি নিজে পরীক্ষার আগে দেখিয়ে নিয়েছি। কটা লোক কালিদাস মুখস্থ বলতে পারে মশাই, অনাথের মুখ থেকে যখন তখন মশাই রেরোয় না। বেরুলে বুঝতে হবে অনাথ চটেছে। তখন আর অনাথের কাছে বয়সের খাতির নেই।

পারে তো আমার মাথা একেবারে কেনা গেছে।

না, লোকে আর মাথা পেল না আপনার মাথা কিনবে।

এ-কথার পিঠে ঠিক কথা খুঁজে পান না তারকবাবু সময় মত। শুধু আত্মসম্মানে ঘা লাগায় ধমকের সুরে চেঁচিয়ে ওঠেন, তোমার বয়স কত হে ছোকরা?

একেবারে মোক্ষম বয়সের প্রশ্নে আসাই বুদ্ধির কাজ মনে করেন। অনাথ একবার সত্যি রাগ করার চান্স পেলে সহজে দমে না। সোজাসুজি বলে বসে, মনের বয়েস আপনার থেকে অনেক বেশি—

এবার বাধ্য হয়েই ওকে থামাতে হয় অনাথকে। বেশ জোর ধমক দিয়ে বলে, কী হচ্ছে কি এটা অনাথ ?

অনাথ ক্ষীণ প্রতিবাদের মত কি তুলতে চায়। ও থামিয়ে দিয়ে বলে, না থামবে কিনা তুমি ? সমস্ত অফিসে এরকম মান্য অনাথ বড় একটা কাউকে করে না। এটা ওর পক্ষে বেশ একটা গর্বের কথা কি রকম সম্ভ্রমের চোখে যেন ওকে দেখে অনাথ। তারকবাবুও অবাক বনে যান। এতে খুশি হওয়ার চেয়ে সম্মান ক্ষুণ্ণ হওয়ার ভাব বেশি ফুটে ওঠে ওর মুখে। ক্যান্টিনের দরজা পর্যন্ত আর পেঁ ।ছতে পারেন না তিনি। কথা কাটিয়ে নিয়ে সরে যান।

এটা ভাল করলে না অনাথ, একটু বিষণ্ণ কণ্ঠেই বলে।

খারাপটা কি করেছি ? শিবরতনবাবু আপনাকে খাতির করবেন না করবেন ওঁকে। গায়ের জ্বালা কোথায় বোঝেন না ? শিবরতনবাবু সারা অফিসে আর লোক চিনতে পারেন না ; কি জানেটা ও শিবরতনবাবুর ? এসে পর্যন্ত দেখছি মাইনের স্কেল নিয়ে আর ইনক্রিমেণ্ট নিয়ে মাথা খারাপ হয়ে গেল। অনাথের কথায় মনে পড়ে শিবরতনবাবুর কথা আবার। ওকেই একদিন বলেছেন ডেকে শিবরতনবাবু, আচ্ছা স্কেল ম্যানিয়াক্ লোক তোমাদের ওই তারকবাবু।

ক্যান্টিনের কোলাহলে কিন্তু তারকবাবুর এই কিছুক্ষণ আগের কণ্ঠস্বরও একেবারে ডুবে যায় মন থেকে কখন অলক্ষ্যে সরে গিয়ে। দুটো চেয়ার টেনে এনে দুকাপ চায়ের জন্মে দুখানা কুপোন বাচ্চা ছেলেটার হাতে দিয়ে, পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেটটা বার করে। ওকে সিগারেট বার করতে দেখে অনাথ চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়, বাধা দিয়ে বলে, না না আমি সিগারেট আনছি এবার। আপনার ওপর অত্যাচার করা হবে।

সত্যিই অনাথ চেয়ার ছেড়ে উঠে বাইরে যায় সিগারেটের জন্মে। ও একবার হাত বাড়িয়ে বাধা দিতে গিয়েও পারে না।

চেয়ারটাকে সোজা করে সামনের দিকে টেবিলের গায়ে এগিয়ে নিয়ে আসার সময় ঘাড় তুলে মাথাটা একটু উঁচু করেছে আর দেখে ওদিক থেকে চায়ের কাপ হাতে নিয়ে তাদের টেবিলের দিকে এগিয়ে আসছে দীনেন।

দীনেনের চেহারাটার দিকে একটি বার চোখ পড়তেই কিসের আতঙ্ক, আশঙ্কা তার সমস্ত মনের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। তাড়াতাড়ি সে ভাবটাকে চাপা দিয়ে, মুখে শুধু জিজ্ঞাসা করে, কী খবর দীনেন।

টেবিলের ওপর চায়ের কাপ নামিয়ে রাখতে রাখতে দীনেন বলে, তিন দিন খুঁজে গেছি আপনাকে।

তিন দিন। আমি তো ভাই ক্যাজুয়াল লিভ নিয়েছিলুম কটা দিন।

তাই বলুন। ভাবলুম ক্যান্টিন্ই বেস্ট জায়গা। দেখা হলে এখানেই হবে, কাঁধ-ছেঁড়া সার্টের গোটান হাত আরও ওপরে টানতে টানতে দীনেন বলে। আর দীনেনের কথায় আবার মনে পড়বে শিবরতনবাবুর কথাই, দেখ হে ক্যান্টিনের মত সাম্যবাদী জায়গা আর নেই। তুমি চা খাচ্ছ, তোমার পাশে এসে বসল ডেসপ্যাচ ক্লার্ক বসন্ত দাস, আর ধর কিছুক্ষণের মধ্যে বসন্ত দাসের মুখোমুখি টেবিলে বসল প্রায় অফিসার, ওই তোমার এ্যাকাউণ্টসের মিঃ টি, পি, রয়। তারপর যেই সেভ্ন্থ হেভ্নে এসে পৌঁছলে, দেখলে তোমার বেসিক নব্বই, আর আমার এতকাল পরে পঁচিশ বছর ইন্ক্রিমেণ্ট নিয়ে একশো আটাত্তর টাকা, পুরো আশিও নয়।

তা কি খবর তোমার ?

খবর তো আপনার কাছে, কি জানাবেন বললেন। আমার নতুন ঠিকানাও নিয়ে নিলেন

ঠিকানাটা কি বল তো ?—আশ্চর্য হওয়ার মত ও জিজ্ঞাসা করে।

দীনেনের মুখ দেখে মনে হয় ঠিকানা হারিয়ে-ফেলা আশ্চর্য কিছুই নয়। দীনেন কি ভাবছে ঠিকানা হারিয়ে ফেলেছে বলেই ও কোন সুযোগ আসা সত্ত্বেও জানাতে পারেনি কিছু দীনেনকে। যাক, এতেও তবু কিছু আশা করতে পারে দীনেন। দীনেনের মুখে কিন্তু পরিষ্কার তারই আভাস।

লিখে নিন না ঠিকানাটা, তাড়াতাড়ি ব্যস্ত হয়ে বলে দীনেন।

হ্যাঁ হ্যাঁ বল তো ঠিকানাটা, মুখে একটা অস্ফুট আওয়াজ করে ও বলে, আমি যে কোথায় ফেললুম। হারায়নি, যাবে আর কোথায়।

এইট্টিন্ বাই ওয়ান এ হরি বসাক স্ট্রীট, দীনেন বলে তাকিয়ে থাকে ওর

ব্যস্ত ভঙ্গির দিকে। তাড়াতাড়ি পকেট থেকে ব্যাগটা বার করে ও কিসের একটা ছোট্ট ক্যাশমেমো তুলে নেয় দু আঙুলে, তারপর কলম বার করে লিখতে থাকে বেশ দ্রুত।

দীনেন ওর দ্রুত লেখার দিকে স্থির নজর রেখে আরেক বার বলে যায় ঠিকানাটা, ওয়ান এ (শেষের দিকে একটু জোর দিয়ে) হরি বসাক স্ট্রীট, শেষ কালে বলে, হারাবেন না যেন আবার। মাথা নিচু করে ও লেখা ঠিকানার ওপর কিছুক্ষণ চোখ রাখে, দীনেনের কথায় একটু শুকনো হাসে, বলে, না না হারাবে কোথায়, তবে ভালই হল দেখা হয়ে তোমার সঙ্গে।

অনাথ সিগারেট নিয়ে ফিরে আসে, দেরি দেখে ও বলে, আজও গেছিস কালও গেছিস।

বলছেন তো বেশ, আসতে যেতে কতবার থেমেছি আর দাঁড়িয়েছি জানেন? এর সিনেমার টিকিট কেটে রাখো, ওর খেলার টিকিট জোগাড় করে দাও যেখান থেকে পার, তার—অ্যাপ্লিকেশনের কি খবর, ঝঞ্ঝাটের একশেষ, বলতে বলতে অনাথ একটা সিগারেট বাড়িয়ে দেয় ওর দিকে। তারপর দীনেনের দিকে চেয়ে বলে, ওঁর সিগারেট? আচ্ছা, আপনি নিন—অনাথের অসুবিধে লক্ষ্য করে তাড়াতাড়ি নিজের প্যাকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেটটা বার করে অনাথের হাতে তুলে দেয়, বলে, আমার সিগারেট না খেয়ে তোর উপায় আছে।

তা যা বলেছেন, হাসতে হাসতে দীনেনের দিকে তাকিয়ে প্যাকেটটা থেকে একটা সিগারেট বার করে অনাথ।

যার কথা তোকে প্রায়ই বলি অনাথ, এই সেই দীনেন, দীনেন চৌধুরি, ও দীনেনকে দেখিয়ে বলে অনাথকে। তারপর অনাথের দিকে মুখ ফিরিয়ে বলে, আর এই যে একে দেখছ দীনেন, এ হচ্ছে আমাদের অফিসের অনাথবন্ধু দত্ত। বর্তমানে আমার রাইটহ্যাণ্ড।

তা বলতে পারেন, অনাথ বলে দীনেনের দিকে তাকিয়ে।

আপনি কতদিন হল ঢুকেছেন? প্রশ্ন করে দীনেন।

এই তো তোমার চাকরি যাওয়ার মাস কয়েক পরে, অনাথের উত্তরটা ও-ই দেয়, দীনেনের প্রশ্নের মধ্যে যে বেদনা লুকোন থাকে তা অনাথ

ধরতে পারবে না, কিন্তু সে হৃদয়ঙ্গম করেছে। অনাথের মুখ দেখেও অনুমান করতে পারে শুধু, অনাথ বিচলিত হয়েছে সংবাদটায়।

আপনার কথা অনেক শুনেছি অনিন্দ্যদার মুখে, কেমন সহানুভূতি জড়ান গলায় বলে অনাথ দীনেনকে উদ্দেশ্য করে।

জানিস অনাথ, আমি ক্যাজুয়াল্ লিভ নিয়ে বসে আছি আর ও বেচারা দু-তিন দিন এসে ফিরে গেছে।

মধ্যে একদিন ফোনও করেছিলুম। আপনাকে পাইনি, কোথায় বেরিয়েছিলেন।

ও! তাই নাকি? মনে মনে ভাবে, তবে সেদিন দীনেনই ফোন করেছে। স্মৃতির ফোন মনে করে ও ধরেনি। কালীকৃষ্ণবাবু ডেকে পাঠিয়েছেন ওকে বিনোদকে দিয়ে, ওর ফোন এসেছে এই বলে। স্মৃতির ফোন ছাড়া আর কারও হতে পারে না। এই বিশ্বাসে ও যাচ্ছি ধরছি করেও যায়নি। ছুতো করে কাটিয়ে দিয়েছে। কালীকৃষ্ণবাবু জেনেছেন একটি মেয়ে ওকে মাঝে মাঝে ফোন করে। এই নিয়ে বার দুই তিন ঠাট্টা করারও চেষ্টা করেছেন। সেদিন বলেছেন, বেশ জমেছে মনে হচ্ছে। তাঁর বদ্ধমূল ধারণা, এখন থেকে ওই বিশেষ মেয়েটি ছাড়া কেউ তাকে ফোন করবে না।

জানিস অনাথ পৌনে পাঁচটা পর্যন্তও ও জানত ওর চাকরি আছে, ওর কণ্ঠের সমবেদনায় অনাথের দু চোখের দৃষ্টির থেকে ও স্বীকৃতি পায়।

পৌনে পাঁচটা কি বলছেন, পাঁচটা বাজবার চার মিনিট আগেও জানতুম না, দীনেনের কণ্ঠের আর্তিতে এইটাই প্রকাশ পায় যে চাকরি হারানর ক্ষতটা কোনদিন বুঝি দীনেনের মনের মধ্যে নিরাময় হয়ে উঠবে না। কিছুতেই কি ভুলতে পারছে না দীনেন তার জীবনের সেই সর্বনেশে অপরাহ্ণের কথা। অনাথের চোখে পূর্ণ সমবেদনার মৌন ভাষা পড়তে পেরে আরও বেশি উৎসাহ নিয়ে যেন দীনেন বলেছে, আমাদের মত লোকেদের স্যাক্ করে কি যে লাভ হয় এদের, বলতে পারেন? রিট্রেঞ্চমেন্ট নোটিশ সার্ভ করার পরও নাকি আবার অ্যাপয়েন্টমেন্ট দেবার ঠিক হল। নেয়াও হবে নাকি তিনজনকে। আমাকেও নাম

উঠল। বাদের না বলেও চলত তাদের হয়ে গেল। আমার সবচেয়ে বেশি দরকার ছিল কিনা, আমারই হল না। বেশ বুঝতে পারা যায়...বলতে বলতে শেষের দিকে গলা ধরে যায় দীনেনের। নিতান্ত মেয়ে নয় বলেই চোখ দিয়ে জল ফেলতে পারে না। না হলে হয়ত বা ফেলত।

আবার কি একটা ভেবে নিয়ে শুরু করে দীনেন। ওর জীবনের চির চলমান দুঃখ কষ্টের অনন্ত অধ্যায়, ও কি এখন শেষ কথাটি পর্যন্ত খুলে ধরবে? দীনেন বুড়ো আঙুল আর তর্জনীর বক্রাকৃত ফাঁক দিয়ে সিগারেটের কিয়দংশ কায়দা করে ধরে, জোরে টান মেরে, ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বলে, এক নাম-করা লোকের চিঠি নিয়ে গিয়েছিলুম কর্পোরেশনে খোদ কর্তার সঙ্গে দেখা করতে। খালি বড় বড় কথায় কাটিয়ে দেবার চেষ্টা, জানেন? কত টাকাই বা মাইনে পাবে এখানে, অন্য জায়গায় এর চেয়ে অনেক বেশি মাইনে দেবে। আর তা ছাড়া হি ইজ দি লাস্ট পার্সন টুবি ইনফ্লুয়েনজড্ বাই দি প্রেসিডেন্ট অব দি রিপাব্লিক। আমি শুধু বললুম, রাস্তায় বেরিয়ে তো দেখি দরজা বন্ধ, একটা দরজা একটু খুলে দিন না। যার কাছ থেকে চিঠি এনেছিলুম তিনি হাসতে হাসতে বললেন, প্রেসিডেন্ট অব দি রিপাবলিক না হোক, ইনফ্লুয়েনজড্ বাই ইয়োর ওয়াইফ্ এ্যাট লিস্ট্; তাঁর কাছ থেকে কি চেষ্টা করলে একখানা চিঠি জোগাড় করা যায় না। আসল কথাটা জানেন, আমার দেড়শো টাকার চাকরির জন্যে তো তাঁর ভারি ঘুম হল না, তাঁর চিঠির অমর্যাদা হল, এইটাই তাঁর বেশি লেগেছে। মাঝখান থেকে শুধু রাজায় রাজায় যুদ্ধ হল।

থামল দীনেন। ও কি আবার কিছু বলতে আরম্ভ করবে নাকি? না; আপাতত দীনেনের কথা ফুরিয়েছে। ও ঘন ঘন সিগারেটে টান দিতে দিতে ছোট করে আনে সিগারেটটা। ওর কথার সূত্র ধরে তেড়ে ফুঁড়ে ওঠে জগন্নাথ, ওখানে আপনার কাজ হবে বটে। মোটা টাকা ঘুষ দিতে হবে। একবার ঘুষ দিয়ে শুধু ঢুকবেন, ব্যস্, তারপর সারা জীবনে ঘুষ নিয়ে যাবেন—সিগারেটে একটা শেষ টান দিয়ে অবশিষ্টাংশটুকু পায়ের চাপে জুতোর নিচে পিষে দিতে দিতে ফের বলে, একবার কি কারে যেন বেরিয়ে এখানে। খিঁচি নিয়ে ওপারে উঠছি। আমার আগে আগে এক

ভদ্রলোক উঠছেন। তা বয়েস মন্দ হয়নি। ভদ্রলোকের পকেট থেকে পয়সা পড়ে গেছে। শব্দটা আমিও শুনেছি। সিঁড়ি দিয়ে গড়িয়ে নিচে কোথাও পড়েছে মনে হল। জিজ্ঞাসা করলুম ভদ্রতার খাতিরেই, কী পড়ল।

কি জানি মশাই। ভদ্রলোক চোখ নিচু করে সিঁড়ির দুপাশে দেখতে দেখতে উঠলেন। আমি বললুম, সিঁড়ির নিচেই কোথাও পড়েছে বোধ হয়। উত্তরে ভদ্রলোক কি বললেন জানেন ?

আরে মশাই, আপনিও চিনেছেন আচ্ছা জায়গা! এখানে ইট-কাঠ চুন-সুরকিরও হাত পা চোখ আছে জানেন। চোখ দিয়ে দেখে, আর হাত বাড়িয়ে তুলে নেয়; বুঝলেন কিছু? ভদ্দরলোকের কথা আমি কিছুতেই ভুলতে পারিনি। একেবারে খাঁটি কথা।

অনাথের গল্পে ও না-হেসে পারে না। দীনেনও একটু শুকনো হাসে।

আর ইণ্টারভিউয়ের কথা যদি বলেন তো ওটা একেবারে বাজে। খালি একটা ফার্স, কথা বলার সময় প্রায় যেন অন্যমনস্কে ওর সিগারেটের প্যাকেটটা থেকে একটা সিগারেট বার করে দীনেন। তারপর হঠাৎই বুঝি খেয়াল হয় তার, সে সিগারেট বার করছে। ব্যস্ত হয়ে বলে, একটা সিগারেট নিচ্ছি অনিন্দ্যদা

আরে নাও নাও, আরেকটু ঠেলে দেয় প্যাকেটটা টেবিলের ওপর।

ফার্স ছাড়া আর কি? কিচ্ছু হয় না, ভেতর থেকে লোক ঠিক করা থাকে, খালি আই-ওয়াশ। ইণ্টারভিউয়ের কথাই যদি উঠল ও নিজের একটা সাম্প্রতিক অভিজ্ঞতার কথা না-বলে পারছে না। গল্পটা অনাথকে অনেকবার শুনিয়েছে, আবার অনাথেরই অনুরোধে আর অনেককে। ও চালটা ছাড়তে চায় না, আগে অনাথের দিকে তাকায়, বলে, আমার রিসেণ্ট এক্সপিরিয়েন্সের কথাটা অনাথ? বলব দীনেনকে।

বলবেন না মানে? দীনেনবাবুর জানা দরকার, খুব বেশি উৎসাহী দেখায় অনাথকে।

কী ব্যাপার অনিন্দ্য দা? অনাথের উৎসাহে অনুপ্রাণিত দেখায় দীনেনকে।

আমি এক জায়গায় ইণ্টারভিউ দিয়েছিলুম, জান না বুঝি, এই

রিসেণ্টলি। তোমার সঙ্গে অনেক দিন দেখা সাক্ষাৎ নেই তো। শুনলে তোমার মাথার ঠিক থাকবে না।

সত্যিই-তাই, আপনি ফায়ার হয়ে যাবেন, ওর কথা সমর্থন করে গম্ভীর চালে মাথা নাড়ে অনাথ।

ও আরম্ভ করে, হাজির হয়েছি এগারোটার সময় আর ডাক পড়ল তিনটেয়। ক্ষিদের চোটে নাড়ি ছিঁড়ে যাচ্ছে। আচ্ছা খেয়াল-খুশি বাবুদের। ঢুকলুম তো ভেতরে। একখানা চেয়ার দেখিয়ে বসতে বললে। নমস্কার-টমস্কার কিচ্ছু করিনি। লম্বা টিংটিঙে, টিয়াপাখির মত নাক, এক ভদ্রলোক এক চেয়ারে, আর ওপাশের দিকে গদি আঁটা চেয়ারে শ্বেতভালুকের মত প্রায় তিন মন ওজনের এক ভদ্রলোক। বসবার সঙ্গে সঙ্গেই লম্বা মত ভদ্রলোক আমার অ্যাপ্লিকেশনখানা বার করে সোজা জিজ্ঞেস করে কি জান?—এটা আপনার হাতের লেখা? মেজাজ এমনিতেই খারাপ হয়েছিল, আরও চড়ে গেল, সোজা বলে বসলুম, কেন আপনার সন্দেহ হচ্ছে?

দীনেনের মুখ দেখে মনে হল ওর কাছে বেশ ইণ্টারেস্টিং লাগছে ব্যাপারটা। ঘাড় সোজা করে তারিফ করার ভঙ্গিতে বলে, আচ্ছা —তারপর?

আমার কথায় মনে হল একটু ঘাবড়ে গেছে ভদ্রলোক। বললে, লিখুন তো এখানে দেখে দেখে, এ্যাপ্লিকেশনখানা সামনে রেখে একখানা সাদা কাগজ বার করে দিল।

আমার কাগজখানা দেখেছেন? ঠিক ওই রকম দামি বিলিতি কাগজ দিন, স্রেফ্ বলে ফেললুম রোখের মাথায়।

আচ্ছা থাক, কেমন একটু অপ্রস্তুত হয়ে ভদ্রলোক চেয়ারের পিঠে হেলে পড়লেন। মনে হল আমার হাবভাবে কিসের ইঙ্গিত ছিল বেশ ধরতে পেরেছেন। অর্থাৎ চাকরি আমার না-পেলেও চলবে। আর আমারও কেমন একটা বেপরোয়া ভাব এসে গেল, বুঝলে?

খুব বুঝতে পারছি। মাথা নেড়ে দীনেন বলে, আর অনাথের মৃদু হাসিতে দীনেনের কথারই পুরো সমর্থন।

তারপর টেবিলের ওপর মস্ত লম্বা একটি পেন্সিল ঠুকতে ঠুকতে বললে,

ইকনমিক্স ছিল নাকি ? জিজ্ঞাসা করার ভঙ্গিতে আর উচ্চারণের কায়দায় মনে হল কলেজের সিনিয়র-প্রফেসর কেন, স্বয়ং ফিনান্স মিনিস্টার নিজেও বোধ হয় অমন কায়দা দেখাতে পারতেন না।

দীনেন আর অনাথ দুজনেই ওর কথায় হেসে ওঠে। অনাথের উচ্চ হাসি দীনেনের হাসিকে প্রায় চাপা দেয়। ওদের হাসিতে ওকে সামান্য কটি মুহূর্ত থেমে থাকতে হয়।

মনে তো হয়, বললুম একটু অবজ্ঞার মত করে।

দুয়েকটা জবাব দিতে পারবেন ?

পারব কিনা বলতে পারি না, চেষ্টা করতে পারি ; তবে হ্যাঁ, আপনার কোয়ান্টিটি থিয়োরি অফ মনি বাদ দিয়ে, কারণ ওটা বাদ দিয়েই পাস করেছিলুম

ফরেন্ ট্রেড সম্পর্কে কিছু ?

না, ট্রেডের সব ব্যাপারটাই আমার কাছে বরাবরই ফরেন্।

প্রশ্ন কর্তা এবার সত্যিই বুঝলেন আমি চাকরির জন্যে আসিনি, ফাজলামি করতে গেছি। ওপাশের চেয়ারের শ্বেতভালুক এতক্ষণ চুপ করে সব শুনছিলেন। রাগেন নি মনে হয় রাগলে ব্লাডপ্রেসার বাড়বে এই ভয়ে। এবার মিহি গলায় বললেন, কোন কলেজে পড়তেন ?

আমি একই বেপরোয়া ভঙ্গিতে টেবিলের ওপর এ্যাপ্লিকেশনের কাগজখানা দেখিয়ে দিয়ে বললুম, ওই কাগজখানায় সব লেখা আছে।

কত প্রশ্ন করবি কর। সব উত্তর জানা আছে। অর্থাৎ পেয়েছ মুঠোর মধ্যে ছাইভস্ম যা খুশি জিজ্ঞাসা করে বেকুব বানিয়ে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে বাইরে বার করে দেবে। আমিও একেবারে বেপরোয়া।

আচ্ছা কর্পোরেশন চালাচ্ছে কে এখন বলতে পারেন, সেই তিনমণি জেণ্টেলম্যান জিজ্ঞাসা করে খুব একটা বোকা বানাবার মত করে।

কর্পোরেশন কি আর চালাতে হয়, ও এমনিই চলে, বুঝলেন কিনা—

তখন দুটোতে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে।

ও। এটা যা দিয়েছেন, অনাথ জোরে হেসে ওঠে, টেবিলের ওপর একটা চাপড় মারে তারপর বলে দীনেনের দিকে তাকিয়ে, এখনও আছে, শুনুন।

দীনেনের মুখ দেখে মনে হল সে উদ্‌গ্রীব বাকিটুকুর জন্যে।

টিয়াপাখির মত নাক তখন বেশ বুঝতে পেরেছে আমার মনের অবস্থা। আমি যে রাগে জলছি এটা টের পেতে ওর ভুল হয়নি। হঠাৎই কেমন যেন সুর একটু নরম করে বলে, আপনি এখানকার মাইনে পত্তর কিছু জানেন?

জানবার জন্যেই তো বসে আছি আপনার এগারটা থেকে, এই সাড়ে তিনটে পর্যন্ত

তা যাক, অ্যালাউন্স নিয়ে-টিয়ে হবে আপনার মোট এইট্টিসেভ্‌ন এইট্‌।

ওরে বাব্‌বা! এত টাকা! নিয়ে করব কি, কানে তুলল না আমার কথাটা, কি শুনেও শুনল না ঠিক বুঝলাম না। সেই সাড়ে তিনমণি এবার বলে, আমাদের অফিসের নিয়ম কানুন কিছু জানেন নাকি? যেন না জানাটা ভীষণ অপরাধ।

সকাল আটটা থেকে বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত, আর সারা সপ্তাহে চল্লিশ মিনিট লেট করতে পারেন, সেই রোগামত ভদ্রলোকটি এবার বললে।

এত সুবিধে! আমি বললুম সেই মুটকোটার দিকে চেয়ে।

কি, পেলে করতে রাজী আছেন, মুটকো আমাকে জিজ্ঞাসা করে। আমি ততক্ষণে দাঁড়িয়ে পড়েছি, এবার দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই বললুম, কি বলেন কি, রাজী নই মানে! আদ্ধেক রাজত্ব আর রাজকন্যা ছেড়ে যাব কোথায়! আচ্ছা, আপনাদের ঢোকবার আর বেরুবার দরজা কি একটাই —ব্যস লম্বা লম্বা পা-ফেলে একেবারে ঘরের বাইরে।

ওর কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই অনাথ টেবিলের ওপর আরেকটা চাপড় মেরে বলে, ওয়াণ্ডারফুল! আপনি স্টেজে নামুন অনিন্দ্যদা।

না, কি আক্কেল একবার ভেবে দেখ, সাতাশিটাকা আট আনার জন্যে এগারোটা থেকে সেই বিকেল চারটে পর্যন্ত আটকে রেখেছে। একটা কাণ্ডজ্ঞান বলে ত কিছু থাকে মানুষের। চাকরির জন্যে ডেকেছিস বলে মানুষের খিদেতেষ্টার কথাও ভুলে যাবি। আর কি ইডিয়ট দেখ, প্রশ্ন করার মা-বাপ নেই! ওরা ভাবে কি আমাদের। দীনেনের মুখের দিকে তাকিয়ে কথা শেষ করে।

তার উত্তেজিত ভাব দেখে দীনেন আর অনাথ যেন অনুমান করতে পারে, ক্ষেপলে ও কারও নয়। যেন দরকার হলে এ-অফিসের কর্মকর্তাদেরও একহাত দেখে নিতে পারে। কিন্তু হঠাৎই মনে পড়ে কিইবা করতে পেরেছে সে, যখন এ-অফিসে দীনেনের মত অসহায় ছেলের চাকরি যায়। কোথায় ছিল ওর প্রতিবাদ করার কণ্ঠ? মাথায় হাত দিয়ে কেমন মুষড়ে পড়েছিল দীনেনের ভাষাহীন চোখের দিকে তাকিয়ে, হাতে রিট্রেঞ্চমেণ্ট নোটিসের কাগজখানা দেখে। একটা চাকরির জোরেই সত্যি কথা বলতে কি ও ইণ্টারভিউতে অমন ফাজলামি করতে পেরেছে। যত রাগ আর দম্ভই তার চাড়া দিয়ে উঠুক, কোন সাহসই সে দেখাতে পারত না যদি আসল জায়গায় টান পড়ত।

আচ্ছা, সব তো হল অনিন্দ্যদা, কিন্তু আমার কি করছেন? দীনেন এতক্ষণে নিজের কথায় ফিরে আসতে পেরেছে। ওর ভেতরের অশান্তি, অস্থিরতা, উদ্বেগ সব কিছু পড়া যায় ওর চোখের ভাষায়। একেক সময় তার সত্যি মনে হয়েছে লজ্জায় তাকাতে পারবে না আর বেশিক্ষণ দীনেনের দিকে যদি চোখমুখের এই অবস্থায় আর কিছুক্ষণ বসে থাকে দীনেন। কেন এমন অপরাধীর মত মনে হয় নিজেকে দীনেনের সামনে। দীনেনের চাকরি খোয়ানোর জন্তে সে কি দায়ী? আর একটা চাকরি জোগাড় করে দিতে না-পারলে ভবিষ্যতে কোনদিন মুখ দেখাতে পারবে না দীনেনকে। কেন এমন হচ্ছে মনের মধ্যে?

একটু অন্তমনস্ক হয়ে পড়েছিল দীনেনের কথা ভেবে। দীনেনের কথার জবাবটা জিবের ডগায় কখন উপস্থিত। বলে কেমন এক ক্লান্তির সুরে, বিশ্বাস তো করছ, চেষ্টার ত্রুটি করছি না।

না না, সে কথা নয়, অবস্থাটা বুঝতে পারছেন তো দুয়েকটা টুইশ্যান দেখে দিন না।

খোঁজ পেলে তোমাকে জানাব না, কি বলছ। আসে কই। আর যাও বা আসে তাও ভদ্দরলোকের মত নয়। কি বিশ পঁচিশ টাকা দেবে, তার জন্তে এ মোড় থেকে ও মোড়।

না অনিন্দ্যদা, যা পারেন একটা দিন এখুনি। আর চালাতে পারছি না, দীনেনের কণ্ঠের স্বরে যে আর্তি, বিপন্নভাব তা সারা মুখে চোখে

ছড়িয়ে পড়ে। ওর ভেজা-ভেজা চোখ, ক্লান্ত মুখ আর কাঁধ-ছেঁড়া শার্ট সব কিছু মিলিয়ে ওকে এক মুহূর্তে করুণ বিষণ্ণ ও দুঃস্থ করে তুলেছে।

অনাথ ওর হাত-ঘড়ির দিকে চেয়ে তার দিকে হাত উঁচু করে তোলে। বলে, এবার যে উঠতে হয়—অনাথ দীনেনের দিকে একবার তাকায়, যেন ইচ্ছার বিরুদ্ধেও উঠতে হচ্ছে। না-উঠে উপায় নেই।

আচ্ছা আজ তা হলে চলি, তার দিকে একবার কৃতজ্ঞ দৃষ্টি তুলে, দীনেন হাত তুলে নমস্কার করে। আরেকবার বলে উঠতে উঠতে, ঠিকানাটা মনে থাকবে অনিন্দ্যদা ?

না তা কি আর থাকবে ? চলি।

অনাথ ওর সঙ্গে সঙ্গেই চেয়ার ছাড়ে, দুহাত মাথায় তুলে নিবিড় নমস্কার জানায় দীনেনকে।

স্মৃতিকে কারণে অকারণে, এমন কি সম্পূর্ণ বিনা কারণে দুঃখ বা আঘাত দিয়ে নিজেকে এমন নিশ্চল করে তোলে, মনকে এমন নিঃসাড় করে তোলে যে ভেবে দেখলে মনে হবে বাঁচার সব মানে কবে কখন ফুরিয়ে নিঃশেষ হয়েছে। অস্তিত্ব ধারণের বিড়ম্বনা গ্লানির পর্যায়ে নেমে এসেছে। এর ওপর ছোড়দি যখন আবার অরুদির বিপর্যয়ের খবর নিয়ে আসে, আলোচনা করে, তখন আবার নতুন করে অরুদির কথা ভাবতে হয়। অরুদির সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামাতে হয়। এখন আবার কোথা থেকে দমকা হাওয়ার ঝড়ে অনেক শুকনো হালকা ঝরাপাতার মত উড়ে এল দীনেনের ভাবনা। অজস্র টুকরো চিন্তার একটা সূক্ষ্ম সুবিস্তৃত জালের মত হয়ে দীনেনের চিন্তা কখন অজ্ঞাতে তার সারা মনকে গ্রাস করতে শুরু করেছে। বেশ তো ছিল, অনেকদিন দেখা হয়নি দীনেনের সঙ্গে। দীনেনের কথা সত্যিই কি মনে রেখেছিল নাকি সে। অথচ এমন ভাবে কথা বলেছে দীনেনের সঙ্গে যে দীনেনের চাকরি যাওয়ার পর থেকে কতই না ভেবেছে ও দীনেনের ব্যাপারে। অনাথ কি ওর মনের মধ্যে ঢুকে সব জেনে শুনে দেখে বিচার করেই বলেছে, তোমার স্টেজে নামা উচিত অনিন্দ্যদা। না হলে কোথায় রেখেছে ও দীনেনের নতুন বাসার ঠিকানা। তন্ন তন্ন করে খুঁজলেও কি ওই ঠিকানা সে বার করতে পারে, যদি না

দীনেন আবার তাকে জানাত। কিন্তু ও কি সত্যিই চায় না দীনেনের একটা চাকরি হোক। ও তো মনে প্রাণে চায়। তবু কী করতে পারে সে। পুরুষ মানুষ হয়েও নিজেকে ভীষণ অসহায় আর বিপন্ন মনে হয়। কিছু পারবে না বলে, বা কিছু করার ক্ষমতা নেই বলেই কি অবহেলায় অযত্নে ঠিকানাটা হারিয়ে ফেলেছিল। আচ্ছা আবার নিলই বা কেন ঠিকানাটা নতুন করে দীনেনের কাছ থেকে? কিছু পারবে কি এবারে? কি করতে পারে সে। তবু একবারও মুখ ফুটে বলতে পারল কই, আমাকে দিয়ে তোমার কিছু হবে না, এটা তুমি, এত বড় ছেলে বুঝতে পার না দীনেন? এটা বোঝারও বয়সে কি তোমার হয় নি? কই কিছুতেই তো বলতে পারল না দীনেনকে কথাগুলোর একটাও। আবার কি নতুন করে ঠকাল দীনেন কে? আবার মিথ্যা অভিনয় করল। আর করল এমন একটি ছেলের সঙ্গে, যার কাছে বাঁচার অস্তিত্ব, প্রতিটি রাত্রি জেগে জেগে অসীম উৎকণ্ঠায় ভোর করা। মনের এ-অবস্থার কথা ঠিক খুলে মেলতে পারে যার কাছে সেও কি তার মনের কাছ থেকে যোজন যোজন দুরের ব্যবধানে সরে গেছে। সব কিছু মিলিয়ে কী বিশ্রী যে মনের অবস্থা। মনের এই অবস্থায় পেঁৗছলে বোধ হয় কোন পরীক্ষক একটি নিরীহ নিরপরাধ ছাত্রের প্রতি যত অবিচার সব করে বসেন।

নিজের জায়গায় এসে ফের বসল যখন, এই সব চিন্তাই তার মনের মধ্যে বিরামহীন পারাপার শুরু করে দিল। এত অসংখ্য ক্ষত মনের মধ্যে জ্বালা ধরিয়েছে যে একটা নিরাময় করতে চায় তো অন্যগুলো থেকে বেদনার পুঁজ রক্ত পড়ে বিষাক্ত করে তোলে মনের আবাসকে। বাইরে যত স্থিতধী আর আত্মস্থ মনে হোক তাকে, ভেতরে ভেতরে টুক্‌রো টুক্‌রো ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যাচ্ছে। শুশ্রূষার সহস্র অক্লান্ত সেবিকার হাত বাড়িয়েও কি স্মৃতি এখন তার বেদনা অপনোদন করতে পারবে।

বিনোদের ডাকে চিন্তার অসংখ্য ঢেউ হাতড়ে হাতড়ে ঠেলে সরিয়ে ক্লান্ত সাঁতারুর মত পারের দিকে আসতে চায়, যেখানে বিনোদের গলার স্বরে নিজেকে আবার ফিরে পাবে চারপাশের টেবিল চেয়ার, কাগজের স্তূপের ভিড়ে অফিস ঘরের চার দেয়ালের নিতান্ত প্রাত্যহিক বাস্তব পরিবেশে।

রেকর্ডে পশুপতিবাবু ডাকছেন আপনাকে, জোর লেগেছে দুজনের, বিনোদ বলে।

কেন? কী ব্যাপার? দুজন মানে—

অম্বুজবাবু খুব চটেছে—যে রকম চোখ বড় বড় করে দেখায় বিনোদ, অদ্ভুত মুখভঙ্গি করে, তাতে মনে হয় অম্বুজবাবুর চটে ওঠার খবরে অফিসের নিচের মহলের এমন কোন কর্মচারী নেই যে খুশি হয় না।

ও উঠবে কি উঠবে না ভাবে। ওর ইতস্তত ভাব দেখে ওপাশে তারকবাবু টেবিলের ওপর থেকে চোখ তুলে বলেন, যান যান, কি হল একবার দেখে আসুন। আর তো পৌনে পাঁচটা। কিছু হবে না আজ। বাবুরা কেউ ফিরছেন না। ছোট সাহেবও টিফিনের পর বেরিয়েছে শুনলুম।

ও পিছন ফিরে দু পা এগিয়েছে, তারকবাবু ফিরে ডাকলেন, তবে একটা সুখবর আছে জানেন, কেস নাকি ট্রাইবুনালে গেছে। খুব লড়ছে নাকি বড় সাহেব ছোট সাহেব দুজনেই। আর সেক্রেটারি কে তো জানেনই। মুখের বাদ-বিচার নেই। একবার যদি বেরিয়ে আসে তো বোনাস মারলেন কমসে কম সাড়ে তিন মাস। কি বলেন, সাকসেস্‌ফুল হবে না?—যেন ওর কথার ওপর অনেক খানি নির্ভর করে থাকেন তারকবাবু। অনাথের কথায় যদি কোন অপমানের দাগ লেগে থাকে তাঁর মনে, তো মুখে এখন তার অস্পষ্ট চিহ্নটুকুও নেই।

হলে তো আমাদেরই জয়; আচ্ছা আসছি, ও এধুনি ফিরবে এমনই ভাবে বেরিয়ে যায়।

পশুপতিবাবুদের সেক্‌শনে গিয়ে দেখে অম্বুজবাবুকে নিয়ে প্রায় এক খণ্ড যুদ্ধ। এ সেক্‌শনের সুবিধে এখানে ওপরওয়ালাদের হামলা যখন তখন এসে পড়ে না। বেশ কোণের দিকে। আর হঠাৎ যদি বিপদের কোন গন্ধ পাওয়া যায় তো দূতের অভাব নেই খবর পেঁ ৗছে দেবার। কারণ বড় কর্তাদের হামলা আসবার আগেই সামলে নেবার সময় পাওয়া যায়।

এই তো মিস্টার এসে গেছে, ও ঘরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গেই ওকে দেখিয়ে পশুপতিবাবু উল্লসিত হয়ে ওঠেন।

আরে আমি তো বলছি, বাপের জন্মে একটা দারোগা দেখেছিস কখনো, এই তো আবার বলছি, পশুপতিবাবুর গলার স্বর অম্বুজবাবুর চিৎকারে চাপা পড়ে। কথা বলার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি দরজার দিকে ফিরে ওর উপস্থিতি লক্ষ্য করেন। সেই ফাঁকে পশুপতিবাবু ওর দিকে চেয়ে একটু চোখ টিপে দেন।

ও বুঝতে পারে এই চমৎকার কথাটাই কিছুক্ষণ আগে অম্বুজবাবু প্রথমবার উচ্চারণ করেছেন।

ভারি ভাল কথা বলেছেন অম্বুজবাবু, সত্যিই খাঁটি কথা বলেছেন, ওর কথার শেষের দিকে যেন নিজের কথার সমর্থন পেলেন অম্বুজবাবু। একে ওর 'বাবু' সম্বোধন, তার ওপর আবার ওর কথার প্রথমদিকের শ্লেষ, ভেবেছে খুন চেপে যাবে অম্বুজবাবুর।

না না, তুমি শোননি ব্যাপারটা সব, তার দিকে চেয়ে পশুপতিবাবু বলতে থাকেন, ওর ছেলের বিয়ে দেবেন, তার জন্মে ডাউরি চাইছেন পঞ্চাশ হাজার টাকা—এটা কি একটা ন্যায্য কথা? তুমিই বল—

একশো বার চাইব, বেশ করব চাইব। আমার একটি ছেলে, আর তা-ও আই. এ. এস. এখানে একটাও ছেলে আছে যার জন্মে কোন ভদ্দরলোক মেয়ের বদলে কানাকড়িও দেবে?

বলে প্রায় হাঁফাতে থাকেন অম্বুজবাবু।

আমার কথাটা কিছুতেই শুনবেন না আপনি—পশুপতিবাবু তার দিকে চেয়ে বাধা দিতে চান অম্বুজবাবুকে।

আরে শুনব কি তোমার কথা, শোনবার আছে টা কি? ওই তো বললুম এখানে বাপের জন্মে দারোগা দেখেছ কেউ একটা—অম্বুজবাবুর কথা সপাং করে যেন চাবুক মারে পিঠে।

সত্যিই তো দারোগা কটা লোক দেখেছে এই বাংলা দেশে নিজের পরিবারের মধ্যে? এই তো আমার বাবাই সারা জীবন স্কুল মাস্টারি করেছেন। আর তাঁর পূর্বপুরুষরা? তাঁরা নিশ্চয় মুর্শিদাবাদ কিংবা নদীয়ার জমিদারি ভোগ করেছেন।

না না, আমি আপনাকেই ঠিক মিন করছি না, কণ্ঠস্বরে ঝাঁঝ রেখেও

কেমন অপ্রস্তুত হয়ে বলেন অম্বুজবাবু তার দিকে ফিরে। রাগলে আবার অম্বুজবাবুর মুখ থেকে আপনি ছাড়া কিছু বেরুবে না।

সত্যিই তো ঠিকই বলেছেন, আমরা আর আলাদা আছি কে? সবাইকার পক্ষেই কথাটা খাঁটি—পশুপতিবাবু ওর দিকে চেয়ে তারিফ করেন ওর কথাটা, চোখের চাউনি দিয়ে।

আবহাওয়াটাকে কিছুতেই থমথমে হতে দেবেন না পশুপতিবাবু। বেশ গরম করে রাখতে চান আজ ছুটি হওয়ার আগে পর্যন্ত। অম্বুজবাবুকে ক্ষেপিয়ে একেবারে শেষ ধাপে নিয়ে যাবেন।

না, অম্বুজদা বুঝছেন না কথাটা। তুমি ভেবে দেখ মিস্টার, ওর ছেলের জন্যে পঞ্চাশ হাজার টাকা পণ চাইছেন, কিন্তু দুই মেয়ের বেলায় ডাউরি বাঁচাবেন। ছেলে নয় আই. এ. এস. কিন্তু মেয়েরা কি কেউ আপনার কোন দিন হেডমিস্ট্রেস্ হবে?—পশুপতিবাবু এইবার যা বলবেন তাতে আরও কম পক্ষে বিশ পঁচিশ মিনিটের খোরাক পাবে সবাই।

না না, ডাউরি দেব না একথা তো একবারো বলিনি, ইউ আর মোর দ্যান এ লায়ার। তবে একশোবার চাইব পঞ্চাশ হাজার টাকা। আই. এ. এস. ছেলের বাপ হয়ে এটুকুও দাবি করতে পারি না? টেবিলের ওপর একটা ঘুঁষির আওয়াজ তোলেন অম্বুজবাবু।

বেশ তো ভালই তো। আই. এ. এস তা হয়েছে কি? খুব মানী লোক মানলুম। তা বলে একটা হাতির দাম চেয়ে বসবেন? পশুপতিবাবুর কাছ থেকে উৎসাহ পেয়ে এবার শংকর ফোড়ন কাটে।

ছোট মুখে বড় কথা বলতে যেয়ো না হে ছোকরা, বুঝলে? মাইনে পাও ক'পয়সা। তোমার মত যে কটা আছে এখানে সব কটাকে বাঁ হাতের এক আঙুলে ওঠাতে আর বসাতে পারে, বেশ কায়দা করে অভিনয়ের ভঙ্গিতে দেখালেন অম্বুজবাবু রাগের চোটে কাঁপতে কাঁপতে।

শংকর দলে পড়ে বলতে গেছে কথাটা, একটু উস্কে দেবার জন্যে। ভাবতে পারেনি এমন আঁতে ঘা পড়বে। বড়লোককে বড়লোক না বললেও তার কিছু আসে যায় না, কিন্তু গরিবকে গরিব বললে ভীষণ লাগে তার। ঠিক এই কথাটাই যেন কেউ পড়তে পারে এ সময়ে শংকরের মুখে।

আর তা ছাড়া অম্বুজবাবুর কথায় সে নিজেও কোথায় তার ক্ষুদ্রতা খুঁজে পেয়েছে যেন। কেমন হীনমন্যতা তাকে হঠাৎ কাবু করেছে।

আপনি ফিলোজফার লোক হয়ে অম্বুজদা—কি করে,—কথা শেষ না করে একটা পান মুখে পুরে, হাতের তালুতে জর্দা ঢালেন পশুপতিবাবু।

খবরদার ফিলোজফার ফিলোজফার কোরো না বলছি। কি বোঝ তুমি ফিলোজফির ?—ধমক দিয়ে ওঠেন অম্বুজবাবু।

আমি না হয় বুঝি না, কিন্তু এই মিস্টার তো বোঝে। কি বলো হে মিস্টার, অন্যায় কিছু বলেছি ? ওর দিকে তাকিয়ে বলেন পশুপতিবাবু।

আপনি তো ফিলোসফির এম. এ. একজন, এটা তো মিথ্যে নয়, নিমেষে কেমন গম্ভীর হয়ে ও সব ব্যাপারটাকে ক্ষান্ত করার চেষ্টায় বলে।

একদিন ওপরওয়ালাদের কে একজন অম্বুজবাবুর ফাইল ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বলেছিলেন, ফিলজফির এম. এ. হলেই ফিলোজফার হয় না মশাই বুঝলেন। চুল পাকল, এখনো কন্‌সট্রাক্‌শনের জ্ঞান হল না।

মাটি থেকে কাঁপতে কাঁপতে ফাইল তুলে নিয়ে অম্বুজবাবু বেরিয়ে এসেছেন ঘর থেকে। চারপাশে লোক জড় হয়েছে তাঁর। উনি বলেছেন, আমায় জ্ঞান দেওয়া হচ্ছে, নিজে কিসের জোরে ওই চেয়ারে বসেছ জানি না। তোর যদি ভুল বাছি তো গাঁ উজাড় হবে।

সেদিন ঘরে দুয়েকজন যারা উপস্থিত ছিল তারাই রটিয়েছে অম্বুজবাবুর ফিলোজফার নাম। ইদানীং ছেলে আই. এ. এস. হবার পর তাঁর বদ্ধমূল ধারণা হয়েছে অফিসে তাঁর খাতির অনেক বেড়েছে। আর সে কারণেই বিনয় করে বলেন অফিসের কর্তাব্যক্তিদের উদ্দেশে, আর কটা দিনই বা অত্যাচার করবি, কর। কাটবার সময় তো হয়ে এল।

সুযোগ পেলেই, ও ইদানীং লক্ষ্য করেছে, অম্বুজবাবু ঘুরিয়ে ফিরিয়ে শুনিয়ে দিয়েছেন যে যদিও তিনি এই অফিসে চাকরি করেন, তারাই তাঁর কলিগ্, তবু তিনি আই. এ. এস. ছেলের বাপ। তাঁর কাঁধে হাত রেখে যখন এই অম্বুজবাবু বলেন উপদেশ দেওয়ার মত করে, তখন অনাথ বা দীনেনকে ডেকে দেখাতে ইচ্ছে করে—কত পাও তুমি এখন, অ্যালাউন্স নিয়ে ? ও চুপ করে থাকে। কেমন লজ্জা করে হঠাৎই ভিতরে

ভিতরে। সব বুঝতে পারেন যেন অম্বুজবাবু অনুমানেই। একটু থেমে থেকে বলেন, তা তোমার বয়সে আমার ছেলেটি—ও ত ক্লাস ওয়ান অফিসার—তা তুমি গভর্নমেণ্ট সার্ভিসের চেষ্টা করলে না কেন—

ও চুপ করে থাকে। পিঠের ওপর কখন চাবুকের এক ঘা অনুভব করে।

বার বার মনে আসে দীনেনের কথা। কার কাছে চাকরির জন্যে এসেছে দীনেন? দীনেনকে সে কোনদিন চাকরি জোগাড় করে দিতে পারবে। ক্ষমতা যদি থাকে তো অম্বুজবাবুর ছেলেরই আছে। আচ্ছা, ক্যাজুয়াল লিভটা আরো কিছু দিন বাড়ান যেত না। দীনেন এসে ফিরে যেত দেখা না-পেয়ে। তারপর দেখা হওয়ার আশাই ছেড়ে দিত একেবারে, ব্যর্থ হয়ে।

।। ৮ ।।

ও প্রথমটা ধরতে পারেনি, কারণ কণ্ঠস্বরটা ঠিক ওর বিশ্বাসের আওতায় আসেনি, ও কেন যেন বিশ্বাস করতে পারছিল না, ওটা অতীশদার গলার স্বর। কিন্তু যখন আর বিশ্বাস না-করে উপায় রইল না তখন টুথব্রাশটা সামনের কটা দাঁতের ওপর ঘষতে ঘষতে বিকট একটা মুখ করে (নিজের মুখ না-দেখেই ও বেশ অনুমান করে নিতে পেরেছে মুখের হাস্যকর চেহারা) বলেছে, আরেকবার প্রমাণ পাওয়া গেল—কথা পুরো শেষ না-করে অতীশদার মুখের দিকে তাকিয়েছে, লক্ষ্য করেছে অতীশদা মুখে অস্ফুট হাসি টেনেছেন, আন্দাজও করেছে ও কী কথা বলতে পারে। ও অতীশদাকে দেখতে দেখতে একটু একটু করে কথা শেষ করেছে, পুরনো ঠাট্টাটাকে একটু ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সাজিয়ে বলেছে, দি সান ডাজ নট অলোয়েজ রাইজ ইন দি ইস্ট, অতীশদা অ্যাট্ টাইম্স রাইজেস্ অ্যাট্ সেভ্ন।

অতীশদা চুপ করে বিনা প্রতিবাদে ঠাট্টা হজম করে না, একটু সামলে নিয়েই বলে অ্যাণ্ড্ নোটিসেস ইউ ব্রাশিং ইয়োর টু সেট্স অফ টিথ; বলে ওর মুখের দিকে স্বল্পক্ষণ তাকিয়ে থাকে, দেখে ওর মুখের ভাবখানা, পরে শেষ করে অনেকটা বাজি মাতের ভঙ্গিতে, অফ হুইচ ওয়ান হ্যাজ্ রিসেণ্ট্লি বিন লস্ট্।

অতীশদার কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ওর হারান দাঁতটার কথা মনে পড়ে যায়। ঘুমভাঙার পর দাঁত মাজবার সময় প্রতিদিন সকালে এই হারান একটা দাঁতের শোক তাকে একটু অন্যমনস্ক করে দেবে। নিজের মুখের সৌন্দর্য হানির কথাই কি ওকে ক্ষণিক বিমর্ষ করে তোলে? একটু গম্ভীর চিন্তা করলেই এ-ব্যাপারে কিন্তু হাসি পায়, পাবারই কথা। দুঃখে সান্ত্বনার মতই পরক্ষণে মনে পড়ে ওই ফাঁকা জায়গায় আরেকটা দাঁত

আসতে কতক্ষণ। আর ঠিক এরপরেই মনে হবে কি ছেলেমানুষী চিন্তা। আর অতীশদা একেই উস্‌কে দিয়ে আনন্দ পান। ওর মনে আছে এই কটা বছর আগেও সে অতীশদার এই রকম ঠাট্টা, হাল্কা কথায় হঠাৎ কেমন ক্ষেপে উঠত। বাইরে রাগের বিশেষ কোন প্রকাশ ছিল না। কিন্তু ছোড়দির চোখে একদিন ধরা পড়ত সে অতীশদাকে এড়িয়ে চলেছে। ছোড়দি ধমক দিয়েছে চিরকেলে শাসন করার ভঙ্গিতে, কি হয়েছে তোর বলত? বুড়ো বয়সে মার খাবি—

অতীশদার এই ঠাট্টার সূত্র ধরে ছোড়দির সঙ্গে কত দিন বোঝাপড়ায় আসতে হয়েছে। যেমন বুঝতে পেরেছে ছোড়দির অস্তিত্ব অতীশদার এই প্রতিদিনের ব্যবহারকে কেন্দ্র করে পূর্ণতা পাচ্ছে, তেমনি জেনেছে কোন আত্মীয়তার জোরে অতীশদা তার সঙ্গে অনেক খুঁটিনাটি ব্যাপারেও এমন নিঃসঙ্কোচ হয়েছেন বরাবরই। ছোড়দির সঙ্গে এমন কি তার সঙ্গেও কোন ব্যবহারে অতীশদা বোধ হয় কোনদিন ভাবেনি তারা কি ভাববে না-ভাববে। মা'র সঙ্গে অতীশদার ব্যবহারে সব সময়ে কেমন একটা চাপা সম্ভ্রমের সঙ্গে নিবিড় সহানুভূতি, মমতাবোধ সে লক্ষ্য করে এসেছে। ছোড়দির মান অভিমান, তার ক্ষোভ বিক্ষোভ অতীশদার চরিত্রের একনিষ্ঠতা দৃঢ়তা কেমন এক ফুৎকারে উড়িয়ে দিয়েছে নিমেষে। তাই শুধু গম্ভীর গভীর উপদেশ নয়, অজস্র টুকরো তুচ্ছ অর্থহীন কথায় অতীশদা ছোড়দিকে অজান্তে বাঁচার প্রেরণা জুগিয়েছে, মাকে তিলে তিলে মৃত্যুর পথে এগোনর হাত থেকে সবল মুঠিতে সরিয়েছে একা সে কি করতে পারত এই অসহায় দুটি প্রাণীকে নিয়ে বাবার ততোধিক অসহায় মৃত্যুর পর থেকে দিন দিন করে বহুদিন। একদিন তাই নির্জন চিন্তায় জানতে পারল, অতীশদার কাছে তার নিজের ব্যক্তিগত ঋণ কবে স্তূপাকার হয়ে উঠেছে সে নিজেই জানতে পারেনি। আর এই জানাটাই তার অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধি দু-ই। অতীশদা সম্পর্কে যখন এমন সব অনেক কথা মন আচ্ছন্ন করে থাকে তখন সামনাসামনি দাঁড়িয়ে অতীশদার মুখের দিকে চেয়ে থাকতে পারে না। শুধু মনে হয়, কখন মনের কোন শূন্য অবস্থায় অতীশদা সম্পর্কে বিরূপ মনোভাব নিয়ে চিন্তা করেছে উদ্দেশ্যহীন। আর

তখুনি নিজেকে ক্ষুদ্রতা তুচ্ছতার চরমাবস্থা থেকে মুক্তি দেওয়ার চেষ্টা করেছে প্রাণপণ।

অতীশদার কথায় আমল না-দেওয়ার মত করে সে কথা ঘুরিয়ে নেওয়ার চেষ্টায় বলে, হাতে কী ওটা আপনার?

এটা?—মাথা নিচু করে হাতের শাদা লম্বা খামখানার দিকে এক বিন্দু নজর রেখেই, মুখ তুলে ফের বলে অতীশদা, আরে, এটাই তো সব। পাস্‌পোর্ট।

পাস্‌পোর্ট?—একটু ঘাবড়ে গিয়ে ও বলে, কি লণ্ডনের নাকি?

লণ্ডনের পাস্‌পোর্টে লণ্ডনই যাওয়া যায়, অতীশদার কথা ওর কাছে অস্পষ্ট থাকে, অথচ এবারে ও সত্যি সত্যি ব্যাপারটার মধ্যে কিছু একটা আছে অনুমান করতে পারে। অতীশদার এত সকালে পদার্পণ আর হাতের ওই শাদা লম্বা খাম, দুয়ে মিলে তাকে একটু চিন্তিত করে তোলে।

না না, ব্যাপার কি খুলে বলুন, ওর কণ্ঠের অধৈর্য উপভোগ করে অতীশদা, অতীশদার হাসিতেই টের পাওয়া যায়।

ব্যাপার আবার কি? পাস্‌পোর্ট টু ফরচুন—অস্পষ্ট কথায় উত্তর দিয়ে অতীশদা ওর দিকে রহস্যময় দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে থাকে। ও মাঝে মাঝে কেমন বিহ্বল হয়ে গেছে পুরু কাচের নিচে অতীশদার চোখ জোড়ার দিকে নিশ্চুপ তাকিয়ে থেকে। অতীশদার চোখে কখন সখন এমন ভাবে চোখ পড়লে উপলব্ধি করেছে, অনুভব করেছে, অতীশদার দৃষ্টিকে ধাওয়া করে তারও দৃষ্টি কেমন করে দৃষ্টির বাইরে অগাধ সীমহীন শূন্যতায় তার সজ্ঞান, সচেতন চিত্তকে পা-টিপে পা-টিপে ফাঁকি দিয়ে এড়িয়ে উধাও হয়েছে।

এমন ব্যস্ত হয়ে দাঁতের ওপর টুথব্রাশ ঘষতে ঘষতে অতীশদার মুখ থেকে কথা বার করা যাবে না। তাই মুখধোয়ার পাট তাড়াতাড়ি চুকিয়ে ফেলার জন্যে ও কলঘরের দিকে ছোটে। নিজের ব্যস্ততায় নিজেই ও হেসে ফেলে। অনেকদিন এমন করে দাঁতের ওপরে ব্রাশ ঘষে যে মাকে পর্যন্ত ডেকে সজাগ করতে হয়েছে তাকে। অলস মন্থর গতিতে টুথব্রাশ চালাতে চালাতে হয় ত কথাই বলে চলেছে স্মৃতিরেখার সঙ্গে হয় ত যে সব কথা সাক্ষাতের সময় বলব মনে করে বলা হয়নি। কারণ মনে আসেনি। মা বলেছে, দাঁত মাজছিস না দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘুমুচ্ছিস? মা'র কথা যদি

ছোড়দির কানে গেছে তো ছোড়দি বলেছে, না ব্যায়াম করছেন তোমার ছেলে। বুরুশ ক্ষয়ে গেল তো দাঁতের দাগ উঠল না।

আবার আজকের মত অনেকদিন কোন রকমে দাঁতে বুরুশ বুলিয়েই দাঁতমাজার পাট চুকিয়েছে। ছোড়দির ব্যায়াম করার কথাটা মনে করে হাসি পায়। ওর কোন ব্যাপারে যদি নাক গলাবার একটু সুবিধে পেল তো ছোড়দি সে সুযোগ নিতে কসুর করবে না। ছেলেবেলা থেকে আজ পর্যন্ত ছোড়দির এ নিয়মে কোন ব্যতিক্রম নেই। অনেক সময় অতীশদার সামনে দাঁড়িয়ে ওরা ওদের কথা নিয়ে সব ভুলে গিয়ে কি তুমুল ঝড়ই না তুলেছে দুজনে। মা হয়তো কখন ঘরে ঢুকেছে, বলেছে, আচ্ছা একটা লোক যে ঘরের মধ্যে রয়েছে সে কাণ্ডজ্ঞানটাও নেই অতবড় মেয়ের। ছোড়দি ক্ষান্ত হয়েছে মা'র কথায় লজ্জা পেয়ে, আর মিশে গেছে প্রায় মাটির সঙ্গে, অতীশদা যখন বলেছে, উইমেন পোলিস ফোর্সে চেষ্টা করে দেখতে পার, ফেয়ার চান্স আছে। ছোড়দি প্রায়ই অদ্ভুত মুখভঙ্গি করে বলে কিনা, মেয়েরা যে কি বলে পুলিস হয়। (এইরে! আবার ছোড়দির কথা ভর করে বসল না কি তার ওপর) ও তাড়াতাড়ি মুখে চোখে জলের ঝাপটা দিয়ে বেরিয়ে আসে। অতীশদাকে দেখতে পায় না যে জায়গায় দাঁড়িয়ে ছিল সেখানে। নিশ্চয় ছোড়দি ভেতরে নিয়ে গেছে।

ঘরে পা দিয়েই দেখে অতীশদাকে ওর চেয়ারে, হাতে চায়ের কাপ। খুশি হয় অতীশদাকে চায়ের কাপে চুমুক দিতে দেখে। তোয়ালেতে মুখ মুছতে মুছতে বলে, মুখে হাসি টেনে, চা তো দেখছি রেডি। ব্যস, এবার বলুন তা হলে।

কি বলব? মিস্ট্রি অফ দি এনভেলপ? বললুম তো পাসপোর্ট, পাসপোর্ট টু ফরচুন, অতীশদা মুখ নামিয়ে চায়ের কাপে চুমুক দেয় আবার।

আপনি কি মিস্ট্রি মোর মিস্টিরিয়াস করবেন?

সোজা কথাটা যদি না বোঝ; নিমন্ত্রণ, যাকে বলে একেবারে ইনভিটেশন ফ্রম ফরচুন।

তাহলে ফরচুনেরও হাত-পা আছে? এটা কি করে বুঝব বলুন তো!

মানে দিল্লীর ব্যাপার, ওখানে যদি যাই তো ভাগ্য খুলবে। এই আর কি কথা, অতীশদা ওর মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে শেষকালে রহস্যের উদ্ঘাটন করে।

বেটার চান্স পাচ্ছেন ওখানে, জিজ্ঞাসা করার সঙ্গে সঙ্গেই খেয়াল হয় কথাগুলোর মধ্যে কোথায় যেন অভিভাবকের সুর। অতীশদার চেয়ে অনেক সিনিয়র, এমন করে কথা বলার মত যথেষ্ট সাবালক সে এতদিনে হয়েছে তবে। আসলে অধিকারবোধের কথাটা মনের সবচেয়ে নিচুতলায় চাপা পড়ে থাকে।

হ্যাঁ, সে রকমই অনেকটা। অফিসেরই এক সিনিয়র অফিসার ব্যবস্থা করেছেন ইণ্টারভিউটার। ওটা কিছু নয়, নমিনাল। যদি মন ঠিক করে ফেলি তো হয়ে যাওয়ার সেণ্টপার্সেণ্ট চান্স, অতীশদা যখন কথা শেষ করে, সে লজ্জা পেলেও কোথায় একটু ক্ষীণ গর্ব অনুভব করে। এমন চিন্তা করে, গম্ভীর হয়ে তার কথার জবাবও অতীশদাকে তবে কখন কখন দিতে হয়। হঠাৎই নিজের মূল্যবোধ সম্বন্ধে অতর্কিতে সজাগ, সচেতন হয়ে উঠতে হয় তাকে। ভাবে, তাকে ছেলেমানুষ সাজিয়ে রাখার মূলে মা, আর তারপর ওই ছোড়দি। আর এই ক্ষণিক ভাবনা থেকে মুক্ত হওয়ার পরই, এই ছেলেমানুষী ভাবনা ভেবেছে কিসের অভিমানে, এই ভেবেই নিজেকে একান্ত ছেলেমানুষ মনে হয়। তার তো বয়েস বেড়েছে। এটা তো কোন মতেই মিথ্যে নয়। যদিও মা'র বা ছোড়দির কারও চোখকেই এড়িয়ে বা ফাঁকি দিয়ে নয়। এটাও কি বয়োবৃদ্ধির পথে একটা সান্ত্বনা।

অতীশদার মুখের দিকে তাকিয়ে যেটা তার পরক্ষণে মনে হল তা, অতীশদা যদিও তার সব প্রশ্নেরই জবাব দিয়েছে তবু বুঝি অন্যমনস্ক থেকে দিয়েছে। বিশেষ একজনের উপস্থিতি এ সময়ে তাঁর সবচেয়ে দরকার মনে হয়েছে। ওর চোখ এখন অনেক কিছুই ধরতে পারে। কেমন অভিজ্ঞ মনে হয় নিজেকে আজকাল। এ মুহূর্তে ধরতে পারে অতীশদার দৃষ্টিতে কিসের ব্যাগ্রতা। আসলে ছোড়দির এই জরুরী খবরটা ভাল করে শোনা দরকার। শুনে কতগুলো কথাও বলার দরকার। আর ছোড়দি এ সমস্ত ব্যাপারে কথা বলার সুযোগ পেলেই বেশ উপদেশ

দেওয়ার মত করে যুক্তি-তর্ক দেখিয়ে ভাল মন্দ সব দিকেরই আলোচনা করবে। অতীশদা এ সব কথার কতখানি গ্রহণযোগ্য বা গ্রহণযোগ্য নয় মোটামুটি ভেবে চিন্তে ঠিক করেই রেখে দেয়। তাই শুধু যা তাঁর কাম্য, অর্থাৎ ছোড়দির মুখ থেকে এ-ব্যাপারে সম্ভব অসম্ভব গুটিকয়েক কথা শোনা। তারপর সুবিধে মত একে একে নিজের মন্তব্য প্রকাশ করা। এরপরই চিরাচরিত দৃশ্যের পুনরাবৃত্তি। অনেকটা যেন তাকে সাক্ষী রেখে দুজনে নিজেদের পুরনো প্রেমকে ঝালিয়ে নতুন করে নেয়। এই দর্শকের ভূমিকাতেই তার সান্ত্বনা। কেমন আশ্চর্য সাহস নিয়ে দুজনে প্রেমের পথকে শক্ত করে বাঁধছে, অনড় করছে প্রেমের গাঁথুনিকে। সে অবাক হয়ে ভাবে মাঝে মাঝে। আর তার নিজের প্রেম? কত সাবধানে ভয়ে নানান দিক বাঁচিয়ে স্মৃতির সঙ্গে লুকিয়ে চুরিয়ে তাকে প্রেমের পথে একটি একটি সতর্ক পা ফেলতে হচ্ছে। আর এ ভাবনার শেষে যে-জিজ্ঞাসা স্থায়ী হয়ে, অপ্রতিরোধ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে তার বাইরের দৃষ্টি ও অন্তরের চেতনাকে কঠিন কালো পর্দার মত আচ্ছন্ন করে, তা হল, প্রেমের ক্ষুরধার যাত্রায় কটি পরীক্ষায় তারা অতীশদা-ছোড়দির মত উত্তীর্ণ হয়ে এসেছে? তার কি কম ভয়, আর স্মৃতিকে দেখে বুঝেছে স্মৃতির আরো বেশি, যদি এই যাত্রা নির্বিঘ্ন না-হয়? প্রেমকে নির্বিঘ্ন করার তাড়া কারো কিছু মাত্র কম নয়। তবু স্মৃতিরেখা যত তরান্বিত করতে চাক তাদের এই প্রেমকে, সে নিজে কেমন শ্লথ হয়ে পড়ে। স্মৃতি যদি নিশ্চিন্ত হতে পারে, সে পারে না কেন? ফিরে ফিরে তার মনে হয় কতই বা বয়স তাদের এই প্রেমের। আর ঠিক এ-প্রসঙ্গ তুলে স্মৃতিরেখাকে যদি এখনকার, মনের ঠিক এই প্রশ্নটাই সোজাসুজি জিজ্ঞাসা করা যায়, তো, কি বলবে স্মৃতি? হয়তো বলবে না কিছু। নিদারুণ ভুল বুঝে বসে থাকবে। আর যদি কথা বলেই নিতান্ত সোজা করে উত্তরটা দিতে চায়, তা হলে এমন একটা কিছু বলবে যাতে নিজেকে ঠগ, বাটপারের স্থলাভিষিক্ত করে ভেবে দেখতে হতে পারে। আর তারপর যখন নিজেকে জিজ্ঞাসা করেছে আর মনে মনে ভেবেছে, অতীশদার এই প্রেম যদি না ছোড়দিকে কেন্দ্র করে, দিন মাস বছরের ঘূর্ণায়মান চাকাকে অবজ্ঞা করে, এমন একটি সম্পূর্ণ বৃত্তের আকার গ্রহণ করত তবে কি সত্যিই সে নিজেও

এমন উদ্দীপ্ত, উৎসাহিত বোধ করত। এ যেন ঠিক অতীশদা নিজে তো শুধু প্রেমের অভিজ্ঞতায় পুড়ছে না, তাকে এক ধারাবাহিক ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শীর মত দাঁড় করিয়ে রেখে, তার মনে প্রেমের যন্ত্রণার তীব্রতাকে ক্রমান্বয়ে তীক্ষ্ণ তীক্ষ্ণতর করে তুলছে।

আর উৎসে আছে কে, এই সব কিছুরই? ছোড়দি। অতীশদা ছোড়দিকে ভালবাসছে, তাই?

কিন্তু যাই হোক, অতীশদার আশানুযায়ী কিছু হল না আপাতত এ মুহূর্তে। কারণ ছোড়দির পরিবর্তে মাকে ঘরে উপস্থিত হতে দেখা গেল। অতীশদার চোখের দিকে চাইলে বুঝতে কিছুমাত্র অসুবিধে হবে না, কিসের প্রত্যাশায় অতীশদার দৃষ্টি বারেকের জন্তে চায়ের কাপ থেকে ঘরে ঢোকবার দরজার দিকে ছিটকে গিয়েই, কোথাও ব্যাহত হয়ে, নিমেষে নিশ্চিহ্ন হয়ে মিলিয়ে গেল, চারিপাশের শূন্যতায় হারিয়ে গেল। ও যেন মজা পেল অতীশদার চাউনিতে। মনের ভাবনা কণ্ঠের শব্দ হয়ে বেরুলে বলতে পারত, সকালের আলোই বুঝি বা আচমকা অন্ধকারে অতর্কিতে আচ্ছন্ন হল। মনের মধ্যে এই মজার ভাবখানা খিলখিল হাসিতে যেন দ্বিগুণ হয়ে ফেটে পড়তে চাইল, যখন ও দেখল অতীশদা, আকণ্ঠ প্রত্যাশা চূর্ণ হওয়া সত্ত্বেও, সহজ হয়ে স্বাভাবিক কণ্ঠে মাকে বলছে, হ্যাঁ, আপনাকেই একটা দরকারি কথা জানাবার জন্তে এই সাতসকালে আসা, মাসিমা।

তুমি আসবে তা আবার সকাল বিকেল কি বাবা; তুমি কি আমাদের টাইম জানিয়ে আসবে নাকি—

এবার হাসি পেল মা'র কথা শুনে। মা আরেকবার 'টাইম' বলার সুযোগ পেল। অনেক চেষ্টা করেও মা'র মুখ থেকে এই 'টাইম' ছাড়াতে পারেনি। পুরনো দিনের কথা প্রসঙ্গে যখনই কথায় কথায় বাবার কথা উঠেছে, মা বলেছে, নেশা বটে! কিছুতেই বিড়ি ছাড়াতে পারলুম না, বলতে বলতে মা বাবার জীবনের শেষদিনগুলোর কথায় চলে আসে, গলা ভারি হয়ে ওঠে, চোখে আঁচল চাপে। ও মা'র কথায় বাধা দিয়ে বলেছে, আর তুমি নিজে? তোমার 'টাইম' আমরা ছাড়াতে পারলুম।

চোখে আঁচল চেপে রেখেই, মা গালের দুপাশে হাসির কটি অস্থায়ী রেখা ফুটিয়ে তুলে বলেছে, যা আর বকিস নে।

না, মানে, আমি তো কলকাতা ছাড়ছি, দিল্লী যাব আর কি; অতীশদার কথা থেকে মা নির্ভুল বুঝে নেবে, সব ঠিকঠাক করে, গুছিয়ে, আজই এই মুহূর্তে অতীশদা কলকাতা ছাড়ছে। ও মাকে কিছু একটা বলতে গিয়েও বলে না। চুপ করে থাকে। অতীশদার নেহাৎই প্রায় অর্থহীন কথাগুলোর প্রতিক্রিয়ার রূপ মা'র মুখে সহসা কেমন ফুটে ওঠে, তাই দেখবার জন্মে যেন প্রতীক্ষা করে।

কেন? কলকাতা ছেড়ে হঠাৎ একেবারে অতদুরে, মা'র কণ্ঠের অস্থিরতা, অসহায় ভাব বুঝতে তার সময় লাগল না।

ভাল চাকরি পাচ্ছি যে একটা, মাকে উৎসাহিত করার মত করে মুখে চোখে খুশির ঔজ্জ্বল্য এনে অতীশদা বলে, চেয়ার ছেড়ে একটু উঁচু হয়ে, মা'র দিকে মুখ এগিয়ে নিয়ে গিয়ে।

তা বলে কথাবার্তা নেই একেবারে অদ্দূর, অবিশ্বাসের দৃষ্টি পুরোপুরি মেলে ধরে মা কথা বলার সঙ্গে সঙ্গেই।

কিন্তু সুযোগটা নষ্ট করা কি উচিত হবে, ভেবে দেখুন।

বাড়ির মত পেয়েছ তো, না কি নিজেই?

আমার মত ছোট্ট খোকাকে বাড়িতে কেউ মত দিতে চায়?

ওই তো! দরকারি কথা জিজ্ঞেস করলেই তোমাদের আছে ওই। এই যে আরেকজন, কান খাড়া করে তোমার কথা শুনছে। তারপর একদিন সুযোগ পেলে দেবে শুনিয়ে, মা তার দিকে তর্জনী নির্দেশ করে বলে শেষের কথাগুলো।

না, আমি নিজেই ঠিক করে ফেললুম, মাসিমা।

আমাদের ভাবনা তো তোমরা কিছুতে বুঝবে না; অতদুর যাবে, সব ছেড়ে-ছুড়ে, দেখাশোনা করবে কে।

এইটা একটা খাঁটি কথা বলেছেন এতক্ষণে। সত্যি দেখাশুনো করার লোক যে দরকার, এটা তো উড়িয়ে দেবার মত নয়, মা'র মোক্ষম কথার পিঠে অতীশদা যে উদ্দেশে বলতে গেছে কথাগুলো তা কিন্তু নিষ্ফল হল। ছোড়দির এখন দেখা নেই ঘরে। অতীশদা বেচারা আরেকবার

দৃষ্টি নিয়ে গিয়েছে দরজার দিকে। অতীশদার মুখ দেখে মনে হবে, আসল কথাটা বলার এমন সুযোগ মেলা সত্ত্বেও বেঘোরে মারা গেল সব কিছু। এরপর ছোড়দি ঘরে ঢুকলে আর কি সুযোগ তৈরী করা যাবে কথাটা বলার। ঠিক এ মুহূর্তে ঘরের এই দৃশ্যের দিকে চোখ রেখে অতীশদা আর মাকে তার সমান অসহায় মনে হল। মনে হল মা এ মুহূর্তে শুধুই ভেবেছে কী শোনবার কথা আর কী শোনাচ্ছে অতীশ। মা'র নিশ্চিত ধারণা, অতীশদা তাঁর মাকে খুলে সব কিছু বলার পর, অতীশদার মা বলেছেন, যে-বয়সে আমি দেখেশুনে তোমার বিয়ের ব্যবস্থা করতে পারতুম তখন তোমার বিয়ে করার সময় ছিল না, আর এখন তুমি নিজে বিয়ের প্রয়োজন বোধ করছ, তাই এ-বয়সে তোমাকে বুদ্ধি দেবার কি-ই বা থাকতে পারে আমার। তুমি যদি মনে কর তুমি ভুল করনি, আমার মত আর আশীর্বাদ দু-ই পেলে জেনো। এই ছিল মা'র মনের একান্ত ধ্রুব বিশ্বাস। আর এমনই এক অতি শুভ সংবাদের গোড়াপত্তনের জন্যে এই সকালে অতীশদার আগমন। তা না কোথায় কি, হাজার মাইল দুরে, আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব, পরিচিত যারা আছে, বিশেষ করে তাদের ফেলে, সবাইকে ছেড়ে, ছুটল দিল্লী। আর এ-ব্যাপারে যিনি অতীশদাকে উৎসাহিত করছেন, মা যেন স্পষ্ট তাঁকে চোখের সামনে দেখছে, তাঁর নাম জেনেছে, মনে মনে তাঁকে রীতিমত তিরস্কার করছে তাঁর এই অসহযোগী কাজকর্মের জন্যে। আবার অতীশদার মুখে যে অসহায় ভাব তাতে শুধু মনে হবার কথা, ঠিক লোকটি কি ঠিক জায়গায় কিছুতেই যথাসময়ে উপস্থিত থাকবে না? খবরটা নিয়ে সাতসকালে এসেছে আসলে একজনেরই সঙ্গে দেখা করার প্রবল বাসনায়। ছোড়দির মন নতুন করে পরীক্ষা করার এ যেন এক বিরল সুযোগ। চাকরি নিয়ে দিল্লী চলে যাচ্ছে অতীশদা, আর চুপচাপ হাত পা গুটিয়ে নির্বিকার বসে আছে ছোড়দি। ব্যাপারটা অতীশদার পরিকল্পনা মত সাজালে দাঁড়ায় ঠিক এই। আর ওজর আপত্তি মা'র কাছে থেকে ওঠার আগে একশোখানা হয়ে উঠুক ছোড়দির কাছ থেকে। ছোড়দির কানে কথাটা শুধু একবার তোলা দরকার। ব্যস্, তারপর প্রয়োজন মত ইচ্ছানুযায়ী খুশি হওয়ার সব কথাগুলি একটি একটি করে বার করে নেবে ছোড়দির মুখ থেকে। কিন্তু কোথায় ছোড়দি? ঈর্ষা হয় অতীশদার ওপর।

কী ভীষণ কর্তৃত্ব করতে পারে অতীশদা ছোড়দির উপর। ছোড়দির মনের ওপর অতীশদার এই অসামান্য দখল কিন্তু তাকে মাঝে মাঝে বিড়ম্বিত না-করে পারে না, যে-মুহূর্তে সে স্মৃতিরেখার সঙ্গে তার নিজের সম্পর্কের ঘনিষ্ঠতার কথা চিন্তা করে দেখতে চায়। স্মৃতির মনের ওপর, স্মৃতির চিন্তায় তার দখল, তার প্রভাব কি এমনই অসামান্য। ছোড়দিকে পরাস্ত করার কোন চিন্তাই কোনদিন অতীশদার কাছে সমস্যা হয়নি। কিম্বা ঠিক পরাস্ত করার প্রশ্নই উঠেনি। ছোড়দির অহঙ্কারে দম্ভের কোন ঝাঁঝ নেই, তা তা'র ব্যক্তিসত্তার মান অভিমান, প্রেম ভালবাসা, তাদেরই কেন্দ্র করে শুধু মাত্র বিশেষ একটি পুরুষের সামনে তার কোমল চিত্তবৃত্তির পুর্ণ বিকাশের পক্ষে সময়ে সময়ে অপরিহার্য হয়ে ওঠে। আর স্মৃতির অহঙ্কারে ওর অনেক সময়ে মনে হয়েছে, মাথা উঁচু করে আছে কার্যকারণ চ্যুত দম্ভ। যাকে পরাস্ত করতে গিয়ে সে নিজের অক্ষমতা প্রবল অনুভব করেছে, আর অনুভব করার পরমুহূর্তেই সমস্ত পুরুষত্ব তার কেমন সঙ্কুচিত হয়ে গেছে। হয়তো স্মৃতির অহঙ্কারের পিছনে সুবিস্তীর্ণ পটভূমি হয়ে দাঁড়িয়ে আছে স্মৃতির বাবার, বিশেষ করে মা'র অভ্রংলিহ অহঙ্কার, আর তা যেন, সমাজে বিশিষ্ট পদমর্যাদার অধিকারিণী ভাগ্যবতীদের অন্যতমা বলেই, তাঁর সারা অঙ্গের অলঙ্কারের চেয়েও মূল্যবান। স্মৃতি এই পটভূমি থেকে বিচ্ছিন্ন হতে চাইলেও তাই বিচ্ছিন্ন হতে পারে না। কখনই বা অলক্ষ্যে যদি একবার গর্জে ওঠে খেয়াল খুশি মত নিজের কোন অজ্ঞাতে, আর দুচোখের দৃষ্টিতে করুণা ছিটোতে থাকে, তখন বাস্তবিক মনে হয় স্মৃতির সারা মুখে স্মৃতির মা'র মুখের ছায়া। আর স্মৃতিরেখার মা'র মুখ স্মরণ করেই আবার কেমন ছোট মনে হয় নিজেকে, কোথায় তার পৌরুষ সঙ্কুচিত হয়েছে, বেশ টের পায়। এসব কি তার হীনমন্যতারই লক্ষণ? সত্যি, বেশ আছে অতীশদা। ঈর্ষা করতে ইচ্ছে যায় অতীশদাকে। কেমন নির্দ্বন্দ্ব প্রেমে নিজেকে নির্ভরশীল রেখেছে। শুধু পায়ে পায়ে এগিয়ে যাওয়া, আর মাঝে মাঝে পিছন ফিরে দেখা দুর্ভাবনার, বাধা বিঘ্নের দীর্ঘ পথকে কত হ্রস্ব করে এনেছে। এ যেন দয়িত আর দয়িতার সমবেত কর্ম প্রচেষ্টার নির্ভুল যোগফল। স্মৃতি সব ব্যাপারেই ছোড়দির চেয়ে বহুগুণে অসামান্য, তাই তার শঙ্কা, সংশয় তাকে দুর্বল করে দেয়।

আর এ চিন্তায় যখনই মনে হয়েছে ছোড়দির তুলনাহীনা বাঁচার ভালবাসার অভীপ্সাকে অপমান করা হয়, তখুনি সমাধানের পথ খুঁজেছে অন্যত্র। ভেবেছে, পড়ত স্মৃতি অতীশদার মত পুরুষের পাল্লায়, তো উত্তরাধিকারী সূত্রে পাওয়া মা'র মোম-গলা ন্যাকামিঠাসা ভাবালুতা এক ধাক্কায় ছুটে যেত। আসলে অতীশদার চারিত্রিক দৃঢ়তা বা চরিত্রের কঠিন পৌরুষ তার মধ্যে শতাংশেও নেই। তার প্রেম কি অতীশদার প্রেমের মত নির্মোহ, নির্লোভ? এ-প্রশ্নের মুখোমুখি হলেই জবাব খুঁজতে তাকে হাতড়াতে হয় চারিপাশের অগাধ শূন্যতায়।

কোথায় ছোড়দি! মা চা করছিল। বৈদ্যনাথ অতীশদাকে দেখে খবর দেয়। মা বৈদ্যনাথকে দিয়ে চা পাঠিয়েছে। বৈদ্যনাথই চা দিয়ে গেছে তবে। মা চা করেছে আজ সকালে, কথাটা মনে পড়তেই খেয়াল হয় মা'র পুজোর দায়িত্ব আজ তো ছোড়দির কাঁধে। বৈদ্যনাথকে ডাকে, জিজ্ঞাসা করে, দিদিমণি কোথায় বৈদ্যনাথ?

প্রত্যাশিত উত্তরই বৈদ্যনাথের কাছ থেকে মেলে, পুজোয় বসছেন।

ও অতীশদার দিকে তাকায়। নিজে প্রত্যক্ষে না-জানিয়ে, পরোক্ষে জানাল ছোড়দির সংবাদ।

ও আর কিছু জিজ্ঞাসা করার আগেই অতীশদা বৈদ্যনাথকে বলে, বসছেন তো শুনেছি আকাশ ফর্সা হবার আগে, এখনতো রোদ উঠেছে, দেখ দিকি ওঠার কোন লক্ষণ দেখা যাচ্ছে কি না।

মা আর বৈদ্যনাথ দুজনেই হেসে ফেলে অতীশদার কথা বলার অধৈর্য ভাব ভঙ্গিতে। অতীশদাকে সান্ত্বনা দেওয়ার মত করে বৈদ্যনাথ মাথা কাত করে বলে, না, এইবার উঠছেন।

বৈদ্যনাথ চলে যাচ্ছিল, অতীশদা ডাকল, বৈদ্যনাথ একটা খবর তো পেলুম, আরেকটা খবর দিতে পার, তোমার দিদিমণি কি মিক্সচারের শিশি সঙ্গে নিয়ে বসেছেন।

কথাটা বলেই অতীশদা তাকায় একবার মা'র দিকে। কথাটা বলার সময় ঘরে মা'র উপস্থিতির কথা মনেই থাকে না বোধ হয় অতীশদার। তাই মা'র দিকে চেয়ে, ভুলের জন্যে ক্ষমা চায় নীরবেই, কেমন খাটো

করে বলে, কি পড়ল একটা মাথায় না ঘাড়ে, মাছের কাঁটার মত। কাকেই ফেলেছে বোধ হয়।

ঠিক ভেবে দেখ, মাথায় ফেলেছে না পায়ে মাড়িয়েছ ?—ও বলেছে অতীশদার মনোভাব বুঝতে পেরে।

না, খটকা রেখে কি লাভ, মাথায় গায় তো শুধু একটু জল ছিটোন; যা বৈষ্ণনাথ, গঙ্গাজলের শিশিটা একবার আনতে বল, বলে মা তাকায় বৈষ্ণনাথের দিকে।

অতীশদার প্ল্যান কখনো আনসাকসেসফুল হবার নয়। ছোড়দি মা'র কথা মত গঙ্গাজলের শিশি নিয়ে উপস্থিত হবে এখুনি। একটা মিক্সচারের শিশিতে মা গঙ্গাজল ভরে রেখে দেয়। প্রায় কারণে অকারণে অশুদ্ধকে শুদ্ধ করার প্রয়াসে মা গায়-মাথায় গঙ্গাজল ছিটোবে। মা'র শুদ্ধ করার, পবিত্র করার নিরন্তর প্রচেষ্টা, শুভ প্রয়াস; কিন্তু মাঝে মাঝে তার কাছে, অতীশদার কাছে প্রায় উৎপীড়নের সামিল হয়েছে। মা যখন গায়ে গঙ্গাজল ছিটোয় তখন অতীশদা অনিচ্ছা সত্বেও চুপ করে মেনে নেয়। আর মা'র পরিবর্তে ছোড়দি যদি ওই মিক্সচারের শিশিটা হাতে নিয়ে, মা'র দেওয়া নির্দেশ মত, গঙ্গাজল ছিটোতে যায়, অতীশদা সামনের দিকে দুটি হাত প্রসারিত করে কয়েক পা পিছিয়ে আসে, বলে, দেখ মাথা ছাড়া শার্ট ভেজে না যেন। আজতো ধোপদুরস্তই। খুব বেশি অশুদ্ধ আছি কি ? একটু অল্পস্বল্প করে শুদ্ধ কর আজ।

মাঝে মাঝে ছোড়দি এমন করে জল ছিটোবে যে বেশ বড় বড় জলের ফোঁটা সারা জামার নানা জায়গা অনেকক্ষণ ভিজিয়ে রাখবে। ওর তো প্রায় মায়া হয় অতীশদার দিকে তাকিয়ে। আর ও নিজে ? সোজাসুজি গিয়ে চেপে ধরে ছোড়দির হাতে-ধরা মিক্সচারের শিশি। একটু নড়তে চড়তে দেয় না। বাধ্য হয়ে ছোড়দি নিরস্ত হয়। কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে পারে বন্দী হয়ে এক জায়গায় ?

প্রথম যেদিন ওই মিক্সচারের শিশিতে গঙ্গাজল দেখে অতীশদা, ছোড়দিকে জিজ্ঞাসা করে, ইনফ্লুয়েঞ্জা মিক্সচার আবার কার জন্যে ?

ছোড়দি হেসে ফেলল, মুখে কিছু না-বলে তাকায় ওর দিকে। অর্থাৎ উত্তরটা তার মুখ থেকেই শুনুক অতীশদা। ও বলে, ওটা সর্ববিধ রোগের

পার্মানেণ্ট কিয়োরের মেডিসিন, একটু থামার অবকাশে অতীশদার মুখের দিকে চেয়ে অনুমান করে অতীশদা আন্দাজ করতে পারে যেন কী বলতে পারে ও।

অর্থাৎ? অতীশদার সকৌতুক প্রশ্ন সত্ত্বেও বুঝতে পারা যায়, ভাবতে পারেনি অতীশদা আশ্চর্য তরল পদার্থটি কি হতে পারে। ও কথা শেষ করে, বলে, অর্থাৎ বিশুদ্ধ পাপনাশক গঙ্গোদক, বুঝলেন কিছু?

দাঁড়াও, দাঁড়াও, একটু সময় লাগছে বুঝতে, গঙ্গাজল? মিক্সচারের শিশিতে?—অতীশদা তার ওপর থেকে চোখ তুলে নিয়ে ছোড়দির চোখে রাখে, আর সরায় না দৃষ্টি। ছোড়দি মাটি থেকে চোখ তুলতে পারে না। অর্থাৎ মা এমন এক একটা কাণ্ড করে বসবে, যার জন্যে অতীশদার সামনে ছোড়দি মাঝে মাঝে চোখ তুলে কথা কইতে পারে না পর্যন্ত। মাকে শুধু এই সব মুহূর্তেই ছোড়দি একটি বার মাত্র তিরস্কার করতে চায়। না হলে, মা এ যাবৎ সব ব্যাপারেই প্রায় নির্ভুল, ছোড়দির বিচারে অন্তত।

ওঃ হো, দাঁড়াও দাঁড়াও, এবার মাথায় এসেছে এতক্ষণে। খাঁটি গঙ্গাজল আর মিক্সচারের শিশি। পারফেক্ট কম্বিনেশন। তা ওই লেবেলটা তুললে কেন। বেশ তো ছিল, শেখ্ দি বট্ল বিফোর ইউ টেক মেডিসিন।

আর ওই ডোজের দাগগুলো?

তা বলে অত হাসি ঠাট্টা করার মত ব্যাপার কিছু নয়। আর লোকে গঙ্গাস্নানও তো করে, কেন করে শুনি? ছোড়দি উঁচিয়ে ওঠে, প্রশ্ন করে।

নিশ্চই করে, ভাল করে তৈলমর্দন করে কিংবা আরো স্বাস্থ্যকর পবিত্র গঙ্গার মাটি সারা দেহে মালিশ করে, আর যদি বল কেন করে, তারও জবাব আছে। কলকাতা শহরে যত সুবিধেই লোকে ভোগ করুক, জলের সুবিধেটা নিশ্চই ভোগ করে না। রাস্তার কলে কিউ-দেওয়া ছাড়াও আমার কাছে অ্যানাদার একজাম্পল্ আছে। একটা মেসের কথা জানি, ঠিকানা চাও তো-তাও দিতে পারি। একটি চৌবাচ্চায় ত্রিশজন মেম্বারের জন্যে মাথা পিছু এক মগ করে জল।

অতীশদাকে হাতজোড় করে থামিয়ে, ছোড়দি বলে, বক্তৃতা শেষ

হয়েছে? ঠিকানা টিকানা কিছু চাইনা, আপনি দয়া করে থামবেন এখন?

দয়া চাইলে অবিশ্যি আমি চিরকালই দয়া করে থাকি। অতএব দয়া করেই থামি, কি বল? ওর দিকে চেয়ে কথা শেষ করে অতীশদা।

দয়া না হাতি আর কিছু, ছোড়দি বিশেষ একটি মুখভঙ্গি করে, শেষ চেষ্টার মত বলে। কারণ শেষ পর্যন্ত ছোড়দির জেতা চাই-ই। অতীশদারও অজানা নয় এটা। তাই চুপ করে যায়। ছোড়দি কথাগুলো বলার শেষে সলজ্জ দৃষ্টি ঢাকতে পারে না। তাই ছোড়দির চোখে চোখ রাখে না, অতীশদার চোখেও নয়। বরং ওর অলক্ষ্যে ছোড়দি আর অতীশদাকে দৃষ্টি বিনিময়ের চকিত সুযোগটুকু দেয়।

কিছুক্ষণের মধ্যেই ছোড়দি এসে দাঁড়ায়, ঘাড় গলা থেকে পায়ের পাতা পর্যন্ত আপাঙ্গ ঢেকে মা'র পুজো করার গরদে। বেশিক্ষণ দাঁড়াতে পারে না এরকম অবস্থায়, অতীশদার সামনে বিশেষত সম্পূর্ণ অন্তর্বাস ব্যাতিরেকে। কেমন এক আড়ষ্ট ভাব ছোড়দির অঙ্গপ্রত্যঙ্গ যেন শিথিল করে রাখে, নিশ্চল করে রাখে স্বাভাবিক গতি, চলা বা হাত-পা নাড়া, যতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে ছোড়দি।

ছোড়দি ঘর থেকে বেরুবার আগেই কিন্তু মাকে প্রস্থানোদ্যত মনে হয়। যাবার আগের মুহূর্তটিতে ঠিক মা দাঁড়িয়ে পড়ে দরজার বাইরে একটি পা ফেলে, বলে, আমার কথা কিন্তু বাবা ওই, হুটপাট করে কিছু করে বোস না। সব কিছুর ভালমন্দ দেখে তবে কাজ করতে হয়, উপদেশ দেওয়ার ছলে মা কিন্তু প্রকারান্তরে নিজের অনিচ্ছা বা অমতের কথাটাই জানিয়ে দিয়ে যায়।

ছোড়দির মুখ দেখে মনে হয়, মা'র সব কথা শোনেনি, কেমন একটা বিশেষ কৌতূহল বোধ করেছে, কী হতে পারে ব্যাপারটা।

অতীশদা স্বেচ্ছায় বিলম্ব করেছে। মা যখন ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেছে, তখনই বলেছে অতীশদা, মাকেই উদ্দেশ্য করে যেন, না, আমি ভেবে চিন্তেই সব ঠিক করে ফেলেছি মাসিমা, যাওয়া ছাড়া আর গত্যন্তর নেই।

অতীশদার ঐকান্তিক ইচ্ছেটা পূর্ণ হয়েছে, কারণ অতীশদার কথা কটি

সব শুনে ছোড়দি আস্তে আস্তে ঘর থেকে বেরিয়েছে। আর ও লক্ষ্য করেছে ছোড়দির নিচু করা মুখে ক্ষণভঙ্গুর চিন্তার অস্পষ্ট ছায়া। মা'র দেওয়া সুযোগের অপব্যবহার করেনি অতীশদা। তাই অতীশদার মুখে চোখে আত্মতৃপ্তির স্বচ্ছ রেশটুকু লেগে থাকে। ওর দৃষ্টি তা কিছুতেই এড়াবার নয়।

আর এরপরই যে নিশ্চিন্ত ভঙ্গিতে অতীশদা চেয়ারে গা এলিয়ে দিয়ে ওর বইয়ের টেবিলের ওপর জোড়া পা লম্বা করে তুলে দেয়, তাতে মনে করা অসঙ্গত নয় যে অতীশদাকে ভূমিকারই জন্যে শুধু এত সময় আর শক্তি ব্যয় করতে হয়েছে এতক্ষণ। এবার যেন অতীশদা সক্রিয় অংশের জন্যে নিজেকে তৈরী করে নেবে। ছোড়দি কাপড় পালটে এখুনি ফিরবে। অতীশদাও আসল পর্বের জন্যে মনে মনে নিজেকে প্রস্তুত করছে।

অতীশদার মনোভাব ধরেও ধরতে পারে না বুঝি। মাকে যা বলল তাতে যে কেউ-ই বিশ্বাস করবে অতীশদার দিল্লী-যাওয়া প্রায় নব্বুই ভাগ স্থির। অতীশদার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়ে গেছে। আবার ছোড়দির অনুপস্থিতি হেতু অতীশদার যে অসুবিধে তাতে ব্যাপারটাকে অন্যরূপ দেওয়া হয়ত অসঙ্গত নয়। বিশেষ করে মা'র ঘর ত্যাগ করার সময়টিতে ছোড়দির উদ্দেশ্যে অতীশদার কথাগুলো, আর কণ্ঠের স্বরে সেই কথাগুলোর ওপরই অপ্রয়োজনীয় জোর-দেওয়া। অতীশদার সিদ্ধান্ত গ্রহণের গুরুত্ব এক মুহূর্তে লঘু হয়ে যায়, কণ্ঠের গাম্ভীর্য হঠাৎই বা ছিঁড়ে লঘু হয়ে পড়ে, বিমূঢ় হওয়ার বুঝি কিছু বাকি থাকে না আর।

মা'র চলে-যাওয়া আর ছোড়দির ফিরে আসার অবকাশের ফাঁকটুকুতে তাই ও অতীশদাকে খুঁচিয়ে আরেকবার জিজ্ঞাসা করতে চায়, আসলে কি মতলব তাঁর? সত্যিই কি যাচ্ছেন? তা হলে কবে? ভেবে দেখার সঙ্গে সঙ্গেই প্রায় ও জিজ্ঞাসা করে, আপনার যাওয়া কি তবে সত্যিই সব ঠিক?

ঠিক মানে, এই তো দেখছ। দোমনা হয়ে কিছু করা যায়—

না মানে আপনার মা'র সঙ্গে কথাবার্তা হয়ে গেছে, মা'র কথাটাই ফিরে জিজ্ঞাসা করে।

গেলে কি আর মা এখন আটকাবে, না আটকাতে পারবে।

তবু তো আপনাকে ফরমাল কনসেণ্ট নিতে হবে।

মা'র কনসেণ্ট ? ওটা তো পাওয়ার কোন কথা নয়, ওটার জন্যে অপারচুন মোমেণ্টের দরকার।

তাহলে ওটা আপনার ভাবনা নয় ?

না, আমার ভাবনা ঘোষচৌধুরির কথাটা নিয়ে। একে প্রায় কর্ণধারদের একজন, তার ওপর আমাকে এক রকম অনুরোধই করছেন বলতে গেলে।

ও! যে-ঘোষচৌধুরির কথা প্রায়ই বলেন আপনি ?

হ্যাঁ, ঘোষচৌধুরিই বলছেন বার বার দিল্লী যাওয়ার জন্যে। কিছু খুঁটিনাটি জিজ্ঞাসা করতে গেলেই বলেন, হোয়াট আই সাজেস্ট্, আই সাজেস্ট্ ফর ইয়োর গুড। ইমিডিয়েট এফেক্টটা ঠিক এই এক্ষুণি হয়তো কিছুই নয়, কিন্তু, বাট ইউ উইল আণ্ডারস্ট্যাণ্ড্ ইট সুন (কেমন সস্নেহে পিঠের ওপর আস্তে চাপড় মারেন), বুঝলে বোস—ঘোষ চৌধুরির কথা ফেলার মত সাহস পাচ্ছি কোথায়—কথা শেষ হলে অতীশদার মুখে চোখে দোটানা মনোভাবের কথা স্বচ্ছ লেখা দেখতে পায়। বুঝতে পারে কিছু একটা ঘুরপাক খাচ্ছে মনের মধ্যে।

ছোড়দি ঘরে ঢোকে সম্পূর্ণ বেশ পরিবর্তন করে। কেমনই নতুন মনে হয় ছোড়দিকে এক পলক, হালকা নীল রঙের শাড়ির আড়ালে হলদে ব্লাউজে। কিছুক্ষণ আগের দেখা মা'র গরদের থানে ঢাকা যাকে দেখেছিল তার সঙ্গে এই ছোড়দির কিন্তু বিস্তর পার্থক্য। এই নীল রঙের শাড়ি আর হলদে রঙের ব্লাউজে, এলোমেলো চুল সামান্য গুছিয়ে যে-মেয়েটি এসে দাঁড়ায় তার নাম পারুল, পারুল রায়। যেন সেই কিছুক্ষণ আগের দেখা মেয়েটির নাম একেবারেই ভিন্ন। যে-বয়সে মেয়েদের বিয়ে হয়, সত্যিই বলতে কি, আর সব কিছু গুণ বাদ দিয়ে, শরীরের যৌবনকে লাবণ্যময় করে তুলে, একটি বাঙালী সাধারণ মেয়ে একটি সম্পূর্ণ বা প্রায় অপরিচিত পুরুষের দৃষ্টিতে নিজেকে ভাল-লাগার ভালবাসার বস্তু করে রাখতে চায়, অন্তত এক যুগ কালও, সে বয়স অনেকদিন পেরিয়ে এলেও ছোড়দির শরীরের যৌবন থেকে লাবণ্যশ্রী কিন্তু এক পা-ও দূরে ছেড়ে যায়নি। আর মাঝে মাঝে অতীশদার বিহ্বল দৃষ্টির দিকে নজর

রেখে তার এ বিশ্বাস ও সত্যকে আরো বেশি বিশ্বাস করতে মন চায়, আরো গভীর সত্য বলে মনে হয়। অতীশদার চোখের ভাষা পড়ে পড়ে সে এখন অভ্যস্থ। অনেকে আছে যাদের চোখের দৃষ্টিতে কণ্ঠের আওয়াজ ফোটে। তারা নীরব থেকেও অসাধারণ বাঙ্ময়, চোখের এক পলক চাউনিতে, বা দৃষ্টির অন্যমনস্কতা, গম্ভীর শূন্যাভিমুখী উদাসীনতার নাতিহ্রস্ব স্থায়িত্বে। যদিও অতীশদার চোখ ঢাকা পড়ে থাকে পুরু চশমার কাচের নিচে। তবু সেই চোখের দৃষ্টি যাদের অচেনা নয় তারা জানে, অতীশদার অস্বচ্ছ দৃষ্টিতে স্বচ্ছতার বহুবর্ণ আলো এসে ঠিকরোবে, যখন ছোড়দি হঠাৎ বা প্রয়োজন বোধে এমন করে বেশ পরিবর্তনের পর উপস্থিত হবে, হলদে ব্লাউজের ওপর হালকা নীল রঙের শাড়ি চাপিয়ে। আর নিজের উপস্থিতির সঙ্গে সঙ্গেই ছোড়দি ঘরের চেহারা যেন পালটে দেবে, ঘরের লোকদের বিশেষ কারো দৃষ্টিই বা সারা মুখের চেহারাই হয়তো পালটে দেবে। অতাশদার চোখ ছোড়দির সরু কোমর বেয়ে সুগঠিত নিতম্বের ওপর খানিক নিবদ্ধ থেকেই হয়তো উর্ধ্বমুখী হল। গলা আর বুকের উজ্জ্বল শ্যামলাভ খোলা অংশটুকুর ওপর যেখানে একটি অনুজ্জ্বল সোনার হার ঝুলছে, সেখানে ঘোরাফেরা করে। তারপরই হয়তো চকিতে কপাল আর চোখের ওপর থেমে থাকতে থাকতে সেই ভ্রাম্যমান দৃষ্টি কেমন মুগ্ধ হয়ে উঠবে। আর সেই বিহ্বল মুগ্ধ দৃষ্টি তার ছায়া পড়েছে কিনা ছোড়দির স্বচ্ছ গভীর কালো চোখের অতলে, তা-ই আবিষ্কার করবে। ছোড়দি গর্বের খুশির আভাস দেবে কয়েক পলক চোখের পাতা তুলে বা নামিয়ে। তারপর দেয়ালের চারপাশে ঘোরাবে চোখের দৃষ্টি। বোঝা যায় নিজেকে কেন্দ্র করে খুশির গর্বের দৃষ্টিকে কখন নম্র নিবিড় লজ্জা নিঃসাড়ে আচ্ছন্ন করেছে। ছোড়দি খুশি হয়ে লজ্জা পেয়ে, এমন লজ্জা দেওয়ার জন্যে সমস্ত প্রাণ ভরে অতীশদাকে কৃতজ্ঞতা জানিয়েছে মনের গহন নিভৃতে। আর অতীশদা অমন খুটিয়ে ছোড়দিকে তন্ময় চোখে দেখার জন্যে কখন বা বিশেষ সচেতন হয়ে উঠেছে, প্রয়োজন বোধ করেছে কিছু একটা বলার, কোন একটা সাময়িক স্বল্পস্থায়ী অস্বস্তি থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্যেই।

ঘোষচৌধুরি কথাটার ওপর জোর দিচ্ছেন প্রায়ই। আর ইণ্টারভিউটা যে নমিনাল সেটাও বলেছেন উনি। তাই মনে করছি,

না-যাওয়ার রিস্ক কিন্তু পুরোপুরি আমার। উনি কদিন ধরেই বলছেন; শুধু ভেবে দেখা নয়, মন ঠিক করে ফেলা। কি করা যায় এখন—দুহাতের তালু দিয়ে গালের দুপাশ ঘষতে ঘষতে মুখটা নিচু করে কথাটা এমন ভাবে ছুঁড়ে দেয় অতীশদা, যে-কেউ লুফে নিতে পারে। আর লুফে নেওয়ার কথা ছোড়দির।

ছোড়দি বলেছে, ব্যাপারটা কী বলুন তো, মাথায় কিচ্ছু ঢুকছে না।

অতীশদার চাকরির ব্যাপার। দিল্লী যাচ্ছেন। মাকে আর আমাকে সে-কথাই বলছিলেন এতক্ষণ, গম্ভীর হয়ে ও উত্তর দেয়, অতীশদার হয়ে, ছোড়দির কথার।

দিল্লী যাচ্ছেন। কী মতলব আপনার? আমি পরীক্ষা দেব কি দেব না বলুন, বিস্ময় আর অভিমানের সহমিশ্রণ ধ্বনিত হয় ছোড়দির গলার স্বরে।

যাচ্ছি বোল না, ধর চলে গেছি, আর দিল্লীতে বসেই তোমার সঙ্গে কথা বলছি, সামান্য কটি ক্ষণ অতীশদা ছোড়দির মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে, চোখ মুখের ভাষাবদলের দিকে নজর রাখতে রাখতে আবার বলে, আর আমার মতলব কী তা যদি অ্যাদ্দিনেও না-বুঝে থাক তো আর বুঝে কাজ নেই, অতীশদা চুপকরার ভাব দেখালে, ছোড়দির লক্ষণীয় পরিবর্তন এবার কিন্তু প্রকট হয়ে উঠল আর ছোড়দির লজ্জা তাকেও স্পর্শ না করে পারে না, আর সেই লজ্জার উষ্ণতা সে শিরায় অনুভব করতে পারে।

গলার স্বর পালটে নেওয়ার মত করে অতীশদা বলে, আর, পরীক্ষা তোমার না-দিলেও চলবে। তুমি একটা এক্সপেরিমেণ্ট করে দেখ না। দেখবে পরীক্ষা ঠিকই হয়ে গেছে, আর পাসও করে গেছে অনেক ছেলেমেয়ে, অতীশদা আবার থামলে বোধ হয় কথা খোঁজবার জন্যে, আর দেখল ছোড়দির দৃষ্টিতে ভর্ৎসনার সঙ্কেত। ছোড়দিকে এমন অবস্থায় দেখলে মনে হবে তফাৎ কিছু নেই তার সঙ্গে স্মৃতিরেখার। ওরা আসলে দৈনন্দিন হাজার ব্যবহারে কথায় এমন কি চলাফেরায় একটি ছবিকেই পুরুষের চোখে অপরিবর্তিত রেখেছে। প্রেমিককে ভর্ৎসনার দৃষ্টি পাকিয়ে কেমন করে শাসন মানাতে হয় তা সব প্রেমিকাই প্রায় নিখুঁত শিখেছে।

ভর্ৎসনার দৃষ্টিতে উৎসাহের কি ইঙ্গিত ছিল, অতীশদাই ধরতে পারে।

সেই উৎসাহে আর কথা খুঁজে পাওয়ার আগ্রহে অতীশদা বলে, আর, পরীক্ষা না-দেওয়াই ভাল।

মানে ?

মানে, রিস্ক কম আর কি।

রিস্কের কি আছে ? কণ্ঠের স্বরের জন্যে ছোড়দির মুখ থেকে ইংরেজি কথা শুনতেও খারাপ লাগে না।

বা! রিস্ক নয় ? পরীক্ষা না-দিলে ফেল করার চান্সও নেই।

এ আর কি নতুন বললেন, সবাই জানে।

একমাত্র পরীক্ষা দেওয়াটাই তো নতুন, আর তা ছাড়া এপর্যন্ত সবই পুরনো। নতুন বলার স্কোপ কই।

একটি লোকের সামনে অন্তত দমবার পাত্রী ছোড়দি কোন কালেই নয়। বিশেষ করে এমন সব ক্ষেত্রে ছোড়দি যা করে থাকে বরাবর তার অন্যথা কিছু হল না। প্রতিযোগীর মত জোরাল কণ্ঠে প্রতিযোগিতায় আহ্বানের মত করে বলে, পরীক্ষা দিয়েছি আমি, আর আমিই তো পাস করেছি।

তাতে কোন সন্দেহ নেই। তবে ঠেলতে যা হয়েছে না আমাকে! একটা ডবল ডেকার স্টার্ট না-পেলেও বোধ হয় অত জোর ঠেলতে হয় না।

দেখুন বাজে কথা বলবেন না। আমি পাস না করলে আপনি পাস করাতে পারতেন ? স্বভাবসিদ্ধ প্রথায় যখন রাগ করে ওঠে ছোড়দি, তখন আবার ছেলেমানুষ মনে হয় ছোড়দিকে ভীষণ।

আমি তো কোন ছার, বিশ্ববিদ্যালয় পারত। যদি মনে কর একবার পাস কর—বো—না, অতীশদা টেনে টেনে বলে, কার সাধ্যি।

থামুন আপনি, অনেক হয়েছে, ছোড়দির দাঁড়ানোর ভঙ্গিতে এবার প্রস্থানের আচরণ ফুটে ওঠে।

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে আলসেমি-ভাঙার ঢঙে পিঠ বেঁকিয়ে হাত ওপরে তুলে অতীশদা বলে, আমিও উঠব, তবে থামবার আগে শুধু একটা কথা বলব, এই আমার পাশাপাশি ঘুরেছ বলেই পাসটাও করেছ, কথার শেষে অতীশদা তর্জনী দিয়ে নিজের চারপাশে শূন্যে অর্ধবৃত্ত আঁকে।

ছোড়দি ঘরের বাইরে চোখের আড়াল হলে, অতীশদা সত্যিসত্যিই দরজার দিকে এগুলে প্রস্থানের জন্যে। ঘরের বাইরে পা দেবার ঠিক শেষ মুহূর্তে পিঠের ওপর গুটিয়ে যাওয়া শার্টের নিম্নভাগ টেনে দিতে দিতে তার দিকে একবার চাইলে। অতীশদা কথা বলেনি আর একটিও। অতীশদার নীরব চাউনি অর্থপুর্ণ মনে হয়েছে। মনে হয়েছে ছোড়দির প্রেমকে বাজিয়ে দেখার ফিকির খুঁজছে, আবার কোন নতুন পদ্ধতি খুঁজে বার করেছে নিজের কৌশল প্রয়োগের জন্যে। আর সে কৌশল আশ্চর্য ফলদায়ক তারই প্রমাণ পেয়ে গেল এক্ষুণি হাতে নাতে। ও যদি অতীশদার অর্থপুর্ণ দৃষ্টির সবিশেষ সঙ্কেত ধরতে পারে, তবে প্রত্যুত্তরে যে দৃষ্টি সে এইমাত্র তুলেছে অতীশদার চোখে তার অর্থও অতীশদা নির্ভুল পড়ে যাক। সে বলতে চেয়েছে, আর কেন অতীশদা, অনেক তো হয়েছে (দিবসরজনী বছরের পর বছর তোমাদের এই প্রেমাভিনয় দেখে আমার দুচোখ কি এখনও ক্লান্ত হয়নি মনে করো। নীরব শান্ত ধৈর্যশীল দর্শকের ভূমিকা আমার কবে শেষ হবে)!

আজকের মত অতীশদা উঠল তা হলে সত্যিই। কথা শেষ হল অতীশদার, কাজও ফুরোল। কথা না-হয় শেষ হল, কিন্তু কাজ কি সত্যিই ফুরোল। কি কাজের জন্যে এসেছিল অতীশদা? চাকরির প্রয়োজনে দিল্লী যাবে, সে কথাটাই জানাবার জন্যে এত সকালে ছুটে এসেছে একজনের কাছে। অর্থাৎ দিল্লী যাত্রা করার পথে একজনের কাছ থেকেও অন্তত প্রবল বাধা আসুক যাতে যাত্রা স্থগিত রাখতে হবে। মা'র সঙ্গে এমন কি তার সঙ্গে যতটুকু কথা কইল তা থেকে তার যে ধারণাটুকু স্পষ্ট হয়েছিল, ছোড়দির উপস্থিতিতে অতীশদার ব্যবহার ও আচরণে সে-ধারণার গুরুত্ব কেমন অক্লেশে একটি মুহূর্তে লঘু মনে হল। এই জন্যেই কি এমন সাতসকালে অতীশদা ছোড়দির খোঁজে এসেছে, ছোড়দির অনুপস্থিতিতে সাময়িক অস্বস্তি ভোগ করেছে। তারপর দেখা মিলেছে ছোড়দির, সব কথার শেষ কথাও বলা হয়ে গেছে অতীশদার। তবে যে-কাজের জন্যে এসেছিল সে কাজ ফুরোয়নি এমন ভাবটাও তো অসত্য। অতীশদার আর ছোড়দির প্রেমের কথাটা ভাবতে ভাবতে ভাবনার সঙ্গে অবিচ্ছিন্ন এক কৌতুকে হাসল আপন মনে; গেঞ্জিটা গা থেকে খুলে মাথার ওপর টেনে

এনেছে, মুখটা ঢাকা পড়েছে গেঞ্জির গহ্বরে। ঘরে ঠিক এই মুহূর্তে কেউ ঢুকে পড়লেও ধরতে পারত না মুখের হাসি, আন্দাজই করতে পারত না তার মনের ভাবনাটা কি হতে পারে।

এরপর দুচারটে দিন কেটে গেছে, আরও দুচারটে দিন কেটে যায় যায়, এমনি সময় বুঝি নজরে পড়ল অতীশদার অনুপস্থিতি। সেই খবরের পর আর অনেক দিন তো দেখা নেই। মা একটু আধটু কি বলতে চেয়েছে যেন, সে তো নয়ই, ছোড়দিও কানে তুলতে চায় না। তাদের যেন বোঝা হয়ে গেছে কতদূর যেতে পারে অতীশদা। বাইরে যত কিছুই দেখিয়ে বেড়াক, যত তোড়জোড় করুক, মনের আসল ইচ্ছেটা কিন্তু সেই সেদিনের সকালে অতীশদা জানিয়ে গেছে। তার মনে যেটুকু প্রশ্ন জেগেছিল তারও নিষ্পত্তি ঘটেছে যখন অতীশদা আর ছোড়দির আলাপে সে কান দিয়েছে। ছোড়দির অন্যমনস্ক ভাবভঙ্গি, গাঢ় দৃষ্টির মৌন নির্লিপ্তি কখন সখন যে তার চোখে পড়েনি তা নয়, ভেবেছে ছোড়দি নিঃসংশয় এক রকম।

কিন্তু আজ এই সন্ধ্যায় অতীশদার বাড়ির লোকটাকে এমন ব্যস্ত হয়ে অতীশদারই খোঁজে আসতে দেখে একটু চিন্তিত হল। আধশোয়া অবস্থায় ও শরীর এলিয়ে রেখেছিল বিছানায়; প্রথামত সিগারেট ধরিয়েছে, কারণ, শুধু আলস্য আরামই এই অর্ধশয়নের একমাত্র উদ্দেশ্য নয়, বহুদিনের ফেলে-রাখা, অসমাপ্ত একখানি উপন্যাস শেষ করার চেষ্টাও। বইখানা শুরু করার ইতিহাসও আজ অস্পষ্ট স্মরণ করতে হয় বুঝি। ভুলেই গেছেন স্মৃতির ছোটমামা যে একদিন সন্ধেবেলা স্মৃতিদের বাড়িতে যখন ও স্মৃতিকে পড়াতে যায় সে দিনই বইখানা তাকে পড়তে দেওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। ইচ্ছা প্রকাশ করেন বললে হয়তো সবটুকু বলা হয় না, কারণ সাহিত্য তত্ত্বের ব্যাখ্যায় তার রাজনৈতিক পটভূমিকা যে সম্পূর্ণ নিষ্প্রোয়জন, এই যুক্তির সপক্ষে তাকে উপদেশও দেন একখানা বই পড়ার। যে ইংরেজ লেখকের নাম ছোটমামা করেন তাঁর নাম সত্যি বলতে ও আগে শোনেনি। আর যথাসময়ে তাকে বইখানা পৌঁছে দেন স্মৃতিরেখা মারফৎ। বইখানা স্মৃতিরেখার হাত থেকে নেওয়ার সময় তার চোখের ভাষায় কি পড়েছিল তাও মনে করতে পারে এখন বিনা আয়াসে। স্মৃতি তার হাতে বইখানা তুলে দিতে দিতে বলেছে, এই নিন, ছোটমামা দিয়ে

গেছে, আপনাকে দেওয়ার জন্যে। আপনার জন্যে অনেকক্ষণ বসে ছিল। স্মৃতি বলেছিল শুধু এইটুকু। আর যা বলেনি", তারই মধ্যে প্রচ্ছন্ন রেখেছিল তার জ্ঞানবুদ্ধির ওপর অগাধ মোহাচ্ছন্ন বিশ্বাস। তার স্পষ্ট মনে হয়েছে, স্মৃতি বলতে চেয়েছে, এইবার দিন তো ছোটমামাকে একবার ভাল করে বুঝিয়ে, ছোটমামার জ্ঞানবুদ্ধির দৌড় কতখানি। চালাকি আপনার সঙ্গে! আর ঠিক পরমুহূর্তেই ভেবেছে যে ছোটমামা কেমন এক স্নেহ সহানুভূতির প্রেরণায় তাকে স্মৃতিরেখাদের বাড়িতে এনেছেন, আর সেই স্মৃতিরেখার সহানুভূতি কবে এক সময় শ্রদ্ধার বেশে ছোটমামার সহানুভূতিকেও অতিক্রম করেছে। আর এইখানেই বুঝি ছোটমামার উদ্দেশ্যর চরিতার্থতা।

স্মৃতির ছোটমামার দেওয়া সেই বইখানাই খোলা চোখের সামনে, আর আধশোয়া অবস্থায় ও নিজে খানিক পড়ছে আর খানিক জুড়ছে টুকরো টুকরো এলোমেলো স্মৃতির ছিন্নাবশিষ্ট। সে ভেবে দেখেছে, যে উদ্দেশ্যে ছোটমামা তাকে পড়তে দিয়েছেন বইখানা তা কি কোনদিনও সিদ্ধ হবে, তার পড়ার গতি দেখে তার নিজেকে সন্দেহ করার যথেষ্ট কারণ ঘটেছে। আর এখুনি তার এ কথাই মনে হচ্ছিল, ছোটমামার প্রতি যে-অবিচারই করে থাক, লেখকের প্রতি অবিচার করার কোন ন্যায়সঙ্গত অধিকার তার নেই, অন্তত এ কালের পাঠক হিসাবে। এই রকম সব অনেক টুকরো ছেঁড়া হারানো কথা স্মৃতি এসে এসে কখন একটা সম্পূর্ণ ছবিকে গাঁথছিল, কখন বা ছবিটা সম্পূর্ণ হতে পারছিল না, সব দরকারি কথা বা স্মৃতি ঠিকমত খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না।

এমনি সময় অতীশদাদের বাড়ির লোকটা সরাসরি সামনে তাকে পেয়ে জিজ্ঞাসা করে, বড়দাদাবাবু কি আপনাদের এখানে এসেছেন নাকি? মা খোঁজ নিতে বললেন, বেশ পরিচ্ছন্ন উচ্চারণে শুদ্ধ করে কথা বলে লোকটা। একেবারেই তাদের বৈদ্যনাথের মত নয় আর কি। ওর কথার ভঙ্গিতে সে ও অর্ধশয়ন ত্যাগ করে পিঠ সোজা করে উঠে বসে বিছানার ওপর। লোকটার সমস্ত অবয়বে কণ্ঠস্বরে বাচন ভঙ্গিতে কি এমন একটা আছে যাতে বিশ্বাস করা কঠিন ও নিছক বাড়ির ভৃত্য। তার আসার গুরুত্ব তাই কিছুটা কৃত্রিম উপায়েই হয়তো চোখমুখের ব্যস্ততায় ও গাম্ভীর্যে

ফুটিয়ে তোলে, বলে, কই অনন্ত, অতীশদা তো একবারো আসেনি আজ। ক'দিন ধরেই তো দেখা নেই।

না, এ কদিনই দেরি করে ফিরছেন। আজ একটু বেশি দেরি হচ্ছে বলে মা ব্যস্ত হচ্ছেন, খুব স্পষ্ট করে ছেড়ে ছেড়ে, কণ্ঠে কেমন ব্যাকুলতা ফুটিয়ে কথা বলে অনন্ত।

অনন্তর গলার শব্দ পেয়ে ছোড়দি কখন এসে হাজির হয় ও জানতেই পারে না। হঠাৎ লক্ষ্য করল অনন্তর দৃষ্টি তার মুখের ওপর থেকে সরে অন্যত্র গেছে, আর সে দৃষ্টিতে সম্ভ্রম মেশানো জড়তা। ও ডান দিকে পিছনে ঘাড় ফিরিয়েই দেখে ছোড়দি। ছোড়দিকে দেখেই এ মুহূর্তে যে-কথাটা তার সবচেয়ে দরকারি মনে হল, তা-ই বুঝি সে বলে ফেলল, বৈদ্যনাথকে একবার ছেড়ে দে, অনন্তর সঙ্গে একবার যাক অতীশদা এখনও বাড়ি ফেরেন নি, একটা খোঁজ পাঠান দরকার। তবে ভাববার কিছু নেই অনন্ত এ রকম দেরি অতীশদা এর আগে কম করেনি, শেষের কথাগুলো অনন্তর দিকে তাকিয়ে তাকেই লক্ষ্য করে বলে।

সে তো বলে যান, আজ তো বলে কয়েও জাননি, কথার শেষে পরিমিত হেসে অনন্ত ছোড়দির দিকে তাকিয়ে, খানিকটা সমর্থন পাওয়ার আশায়, আর খানিকটা বুঝি জানাবার জন্যে যে, সে ও-বাড়ির পুরনো লোক।

কথাগুলো বলে ও নিজে ভেবেছে এ ক্ষেত্রে ওর দায়িত্ব যথাযথ পালন করেছে। ওর দায়িত্বজ্ঞান যে বাড়ির কারো চেয়ে কিছু কম নয় এইটাই ও বাড়ির দুটি প্রাণীর মধ্যে বিশেষ করে একজনকে বুঝিয়ে দিতে চায়। আজও অনেকটা সেই মনোভাব নিয়েই বলতে গেছে ছোড়দিকে, অর্থাৎ বৈদ্যনাথকে এখুনি একবার পাঠিয়ে দাও তোমরা, খবরটা দিয়ে আসুক, খোঁজও একটা নিয়ে আসুক।

অবাক হয়ে যাই, বসে বসে সব উপদেশ দেবে। বৈদ্যনাথ যাবে কেন, তুমি যেতে পার না? তোমার কি হাত পা নেই? বুদ্ধি সুদ্ধি কি সব লোপ পেয়েছে, না কি? ছোড়দির তিরস্কার সামলে নিতে সামান্য কটি মুহূর্ত সময় নিতে হয় বইকি। মোটামুটি বোঝা যায়, ছোড়দির কথা মত দায়িত্বের সিকিভাগও পালন করেনি। আসলে উপন্যাস ছেড়ে উঠতে কেমন এক ধরনের আলসেমি বাধা হয়ে উঠেছে। ছোড়দির তিরস্কার

হজম করা অভ্যেস আছে, কিন্তু তারই ঝাঁঝ যে লোক বুঝে এমন জোরাল হয়ে ওঠে তা মাঝে মাঝে বেশ টের পায়। বৈদ্যনাথের সামনে এমন তিরস্কার অনেক শুনেছে ছোড়দির মুখ থেকে, গায়েও মাখেনি, তিরস্কার বলেই মনে করেনি। শুধু হয়তো রাগ করে বলেছে বৈদ্যনাথকে, তুই দাঁড়িয়ে হাঁ করে কি দেখছিস—বৈদ্যনাথ বোকার মত হেসেছে একটু, বলেছে উল্টে রাগ করার মত করে, আমি কেন হাসতে যাব? আমি পয়সা নিবো বলে দাঁড়িয়ে আছি।

কিন্তু অনন্ত কি ভাবল। ও অনেক চালাক চতুর বুদ্ধিমান। অনন্তকে তো কিছুতেই বৈদ্যনাথ মনে করা যেতে পারে না।

আচ্ছা অনন্ত তুমি যাও, এসেও যেতে পারেন এর মধ্যে। হয়তো গিয়ে দেখবে এসে গেছেন। আমি যাব একবার, বিছানা ছেড়ে দাঁড়িয়ে উঠতে উঠতেই বলে এবার অনন্তর দিকে চেয়ে।

ও আর বসে না, কারণ এবার যদি বসে তো উপন্যাসে মন দিক আর না-ই দিক আলসেমির মধ্যে পুরোপুরি ডুবে যাবে আর চোখের সামনে খুলে-রাখা বইখানার কিছু সাদা কিছু ছোপধরা পাতার লাইনের রেখা বেয়ে শূন্য মনের হাত ধরে শূন্যতর দৃষ্টি ওঠানামা করবে। পাতা উল্টিয়ে যাবে কিন্তু স্মৃতির ঝাঁপিতে ওল্টানো পাতাগুলোর একটি শব্দও পড়ে থাকবে না। বিস্তৃতপক্ষ নিষ্ক্রিয় মনের সঙ্গে, যতটুকু পড়ে, সবটুকুই উধাও হয়। মনের ঘেরাটোপের মধ্যে পড়ে থাকে না কিছুই।

জামার মস্ত ফাঁকের মধ্যে দিয়ে ও যখন মাথা গলায় ছোড়দি ওর দিকে চেয়ে থাকে সমানে। জামার বোতাম লাগাবার সময় ছোড়দির চোখে চোখ রাখে। ছোড়দির মুখে হাসির স্পর্শাতীত ছোঁয়াটুকু, দৃষ্টির কোমল প্রসন্নতা ও অনুভব করতে পারে এখন, যেমন করেছে এর আগে অনেক বার। এই একটি লোকের সংবাদ আনার জন্যে ও যখনই তৎপর হয়েছে, ছোড়দি ওর সক্রিয় গতিভঙ্গি লক্ষ্য করে অপরিমেয় প্রসন্নতায় ওর জন্যে পরমায়ু প্রার্থনা করেছে। দৃষ্টির একটি মাত্র গভীর অন্তরস্পর্শী চাউনিতে সহস্র নীরব কৃতজ্ঞতা জানিয়েছে।

ও ঘর থেকে বেরোয়, আর ওর দীর্ঘ পদক্ষেপের দিকে নজর রেখে, মনে হল, ছোড়দি এইবার স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল। চাকরি পাওয়ার পর

প্রথম প্রথম ও লক্ষ্য করেছে বেরুবার সময় মা স্পষ্ট গলায় দেবদেবীর নাম উচ্চারণ করেছে। এখনও বোধ হয় মা করে থাকবে, কিন্তু ওর লক্ষ্য নেই বা কানে মা'র কণ্ঠস্বর যায় না। চাকরি জীবনের মত ওটাও বোধ হয় পুরনো হয়ে গেছে। মা'র দেখাদেখি ছোড়দিও যেন কি বলে। কিন্তু ছোড়দির কণ্ঠে কোন স্বর থাকে না, শুধু ঠোঁট কাঁপতে দেখা যায়।

অতীশদার ফেরা সম্পর্কে যে-আশ্বাস ও অনন্তকে দিয়েছে তা কিন্তু নিষ্ফল হল। কারণ অতীশদার বাড়িতে গিয়ে অতীশদার ফেরার কোন লক্ষণই দেখতে পেল না। অতীশদার মাকে যে অবস্থায় দেখল তাতে মনে হল দুর্ভাবনার চেয়ে মান অভিমানই তাঁকে বেশি ক্ষুব্ধ করেছে। ছেলে কোনদিনই তাঁর কথা মত ইচ্ছা মত কিছু করেনি। আজও তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাঁকে লুকিয়ে গোপনে কত কি যে করে বেড়াচ্ছে তার কোন হিসেবের কিছু মাত্র তাঁর জানার অধিকার নেই। সয়ে সয়ে এতদিনে বুঝি তাঁর ধৈর্যচ্যুতি ঘটেছে। এমন ছেলের দুঃসাহসী ক্রিয়াকলাপের জন্যে স্বামীর কাছ থেকেও কম অভিযোগ ওঠেনি তাঁর বিরুদ্ধে। সেই ক্ষোভের একখানি পূর্ণচিত্র সে দেখতে পেল তাঁর বিক্ষুব্ধ মনোভাবের মধ্যে। সব অভিযোগ যেন তাঁর শেষ হয়েছে। এবার শুধু নীরবে থাকা। আর এই নীরবতার মধ্যেই তাঁর যত অভিমান তীব্রাকারে ফেটে পড়তে চাইছে। গালে হাত-রাখা তাঁর মৌন মুখচিত্র তাকে কেমন অপ্রতিভ করে তুলল। খবরটা জিজ্ঞাসা করতে এসে সে বুঝি নিজেই নিজেকে বিপদে ফেলেছে। অতীশদার মা'র মুখের দিকে তাকিয়ে তার মনে হল, সত্যিই যা মনে হল তা, তিনি এতদিন যে পন্থায় ছেলেকে বুঝিয়ে এসেছেন বা ছেলের বিরুদ্ধে অভিযোগ এনেছেন বা রাগ প্রকাশ করেছেন, এখন সে-পন্থা তাঁর কাছে অনাধুনিক ঠেকে। তাই কালের আর সব আধুনিক পন্থার মত ঔদাসীন্য অবজ্ঞা বা কঠিন নীরবতার সাহায্যে তিনি আজকাল নতুন পন্থায় ছেলের গতিবিধি ক্রিয়াকলাপের বিরুদ্ধতা করতে চান। তাকে ঘরে ঢুকতে দেখে শুধুমাত্র দৃষ্টি দিয়ে, তাকে তার আগমনকে মৌন সম্মতি জানিয়েছেন। আর এতেই তার নিদারুণ অস্বস্তি। বিনানুমতিতে যেখানে প্রবেশ করা উচিত নয় যেন ঠিক সেখানেই প্রবেশ করেছে। এই অবস্থায় যে পরিমাণে নিজেকে দোষী মনে করা নিতান্ত

স্বাভাবিক ওর তেমনি দোষী মনে হল নিজেকে। এমন অবস্থায় অতীশদার মা নির্জনতাকেই একান্ত প্রার্থনা করছেন। আর তাঁর মনের এই নির্জনতা বোধে হস্তক্ষেপ করে সে কি সত্যিই তাঁর মনকে আরো অশান্ত করেছে ? এমন সব ভাবতে ভাবতে সে কখন বসেছে তাঁর মুখোমুখি একখানা চেয়ারে। শুধু একটু নড়ে চড়ে আবার যেমন ভঙ্গিতে বসেছিলেন প্রায় সেই একই ভঙ্গিতে বসে থাকলেন অতীশদার মা। মাথার ওপর কাপড়টা টেনে আনলেন, আঁচলটা সরিয়ে পিঠের ওপর জোরে ছুঁড়ে ফেলতে গিয়ে চাবির গোছা পিঠের ওপর আছড়ে পড়ায় শব্দ উঠল। মৃদু একটা শব্দ। যেন এতক্ষণ অস্বাভাবিক ছিলেন, তাকে ঢুকতে দেখেই স্বাভাবিক হওয়ার কথা মনে পড়ল। যা হয়ত ভাবছেন না অতীশদার মা তাই নিয়েই হয়ত বেশি বেশি ভেবেছে। তাঁর মুখের বিরল গাম্ভীর্য তাকে কথা কইতে দেয়নি। তাই মিনিট দুই তিন অস্বস্তি বোধের সঙ্গে সে চুপ করে থেকেছে। আর সেই ফাঁকেই ভেবেছে যা মনে এসেছে অতীশদার মা'র মুখ দেখে। চাবির গোছা পিঠের ওপর ধাক্কা খেয়ে ক্ষীণ মৃদু শব্দ তুললে ও খানিকটা স্বস্তি পেল। এই ক্ষীণ মৃদু শব্দ যেন তাঁর মৌন কণ্ঠের জমাট স্তব্ধতাকে আঘাত করল। যে ক্ষীণ মৃদু আওয়াজটুকু শুনল তাতে মনে হল, সেই শব্দে অতীশদার মা'র কণ্ঠেরই অস্ফুট ধ্বনি। আর তখনই তার মনে হল সে কিছু একটা জিজ্ঞাসা করার সুযোগ পেল। আর নিতান্ত অতি সাধারণ জিজ্ঞাসাটাকে সে যেন ফুঁ দিয়ে মুখের বাইরে ঠেলে দিলে, অনন্ত আমাদের ওখানে গিয়েছিল। এমন ব্যস্ত হয়ে গেছে অনন্ত, মা আর ছোড়দি খুব ভাবনায় পড়ে গেছে। ছোড়দিকে এখুনি গিয়ে একটা খবর না-দিলে তো পরে বাড়ি ঢুকতে দেবে না।

এমন করে খবর নিতে আসার জন্যে যে অপরাধটুকু করে ফেলেছে তারই জন্যে কৈফিয়ৎ দেয়ার মত করে ওকে কথা শেষ করতে হয়। ছোড়দির ব্যাকুলতার কথা জানিয়ে অতীশদার মা'র কাছ থেকে ও কি আর্দ্র কণ্ঠের কোমল কটি কথা আশা করছে। যা শুনে ওর প্রত্যয় নিঃসন্দেহে দৃঢ় হবে, অতীশদার মা বুঝেছেন তাঁর অশান্ত মনের জ্বালা জুড়ানোর জন্যে তার উপস্থিতিই এ সময়ে সব চেয়ে দরকারি। কথার শেষে ভাবনা আর

তাই গড়াতে পারেনি, অতীশদার মা চোখের উপর আঁচল টেনে এনে কাঁদলেন। বেশ বুঝতে পারা গেল অভিমানে চোখের জল রাখতে পারলেন না। এতক্ষণ সম্ভব অসম্ভব নানা কিছু মনে মনে গড়ে ভেঙে যে অস্বস্তি ভোগ করছিল, এখন যেন তার চেয়ে অনেক গুন বেশি অস্বস্তির নিচে চাপা পড়ল। ঠিক মনে হল তিনি মুখ উঁচু করে স্পষ্ট চোখে তাকাবার আগে মস্ত পা-ফেলে সে ঘরের বাইরে পালাবে। তখন তাঁর কান্না ভেজা চোখের দিকে চেয়ে কি বলবে বা না-বলবে এই ভাবনায় আর পড়তে হবে না। আর তা ছাড়া অতীশদার মাও বোধ হয় আবার একা হতে পারবেন, অভিমান নির্জনে ঝরাবেন। কিন্তু ওর সমস্ত শরীর মনে হল কে যেন শক্ত দুহাতে চেপে ধরেছে চেয়ারের সঙ্গে। মাটি থেকে ও পা তুলতে চেষ্টা করল, পারল না। অতীশদার মাকে হঠাৎ এমন দুহাতে আঁচল চেপে ধরতে দেখে কেমন নিস্তেজ মনে হল নিজেকে একটি ক্ষণ। তারপরই যেন সাহস সঞ্চয় করতে লাগল ভিতরে ভিতরে। যাতে স্বাভাবিক চোখ মেলে তাকাতে পারে। আবার যখন তিনি আঁচল থেকে চোখ সরিয়ে তার দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকাবেন।

কতক্ষণ অতীশদার মা ওই ভঙ্গিতে বসে ছিলেন হিসেব নিতে পারেনি ও। কারণ মুখে কথা বলতে না পারায় শরীরের অন্য কোন অঙ্গ সঞ্চালনে, সময় যে অস্বস্তিকর নীরবতাকে জাগিয়ে রেখেছে, তা থেকে নিজেকে একটানা মুক্ত করার চেষ্টায়, অবশেষে সে তার ডান পাশের ঢাকা দেয়া টেবিলের ওপর থেকে হাতের সামনেই যে বইখানা পেয়েছে তুলে নিয়েছে। হলুদ পাতা বইখানার, তিন-চার রঙের চকচকে মলাট। কোন সস্তা বিলিতি সংস্করণ। তারপরই চোখ পড়ল নামের ওপর—থাউজ্যাণ্ড ওয়ার্ডস ফর এভ্রি ডে ইউজ, এ্যট্ হোম এণ্ড এ্যট্ অফিস। তারপরই চোখে পড়ল যার বই তার নাম। ও। এ পুস্তকের তবে মালিক হচ্ছেন নিপু। বেশ কায়দা করে দু অক্ষরে নিজের নাম সই করেছে নিপু, প্রথম দুখানা পাতার পর। নিপুর সঙ্গে দেখা হলে নিয়তই শুনেছে, একদম সময় পাচ্ছে না। নিপু, আর অরুদি শ্বেতাদির ভাই অঞ্জন দুজনেই প্রায় একটা কথাকেই দু রকম স্বরে দুটি ভঙ্গিতে উচ্চারণ করে (ঘোষণার মত) সময় পায় না, সময় নেই ওদের একেবারে।

অথচ ওর সময় এত বেশি কি করে। ও উপন্যাস পড়ার সময় পায়, আড্ডা মারার সময় পায়, আলসেমি করার সময় পায়। আসলে ওদের দুজনেরই ভবিষ্যত আছে। আর ভবিষ্যত যাদেরই আছে বর্তমানে তাদের কোন ফারাক নেই। তাই এই টেবিলের ওপর ইতস্তত বিক্ষিপ্ত নানা উপন্যাস কাহিনী কবিতা রাজনীতি অর্থনীতি গ্রন্থের ভিড়ে থাউজ্যাণ্ড ওয়ার্ডস ফর এভ্রি ডে ইউজের মালিকের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য প্রোজ্জ্বল হয়ে ওঠে। এ টেবিলের সব বইয়েরই মালিক অতীশদা। মধ্যে মধ্যে খুশি মত দু চারখানা টেনে নিয়ে যায় নিপু। পাঁচ দশখানা ইংরেজি উপন্যাস গল্প পড়ে বুঝে আরও দশ বছর সময় নিয়ে ইংরেজি চর্চা বা শেখার সময় কোথায় তার। ব্যবহারিক জীবনে যে শিক্ষাকে কাজে লাগান যাবে না এখুনি এখুনি, তার জন্যে সময় ব্যয় করার মত অবকাশ কোথায়। সে এমন বই খুঁজবে হাতের কাছে যা তাকে কাজ দেবে। চলতে ফিরতে কাজ সারার জন্যে যে ইংরেজির প্রয়োজন তা শিখতে গেলে এসব বই-ই হাতের কাছে রাখা দরকার। নিপুর বইতে নিপুর হাতের লেখা দেখতে দেখতে তার বর্তমান চেহারাটাই সে মনে মনে গড়ে নিয়েছে। কখন ব্যস্তসমস্ত সে একেবারে তার চোখের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। আর নিপুর সেই মূর্তির দিকে চেয়েই সে আনমনে অজ্ঞাতে হেসে ফেলেছে। সত্যিই সে হেসে ফেলেছে।

মুখ উঁচু করে দেখে অতীশদার মা তার দিকে তাকিয়ে আছেন। তাঁর বিষণ্ণ এক জোড়া চোখের ওপর দৃষ্টি পড়তেই কেমন বিপাকে পড়েছে মনে হল। চোখ তুলেই আবার নিচু করে। নিপুর মূর্তি কল্পনা করে যখন হেসেছে তখন মনেই থাকেনি ঘরে অতীশদার মা বসে আছেন মুখ নিচু করে। এবারে যে অপরাধ করেছে তার বুঝি কোন ক্ষমা নেই। কি ভাবলেন অতীশদার মা। তার এই ছুটে আসা, (অনন্তর মুখ থেকে খবর পাওয়া মাত্রই) এটা কি তবে নেহাৎই সৌজন্য বোধ? কি ভেবেছেন তিনি? নিপুর কথা ভেবে যে হাসি আলগা ভাবে তার চোখের দুটি কোল, ঠোঁটের দুপাশ ছুঁয়ে গেছে তা কি ঘরের আবহাওয়া লঘু করে দিয়েছে, সমব্যথার সঙ্কেতবাহী তার সব স্পষ্ট আচরণ সত্ত্বেও। কিন্তু তার মনকে তো সে স্পর্শ করে আছে অস্তিত্বের সবটুকু

দিয়ে। এ যেন স্কুলের ইংরেজির মাস্টার ভবসিন্ধুবাবুর গোঁফ দেখে পান্নুর ফচকেমি। ভবসিন্ধুবাবু কথা বললেই মনে হত মুখের মধ্যে সব সময় হাওয়া পুরে রেখেছেন। সামনের দাঁত ছুটো অস্বাভাবিক বড় বলে ত্রিকোণ গোঁফটা উঁচু হয়ে থাকত। পান্নু বলত একটুকরো কাল চামড়া ত্রিভুজের মত কেটে নাকের নিচে আঠা দিয়ে সেঁটে দিলেই ভবসিন্ধুবাবুর মত গোঁফ হয়। খুব জোরে জোরে একসঙ্গে যখন অনেক কথা বলতেন ভবসিন্ধুবাবু তখন অসম্ভব কাঁপত গোঁফটা নাকের নিচেই। মনে হত ছুলছে। পান্নুর জায়গা থাকত তার পাশেই। পান্নু কন্নুইয়ের ঠেলা দিয়ে তার পেটে খোঁচা মারত। ঠোঁট ছুটোর ওপর বাঁ হাত চেপে ডান হাতের কন্নুই দিয়ে তাকে ঠেলা দিয়ে চাপা স্বরে বলত, ঠিক খুলে যাবে এবারে স্থাখ, টেবিলের ওপর পড়বে। আমার মনে হয় ওটা নকল গোঁফ। থিয়েটার করে নাকি?—প্রাণপণ চেষ্টা করেও ও হাসি রুখতে পারে না। হেসে ফেলে। আর খুব সহজেই ধরা পড়ে যায় ভবসিন্ধুবাবুর চোখে। চোখ পাকিয়ে গর্জন করে ওঠেন ভবসিন্ধুবাবু। হাসির কৈফিয়ৎ তলব করেন। পান্নুর কায়দা ধরতে পারেন না তিনি। আর কি করেই বা বোঝাবে সে ভবসিন্ধুবাবুকে তাঁর গোঁফই তার হাসির কারণ। অতীশদার মাকে কি করে বোঝাতে পারে, অতীশদার ভাবনায় তার মন তাঁরই মত মন্থর। কি করে বোঝাবে বেশ কটা দিন পরপর অতীশদা তাদের ওখানে যাননি। আর অতীশদার এমন লক্ষণীয় অনুপস্থিতিতে তাদের মন কি চঞ্চল হয় না?

ওর দৃষ্টির বিপন্ন ভাবের মধ্যে কি পড়লেন অতীশদার মা বোঝা কঠিন। সত্যিই কি তার মনে কথাগুলো অতীশদার মা বুঝলেন, উপলব্ধি করলেন যৎসামান্যও। দ্বিতীয় বার মুখ তুলল যখন তখন আর চুপ করে তাকিয়ে থাকতে পারল না অতীশদার মা'র চোখে। স্বাভাবিক হওয়ার প্রয়োজনেই সান্ত্বনার সুরে কথাগুলো গুছিয়ে গুছিয়ে একটি একটি করে বলে গেল, অত ভাবছেন কেন মাসিমা, ফিরবেন এখুনি। রাজনীতি-করা লোক জানেনই তো। চিরকালের স্বভাব কি যায়। ঠিক মত খাওয়া, বাড়ি-ফেরা এদের কুষ্ঠীতে নেই। অতীশদার মত আরো ছুয়েক জনকে তো জানি—সব ওই এক ধাঁচের।

কথা শেষ করার পর আবার লজ্জা পেল। যখন ভাবল অতীশদার মাকে এইটাই বোঝাতে চেয়েছে যে ছেলেকে সারা জীবন ধরে জানার মধ্যেও এতটুকু না-জানার যে অভাব তা-ই তাঁর হিসেবের মিলকে নির্ভুল হতে দিচ্ছে না। আর অজানা সেই সামান্যটুকুই কখন বা অসামান্য হয়ে উঠতে পারে। আর সেই সামান্য অজানাটুকু তার জানা আছে। সেইটুকু জানিয়ে দিয়ে সে তাঁর বড় উপকারই শুধু করছে না, তাঁকে কোন কোন সময়ের দুর্ভাবনা থেকে যথার্থই মুক্ত করছে। বয়স্ক অভিজ্ঞ উপদেষ্টার মত মনে হয়েছে আবার নিজেকে। কথার শেষে আসার আগেই সে দাঁড়িয়েছে। থামতে হয়েছে অতীশদার মা'র কণ্ঠস্বরে ভরসা পেয়ে। কথা বললেন তিনি এতক্ষণে। খুব সামান্য কটি। তবু বললেন; একেবারে হ্যাঁ-হুঁ না। সময় নিলেন তিনি অনেকক্ষণ, তাই মনে হল অনেক কথা বলতে শুরু করেছেন। কথা তাঁর ফুরোবার নয়: আজকাল আর কিছুই ভাবি না, আগে ভাবতুম, ও নাকি খুব পয়মন্ত, থামলেন তিনি। কথাগুলো ঠিক তাকে উদ্দেশ্য করে বলছেন না দেয়ালের দিকে তাকিয়ে শূন্যে ছুঁড়ছেন বোঝা ভার। আবার বললেন, পরমায়ু তো অখণ্ড আমাদের—কত দিন যে বাঁচতে হবে, কখন যে থেমেছেন তিনি খেয়াল থাকে না বুঝি।

সব কটি কথাই কিন্তু শুনেছে সে তাঁর থমথমে মুখ চোখের দিকে তাকিয়ে। আর মনের ভিতরে পাক খেয়েছে, তাঁর কথার ব্যথার সুর কিসের সঙ্গে বাঁধা।

তিনি কথা শেষ করার পরও দাঁড়িয়েছে। জানিয়েছে শুধু দৃষ্টির ভাষায়, তাঁর কথায় তার পূর্ণ সমর্থন আছে। যেন আর কি বেশি বলবার আছে তার এর ওপর। তারপর প্রস্থানের জন্যে অনুমতি চাওয়ার মত করে বলল, আমি তবে চললুম মাসিমা, কাল অনন্তকে একবার পাঠাবেন, ঠিক বুঝতে পারল না, অতীশদার মা তাঁর দিকে চেয়ে মৃদু মাথা নাড়লেন কি না। শুধু তাঁর থমথমে মৌন দৃষ্টির ওপর চোখ রেখে তার ফিরে মনে হল, বেশ কয়েকটি বছর ধরে ওখানে আশাভঙ্গের একটি ক্ষীণ, প্রায় অদৃশ্য, করুণ, নিস্তেজ আলো জলে জলে অবশ, এখন মৃদু কম্পনই সম্বল তার।

ফেরার পথে বার বার মনে পড়ল একাধারে অতীশদার ব্যর্থতা আর

সাফল্যের কথা। অতীশদার মা'র চোখে অতীশদার নিদারুণ নিরতিশয় ব্যর্থতা! আর তিনি ছাড়া আর যারাই অতীশদার নিকট সম্পর্কে এসেছে তারাই জেনেছে কোথায় তাঁর অনিবার্য সাফল্য। রাজনীতিকে ভালবেসে একটি মেয়েকে ভালবেসেছে। প্রথমকে করতে চেয়েছে জীবনের পাথেয়, আর দ্বিতীয়কে জীবনসঙ্গিনী? প্রথম প্রথম কত অভিমানই না করেছে ছোড়দি। সময় থাকতে কেন জীবনকে গুছিয়ে নেবে না অতীশদা। প্রথম তারুণ্যের আবেগে লেখা হলেও অতীশদার চিঠির দুচারটে কথা এখন কানে কাব্যের সুর সংগতিকে মনে করিয়ে দেয়, জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন বা বিভক্ত এমন কোন শৌখিন নীতিকে আমি রাজনীতি চর্চা বলি না। আর ভুলে যাও কেন, প্রাণের টানে রাজনীতি চর্চার মধ্যেই তো তোমাকে ভালবাসার ইঙ্গিত পেয়েছি। তাই তাকে অবিশ্বাস করে তোমাকে, পুরোপুরি বিশ্বাস করার সাহস আমার কোনদিনই নেই। কি বোঝাতে চেয়েছে অতীশদা, আর কি-ই বা বুঝেছে ছোড়দি, তা তার অজানা। তবে কথাগুলোর ব্যঞ্জনা তাকে আজও, যেমন বরাবরই, উন্মন করে তোলে। একটা পুরনো প্রিয় সুরকে কানের কাছে বাজানর মত করে, সে কথাগুলোকে পুনরুদ্ধার করে স্মৃতির পর্দায় বাজাতে চেষ্টা করে।

এখনও ফেরেন নি, বসে ছিলুম অনেকক্ষণ, অলস ক্লান্ত কণ্ঠে কথা কটা বলে, খবরটা ছোড়দিকে জানিয়ে ও দায়িত্ব কর্তব্য সব কিছুই আপাতত পালন করবে। কিন্তু কতটুকু জানাতে বা বোঝাতে পারবে, অতীশদার মাকে যা দেখে এল তার কথা। অতীশদার মা'র ছবি ও মনের সমস্ত পট জুড়ে এঁকে এনেছে। তার সবটুকু ছোড়দিকে উন্মুক্ত করে ধরে দিতে গেলে সময় সঙ্কুলান হবে? গালে হাত দিয়ে ভেবে ভেবে ছোড়দি দিশাহারা হয়ে উঠবে সারা রাত ঠায় বিনিদ্রায়। অতীশদার মা'র কাছ থেকে অতীশদাকে বিচ্ছিন্ন করেছে রাজনীতির মত ছোড়দিও কি?

অতীশদার জন্মক্ষণটি বড় শুভ। অতীশদা সংসারে নাকি বড় পয়মন্ত হয়ে এসেছিলেন। তাঁর আবির্ভাবের সঙ্গে তাঁদের সংসারের এক মস্ত বিরোধের অবসান ঘটে।

অতীশদার বাবা তাঁর বাবার ইচ্ছার বিরুদ্ধে অতীশদার মাকে ঘরে আনেন। অতীশদার মা মোটেই প্রস্তুত ছিলেন না এই প্রবল পারিবারিক

কলহের জন্যে। কেমন ঘাবড়ে গিয়েছিলেন তিনি। অতীশদার বাবা বুঝিয়েছেন স্ত্রীকে, ঘাবড়াবার কোন কারণ নেই। তাঁর বাবা একদিন শান্ত হবেন। রাগ তিনি পুষে রাখতে পারবেন না। কিন্তু সব ব্যাপারেরই সমাধান বুঝি সময়ের হাতে থাকে না। নানা অর্থে নিজেকে বিপন্ন বোধ করতে লাগলেন অতীশদার ঠাকুর্দা। বিশেষ করে বংশ কৌলীন্য মর্যাদা ছাড়াও আর্থিক ব্যাপারে। স্পষ্ট মুখ ফুটে কিছু না-বললেও আকারে ইঙ্গিতে তিনি ছেলের সংসারকে আলাদা দেখার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন, পুরুষানুক্রমে পাওয়া পৌরুষ অতীশদার বাবাকে ভর করল। তিনি একদিন সত্যি সত্যিই আলাদা হলেন স্ত্রীকে নিয়ে। চাকরি-বাকরি তেমন কিছু একটা বড় করতেন না তখন। ভরসার মধ্যে বাবার কিছু পয়সা প্রতিপত্তি আর একখানা বাড়ি। মহা বিপদে পডলেন তরুণী সুন্দরী ভার্যাকে নিয়ে অনিশ্চিত অবস্থায়। জেদের মাথায় ভালো বাড়ি ভাড়া নিলেন। ভাবলেন কেন মিছে কষ্ট করি। বাবা এবার নিশ্চয় ডেকে পাঠাবে। আর কত দিন বা রাগে এমন অন্ধ থাকবে। কিন্তু তাঁর বাবা আত্মাভিমান ত্যাগ করতে এতটুকু স্বীকৃত হলেন না। অতএব নিজের শক্তির ওপর নির্ভর থাকতে গিয়ে বাসা বদল করতে হল। আরও কম ভাড়ার খোঁজে খারাপ বাড়িতে উঠতে হল তাঁকে। সেই অল্প ভাড়ার নিকৃষ্ট বাড়িটাতে একদিন জন্ম হল অতীশদার। আর সেই খবর লোক মুখে কানে গিয়ে উঠল অতীশদার ঠাকুর্দার। কটা দিন পরেই চিঠি পেলেন অতীশদার বাবা। লজ্জায় নাকি মুখ দেখাতে পারছিলেন না অতীশদার ঠাকুর্দা। তাঁর নিজের এমন গোছান বাড়ি থাকতে অন্ধকার বিশ্রী একটা ভাড়া বাড়িতে জন্ম হল তাঁর ছেলের প্রথম সন্তানের। অতীশদার আবির্ভাবে শুধু যে পারিবারিক বিরোধ অশান্তির অবসান ঘটেছে তা-ই নয়, অতীশদার বাবাও আবার নবীন উৎসাহে কর্মজীবনের সাফল্য খুঁজেছেন। অতীশদার মা তাই এক সময় ভেবেছেন বড় পয়মন্ত ছেলে অতীশদা। সেই অতীশদা যে তাঁর মনের দেয়াল ভেঙে ক্রমে ক্রমে এত দূর সরে যাবে, তাঁর ইচ্ছার সব কটি দলকে একটির পর একটি ছিন্ন করবে তা কি তিনি কখন ভেবেছেন। তাই কি অতীশদার বাবা (যিনি একদা ক্ষুব্ধ হতেন ছেলের অবাঞ্ছিত কাজকর্মে, আর বাঙালী স্বামীর ক্ষোভ প্রকাশের একমাত্র আশ্রয় স্ত্রীর

কাছেই সব কিছুর কৈফিয়ৎ তলব করতেন) অধুনা সান্ত্বনার স্নিগ্ধ কণ্ঠে বলতে চেয়েছেন স্ত্রীকে, সব ছেলে মেয়ে কি বাবা-মা'র ইচ্ছার হাত ধরে জীবনের কর্মপন্থা নির্ধারণ করে। কেন নিপু তো তাঁর অভিলাষের হাত ধরে ধীরে ধীরে এগিয়ে তাঁর ইচ্ছাকে পুর্ণ রূপ দিতে পারে একদিন। আর তা ছাড়া তাঁর স্বামাই কি তাঁর বাবার সব চেয়ে বড় ইচ্ছাটাই পুর্ণ করেছেন ?

এ সব ভাবতে ভাবতেই সে বাড়ি-ফেরার পথটুকু নিঃশেষ করেছে।

পরদিন সকালেও অতীশদার দেখা মিলল না। ছোড়দি বৈদ্যনাথকে পাঠানর কথা একবার তুলেছে, ও অতীশদার মা'র কথা ভেবে ছোড়দিকে বারণ করেছে, বলেছে, আজ সন্ধেবেলা আসবেন। এমন করে বলেছে যেন অতীশদার সঙ্গে তার দেখা হয়েছে, অতীশদার মুখ থেকে খবরটা পেয়েই সে বলছে। যা-ই হোক ছোড়দি বৈদ্যনাথকে পাঠায় নি। ওর মনের উৎকণ্ঠা সত্ত্বেও ও যেন বেঁচেছে, গত সন্ধ্যায় অতীশদার মা'র থমথমে মুখ আর মৌন নিশ্চুপ চাউনির কথা যে মুহূর্তে ভেবেছে। প্রত্যাশা অপুর্ণ থাকলে মানুষকে যেমন ভগ্ন উৎসাহ মনে হয়, তেমনি মনে হল সকালের আলোয় ছোড়দির বিষণ্ণ নিরুদ্যম মুখাবয়ব। তবু ছোড়দির মুখ চেয়েও ও বলতে পারল না বৈদ্যনাথকে একবার খোঁজ নিতে পাঠাতে। অতীশদার মা'র মুখের চেহারা তার মন আচ্ছন্ন করে আছে। অতীশদার সঙ্গে তাদের পরিবারের এই এত দিনের ঘনিষ্ঠ নিবিড় সম্পর্ক সত্ত্বেও অতীশদার মা'র অভিমানী মনের কাছে তাদের এই উৎকণ্ঠা সম্প্রতি সহনীয় নাও হতে পারে। শুধু মায়া হয় তবু, ছোড়দির বিষাদ বিপন্ন দৃষ্টিকে অনুসরণ করে।

সন্ধের দিকে অতীশদা এল।

ও অফিস থেকে ফিরেছে। ফিরে জামাটা সবে ছেড়েছে, আনলার দিকে হাত উঁচু করে তুলেছে টাঙিয়ে রাখবার জন্যে, এমন সময় সিঁড়ি বেয়ে কার পায়ের শব্দ ওপরে উঠছে শুনতে পেল। তারপর সেই শব্দ তার ঘরের সামনে এসে থামল। ও পিছনে ঘাড় ফিরিয়ে দেখে স্বয়ং অতীশদা।

কি খবর বলুন তো, হাতের ওপর উঁচু করে-ধরা জামাটা আর আনলায় তখুনি তখুনি টাঙান হয় না, ও একটু উষ্ণ কণ্ঠেই অতীশদাকে প্রশ্ন করে বসে, তখন বোধ হয় ভাল করে ঘরের মধ্যে পা ফেলেনি অতীশদা, আর গা-থেকে খোলা জামা তার হাতেই ঝুলতে থাকে।

অতীশদা'র ঘরের মধ্যে পা-ফেলার কোন ক্ষিপ্রতা লক্ষ্য করা গেল না। আর সঙ্গে সঙ্গে কোন উত্তরও মিলল না। শুধু তার বিছানার ওপর গা এলিয়ে দিয়ে, দুটো বালিশ পিঠের নিচে টেনে এনে পকেটে হাত পুরল, নিশ্চয় সিগারেটের জন্যে।

আবার ও অধৈর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করে, এখানে সবাই ভাবছে, বাড়িতে সবাই ভাবছেন, বেশ আছেন, কোন পাত্তা নেই—

ইতিমধ্যে অতীশদার সিগারেট ধরান হয়ে গেছে। এখন একমুখ ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে চিরাচরিত প্রথায় লঘু কণ্ঠে বলে, আর অফিসে যে সবাই ভেবে ভেবে একেবারে সব ভাবনাই ছেড়ে দিল?

অতীশদার কথার সামান্য ইঙ্গিতটুকুও তখনও ধরতে পারেনি, উল্টে জিজ্ঞাসা করেছে, আর দিল্লিই বা যাচ্ছেন কবে তাও তো জানতে পারলুম না।

অতীশদা নিরুত্তর রইল। অন্যমনস্ক হয়ে সিগারেট টানতে লাগল। হঠাৎ বুঝি অন্যমনস্ক কণ্ঠেই বলেছে, মুখ থেকে ধোঁয়া নির্গত করে, আমার জন্যে চাকরি বাকরি একটা দেখ তো, টেম্পোরারি কিছু একটা হলেও চলবে আপাতত।

হঠাৎ চাকরির কি এমন দরকার পড়ল? ওর কণ্ঠের কৌতূহল অতীশদাকে একেবারেই স্পর্শ করেনি, মুখ দেখে ওর তা-ই মনে হয়।

বৈদ্যনাথ দুকাপ চা নিয়ে কখন যে এসে নীরবে দাঁড়িয়েছে তা ওর খেয়াল ছিল না।

আনলায় কাপড় তুলে রাখছিল। পিছন ফিরতে দেখে অতীশদা এক কাপ চা নিচ্ছে বৈদ্যনাথের হাত থেকে। (বৈদ্যনাথকে একেক সময় বেশ হুঁশিয়ার মনে হয়। কখন যে নিঃসাড়ে তাকে আর অতীশদাকে দেখে গিয়ে খবর দিয়েছে ছোড়দিকে, আর ছোড়দি চা পাঠিয়েছে এমন ত্বরিতে, যে ও ভাবতেই পারেনি এভাবে বৈদ্যনাথ চা নিয়ে এসে হাজির

হবে)। বৈদ্যনাথ তার চায়ের কাপ টেবিলের ওপর নামিয়ে রাখতে রাখতে ছোড়দির নির্দেশ মত বলে, চা আস্তে খান, খাবার আসছে।

মুখ হাত ধোয়ার জন্যে ও অনুমতি নিয়ে ঘরের বাইরে গেছে। মনটা অতিরিক্ত চঞ্চল থাকায় সময় একটু বেশিই লেগেছে, চোখে মুখে জলের ঝাপটানি দিতে, তপ্ত ঘাড়ে ঠাণ্ডা জলেভেজা হাত রাখতে।

ফিরে এসে দেখে ইতিমধ্যে ছোড়দি খাবারের থালা নিয়ে উপস্থিত হয়েছে। পীড়াপীড়ি করছে অতীশদাকে খাওয়ার জন্যে। অতীশদা যে কিছুই মুখে দেবে না মুখভঙ্গিতেই তা.বুঝিয়ে দিয়েছে। সিগারেট ধরিয়ে তাই আবার নীরবে টানছে।

তারপর, দিল্লি যাওয়ার কি ঠিক করলেন বলুন? ঢাকা-দেওয়া চায়ের কাপের ওপর থেকে প্লেট তুলতে তুলতে ও জিজ্ঞাসা করে।

না, আর যেতে হল না, প্রশ্নের অপেক্ষায় তৈরী হয়ে ছিলেন অতীশদা।

যেতে হল না মানে? যাবেন না ঠিক করলেন।

না ঘোষচৌধুরি তো জানিয়েই দিলেন। অনেকক্ষণ ছিলুম ওঁর ওখানে কাল।

ঘোষচৌধুরির ওখানে?

হ্যাঁ—ভুল যখন হয় তখন (শেষের অসমাপ্ত কথাগুলো অনেকটা স্বগতোক্তির মত শোনাল)—

চান্সটা একবার নিয়ে দেখলে পারতেন।

নিলে অন্তত সাস্পেন্সানের এই দুর্ভোগটা এত তাড়াতাড়ি আসত না।

সাস্পেন্সান? একটা টানা গল্পের কোথাও হঠাৎ ছেদ পড়ার মত ও হোঁচট খায়।

হ্যাঁ, সে রকমই তো বললেন ঘোষচৌধুরি।

মানে, সার্ভিস সাস্পেণ্ডেড?

হ্যাঁ, দিন দুই তিনের মধ্যেই।

ফর?

আপাতত ফর আনসার্টেন পিরিয়ড।

গ্রাউণ্ডস।

কিছুই না, সম্ভবত, ফর এডিটিং দি বুলেটিন অফ দি ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন য়্যণ্ড ফর রেইজিং ফাণ্ডস ফর ইট।

ওটা তো অনেকদিন ধরেই করছেন, তা ও তো বেনামে।

আগে এত জোরদার হয়নি, আর বেনামে করলেও জানতে তো কারও বাকি নেই।

ঘোষচৌধুরির তো সিমপ্যাথি ছিল।

বরাবরই...বিগবসেদের মধ্যে ওঁর সিমপ্যাথিই তো একমাত্র ভরসা। লেখাও খুব য়্যাপ্রিসিয়েট করেছেন।

শেষ পর্যন্ত কিছু করতে পারলেন না, প্রশ্নটা ওর অসহায় কণ্ঠ থেকে বেরয়। ঘোষচৌধুরির সমস্ত আন্তরিকতা ওকেও কখন অভিভূত করেছে।

কি করবেন আর। দিল্লীতে সরিয়ে দিতে চেয়েছিলেন। তা আমি মন ঠিক করবার আগেই অফিস কর্তারা সব ঠিক করে ফেললেন, কথার শেষে অতীশদা শুকনো হাসল।

কিন্তু এ গুলো কি গ্রাউণ্ডস নাকি?

ওর উত্তেজিত মুখের দিকে তাকিয়ে অতীশদা আবার একটু শুকনো হাসল। স্বল্পক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, গ্রাউণ্ডস খুঁজতে আর কি! ভেবেছে বুলেটিন বন্ধ হবে, ফাণ্ডস কিছুই উঠবে না আর ইউনিয়নও মবিলাইজড্ হয়েছে এ জীবনে। রাগ তো ওখানেই। আর আমিই ওয়ার্স্ট কাল্প্রিট।

নির্লিপ্ত নির্বিরোধ কণ্ঠে কথা শেষ করে অতীশদা। শূন্যে উদাস দৃষ্টি ভাসমান রাখে। ও নিজের মধ্যে ছটফট করে কিছু করতে না পারার একটানা বাধায়। ছোড়দি নিশ্চুপ ঠায় দাঁড়িয়ে থেকে যেন গ্রাস করেছে অতীশদার কণ্ঠের প্রত্যেকটি শব্দ। তারপর অতীশদা চুপ করলে, নিঃশব্দে পা-ফেলে ঘরের বাইরে চলে যায়। অতীশদার উদাস চাউনি চকিতে সজাগ হয়। ছোড়দির প্রস্থানোদ্যত পা-ফেলা অনুসরণ করে।

অতীশদা কি ভেবে ত্বরিতে ওর কাছে ঘেঁষে আসে, পিঠের ওপর একখানা হাত রেখে বলে, মাসিমার কানে চট করে এসব কিছু তোলার দরকার নেই। তুমি গিয়ে একটু দেখ।

ও আর বিন্দুমাত্র অপেক্ষা করতে পারে না। অতীশদার নির্দেশ মত ছোড়দিকে ধাওয়া করতে হয়।

বিছানায়, ঘুম আসার আগে অনেক দিন পর আজ আবার, নিরন্ধ্র অন্ধকারের মধ্যে কড়িকাঠের দিকে চোখ মেলে স্পষ্ট করে তাকিয়ে থেকেছে। যত ভেবেছে অতীশদার কথা তার থেকে বেশি ভেবেছে অতীশদাদের বিগ বসেদের কথা। সব চেয়ে বেশি ভেবেছে বোধ হয় ঘোষচৌধুরির কথা। ভেতর থেকে খোঁজ খবর নিয়ে ঠিক সময়েই জানিয়েছেন অতীশদাকে। চোদ্দশ পনেরোশ টাকা মাইনে পাওয়া ঘোষচৌধুরির মত লোকও তা হলে অফিসে থাকে, অর্থাৎ এ শহরে আছে। তাঁর শুভেচ্ছা ঐকান্তিক চেষ্টা সত্ত্বেও ব্যর্থ হলেন ঘোষচৌধুরি। মাও ব্যর্থ হল। জীবনে অনেক বারের মত আরও একবার। ধীরে সুস্থে গুছিয়ে সময় নিয়েও যদি মা'র কানে কথাটা তোলা যায় তো হবে কি। মা তো নিজের ব্যর্থতার কথাই স্মরণ করবে। কোথায় ছোড়দির বিয়েটা তাড়াতাড়ি চুকে যাবে, অতীশদার হাবভাবেও তাই বোঝা গেছে। মা তাই বুঝেছে। তা নয়, কোথা থেকে সব কিছু ওলোটপালোট এলোমেলো করে দেবার জন্যে এল এই অলুক্ষুণে দুঃসংবাদটা। মা এরপরও কি করে আশা করে। তা ছাড়া টাকার যে অঙ্কটা অতীশদা সংসারে দিচ্ছিল তারই বা কি হবে। জীবনে যেন অনেক দুঃখের পরীক্ষায় পার হয়ে, মা শেষকালে সুখের শান্তির দীর্ঘ সড়ক খুঁজে পেয়েছে। আর কোন পরিবর্তন মা সহ্য করতে পারবে না, তাই চায়ও না।

আজ বিছানায় চোখ বোজবার আগে ছোড়দি কি ভাববে? ছোড়দি ভাববে, মা'র কাছ থেকে যে ভাগ্য পেয়েছে তাকে ফেরাবে কেমন করে। আর ভাববে শুধু, যেদিন অতীশদার মুখ থেকে খবরটা পেল সেদিনই কেন তারা অতীশদাকে উৎসাহ দিয়ে দিল্লি পাঠানর ব্যবস্থা করল না সবাই মিলে।

॥ ৯ ॥

অতীশদা যেমন করে বোঝাতে বলেছে ও তার চেয়েও অনেক বেশি গভীর করে বুঝিয়েছে। যাতে ছোড়দি মা'র কানে কথাটা কিছুতেই না-তোলে শেষ পর্যন্ত। ও ভেবে অবাক হয় অতীশদার চারিপাশে নজর রাখা দেখে। এরই মধ্যে কখন ভেবে রেখেছে মার কানে কথাটা কেমন করে এক নিমেষে তুলবে ছোড়দি। আর ছোড়দিকে তা থেকে নিরস্ত করাই হল তার আর অতীশদার যৌথ দায়িত্ব। আর ঠিক এ-কারণেই ও বলেছে ছোড়দিকে, অতীশদা বলছে এ মাসে মাকে যেমন টাকা দেওয়ার কথা তেমনি দেওয়া হবে ভাবনার কিছু নেই। সামনের মাসের ভাবনাও খানিকটা ভেবে রেখেছে অতীশদা। আর দুমাস সময় তো হাতে পাচ্ছে। ঠিক মত ঘোরাফেরা করলে অতীশদার যা সোর্স তাতে কি একটা কিছু জুটিয়ে নিতে পারবে না? মা'র কানে কথাটা যাওয়ার বিপদ নানা রকমের। সবচেয়ে আশঙ্কা মা'র মনের দুশ্চিন্তা নিয়ে আর তাই থেকেই শরীরের ক্ষয় অস্বাভাবিক কিছু নয়। তাই গোড়া থেকে সব ব্যাপারটা মা'র কাছে অজ্ঞাত থাকাই বাঞ্ছনীয়। অতীশদা আরও যা ভেবেছে ছোড়দিকেও সেইমত চলতে বলেছে। কারণ ছোড়দিকে নতুন করে বোঝাবার কি আছে যে মা'র কাছে ছোড়দি আর অতীশদার বিয়ের মতো বাস্তব আর দ্বিতীয় বস্তু নেই। এতোদিনের ভাবনায় ভাবনায় যে-চিন্তাকে মা সব সংশয় দুর্ভাবনা থেকে পার করে এনেছে, সেই চিন্তাকে আজ কেউ যদি বলে বড় দ্রুত ধাবমান, তা হলে মা'র মানসিক অবস্থা কোন পর্যায়ে গিয়ে ঠেকতে পারে ওর চেয়ে ভাল বুঝতে পারবে না কেউ। ছোড়দির অভিমান ওর চোখে অন্তত এড়াবার নয়। ছোড়দির অভিমান নিজের ওপর, দুঃসহ বাঁচার ওপর। মাকে ছোড়দি একটি কথা বোঝাবার জন্যেই অতীশদার অফিসের খবরটা দেবে। মাকে

খুব ভাল করেই বোঝাতে চাইবে, আমার নিজের ভাগ্যের ওপরেও তো তোমার ভাগ্য রয়েছে মা, সেটা ভুলে যাচ্ছ কেন। তুমি কার ভাগ্য দিয়ে আমাকে পালটাবে। আর তুমি পালটাবার হাজার চেষ্টা করলেও কি সেই ভাগ্য আমায় ছাড়বে মনে করেছ? অতীশদার মুখ থেকে সমস্ত ব্যাপারটা শোনবার পরও ছোড়দির সারা চেহারায়, মুখে চোখে নিজের ওপর এই তীব্র অভিমান বোধের ছায়াটুকু পড়তে দেখেছে।

বেশ কটা দিন পর পর ছোড়দির হাবভাব চলাফেরা লক্ষ্য করে ও বুঝতে পেরেছে ছোড়দির মনের মধ্যে কিছু একটা স্থায়ী ভাবে ঘুরপাক খাচ্ছে।

আর অতীশদার এ বাড়িতে আসার সময় কিছুদিন ধরে কেমন এলোমেলো অনির্দিষ্ট হতে দেখে মা যেন অতীশদার কাজকর্মের ব্যাপারে একটু একটু করে সন্দিগ্ধ হয়ে উঠল। ওর চোখে মা আর ছোড়দি অন্তত কিছু লুকোতে পারবে না। কারা কিছু একটা গোপন করে চলেছে মা'র দৃষ্টি থেকে, আর মা'র সন্ধানী দৃষ্টি যেন তাকেই ধাওয়া করে বেড়াচ্ছে। মা'র অসহায় অবস্থা আবার তাকে কখন এক সময় সমব্যথী করে তোলে। অথচ চট করে মাকে জানাবারও কিছু উপায় নেই। নিজের কাছে সে কোন একটি সময় থেকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। সেও নিরুপায়।

আরও লক্ষ্য করেছে ছোড়দি সময়ে অসময়ে অতীশদাকে নিজের কাছে পেয়েছে। এই থেকেই ছোড়দি অতীশদার কাজকর্মের গোলযোগকে গায়ে মাখতে চায়নি। বরং অতীশদার কর্মজীবনের এই দুর্ঘটনা ছোড়দিকে সুযোগ দিয়েছে অতীশদাকে বহু সময়, প্রায় সকাল সন্ধ্যা কাছে পাওয়ার। ঠিক যেমনটি পেত ছোড়দি অতীশদার সঙ্গে বিয়ে হলে। বিয়ে এখুনি হল না হয়তো তবু অতীশদাকে আরও বেশি সময়ের জন্যে কাছে পাওয়া হল, ছোড়দির সান্ত্বনা কি আপাতত এইটুকুই।

মা একদিন সত্যি সত্যিই বুঝতে পারল অতীশদা দিল্লি যাচ্ছে না। ছোড়দি যেমন অতীশদাকে সময়ে অসময়ে কাছে পাওয়ার আনন্দে অতীশদার চাকরি খোয়ানোর দুঃখ ভুলতে বসেছে, মাও তেমনি অতীশদার দিল্লি যাওয়া স্থগিত হল দেখে নিজের অনেক পুরনো একটা প্রত্যাশা পূর্ণ

হওয়ার সুযোগ খুঁজে পেল। সে সুযোগটা বুঝি অনির্দিষ্ট কালের জন্যে হাতছাড়া হতে চলেছিল।

এর মধ্যে অতীশদার সঙ্গে ছোড়দির অনেক কথাই হয়েছে। ওর সাক্ষাতে বা অসাক্ষাতে কি কথা যে দুজনের হত তা ওদের কারো মুখ দেখে ঠাওর করতে পারে না। অনেকদিন অফিস থেকে ফেরার পর ঘরে ঢুকে দেখেছে অতীশদা আর ছোড়দি কী গভীর আলাপে নিমগ্ন। ওদের বিনাঅনুমতিতে ঘরে ঢুকে পড়ে মাঝে মাঝে অপ্রতিভ বোধ করেছে। ছোড়দির গলার স্বর আর কথার সুর পালটানোয় বুঝতে পারে ওর সামনে এতক্ষণের টানা প্রসঙ্গ হঠাৎই চাপা দিতে চায়। আলাপের ঢঙে মনে হয়েছে দুজনে একটা কঠিন সমস্যার আশু সমাধান খুঁজছে। যে কথাটা শুধু দুজনেরই মধ্যে হতে পারে, সেখানে তার মত তৃতীয় ব্যক্তি যে বিঘ্ন ঘটাবে তাতে আশ্চর্যের কিছু নেই। তার অসুবিধে শুধু নিজেকে নিয়ে, বিনা প্রস্তুতিতে নিজের এই প্রবেশকে নিয়ে এই নিষিদ্ধ কক্ষে। কি কথা বলে যে স্বাভাবিক হওয়া যায় এ মুহূর্তে অতীশদা বা ছোড়দির কাছে। যে কথাই বলুক না কেন অতীশদার কাছে হাসি পাওয়ার মত মনে হবে। অতীশদা বুঝতে পারবে ও নিজেকে বিপন্ন অপরাধী মনে করছে। ছোড়দি ঘরের বাইরে গেলে, অতীশদা ওর মনোভাব বুঝতে পেরেই যেন বলে, আর তো পারা গেল না তোমার ছোড়দিকে নিয়ে—

কেন কি হয়েছে ?

তোমার ছোড়দি এবার চাকরির জন্যে উঠে পড়ে লেগেছেন।

ও। কথার শেষে হাসির সঙ্গে অতীশদার প্রশ্নের কৌতুকটুকু উড়িয়ে দিতে চায়।

আরে! তুমি হাসছো যে ?

তা এ কথায় কি করা উচিত বলুন।

না, কথাটা একেবারে উড়িয়ে দেবার মত নয়।

তার মানে ? আমাকে সিরিয়স হতে বলছেন ?

বিকজ সি ইজ সিরিয়স।

বেশ বলুন, তাহলে আই অ্যাম অলোয়েজ সিরিয়স।

আমাকে কদিন ধরে কি বলছে জান ?

কি ?

একটা মাস্টারি খুঁজে দিন।

ইজ ইট্ ?

জাস্ট আস্ক হার ওয়ান্স।

সত্যিই ভাবনার কথা তা হলে।

তোমার চেয়ে তো আমার হান্ড্রেড টাইম্স মোর।

এই ভাবনায় কি আবার ডুব মারবেন না কি ?

আরে না না, হেসে ফেলে অতীশদা।

তবে মাথার মধ্যে ঘুরছে কিছু একটা, জানেন, আমি কিছুদিন ধরেই এটা আন্দাজ করছি।

কী বল তো ?

কী তা আমি কি করে জানব, বেশ বলেন, এমন করে কথা ছেড়ে দেয় যে ওর অসমাপ্ত কথার ইঙ্গিতটুকু ধরবার জন্যে অতীশদাকে দ্বিগুণ উৎসাহিত করে তোলে। যেটুকু প্রচ্ছন্ন থাকে অসম্পূর্ণ কথা কটার আড়ালে তা বোধ হয়, আপনি থাকতে এ ব্যাপারে আমি ?

ওই আমি যা বললুম তা-ই, ওই কথাটাই ঘুরছে মাথার মধ্যে দিনরাত।

বেশ চিন্তায় ফেললেন।

তোমায় একটু খুলেই বলা যাক। আমায় কদিন ধরে কি বোঝাচ্ছে জান, এবার আপনি একটু রেস্ট্ নিন, আর আমি ঘোরাঘুরি করি। পরীক্ষা দেওয়ার কথা বলতে বলে কি জান ? যে রাঁধে সে চুল বাঁধে না মনে করেন ? মাস্টারি করে পড়লে আরও বেশি উৎসাহ পাওয়া যায় নাকি! সব সময় মনের মধ্যে খচ খচ করে একটা ডিগ্রি ছাড়া কি মাস্টারি করা চলে। আর টাকাই বা কি পাওয়া যাবে। এদিকে অভিজ্ঞতাও হবে আর সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োজনের তাগিদে ডিগ্রিটাও নেওয়া হবে। মানে বুঝতে পারছ, এক ঢিলে দুই পাখি মারবেন।

তা আপনি বললেন কি ?

আমি সবচেয়ে সোজা আর যৌক্তিক প্রশ্নটা করলাম। সবই তো

বোঝা গেল, কিন্তু এখন সেই অসামান্য চাকরিটি নিয়ে অপেক্ষা করছেন কে? কি যে বাজার তার তো কোন ধারণা নেই।

কি বলে তার উত্তরে?

বলে, সে সব আমি ভেবে ঠিক করে রেখেছি।

কে? ও নিজেই সব ভেবে চিন্তে ঠিক করে রেখেছে। যাক আমি তা হলে ঠিকই আন্দাজ করেছি।

হ্যাঁ, তা প্রায় করেছ, তবে আর খানিকটা করতে হবে।

কি রকম?

এ ব্যাপারে আমার কাঁধে একটা কাজের ভার পড়বে।

তাই না কি—কি?

আমায় দেখা করতে হবে পত্রবাহক হয়ে।

কোথায়?

সেটা তো এখনও জানা হয়নি। জানবারই চেষ্টা করছিলুম এতক্ষণ। এখনও না কি ভেবে ঠিক করা হয়নি। তবে তুমি যেন ফট করে এক্ষুনি কিছু জিজ্ঞাসা করে বোস না আবার।

আরে, আমি কি জিজ্ঞাসা করব? কিছু জানলে তো? ওর এই স্বীকৃতিতে অতীশদা বুঝি নিতান্ত আশ্বস্ত হল।

ওর ব্যবহারে কথায় ছোড়দির এই নতুন ইচ্ছার কথাটা যে জানবার জন্যে সে আর বেশি আগ্রহী তার কিছু মাত্র প্রকাশ পেল না। অথচ ছোড়দির অনুপস্থিতিতে অতীশদা ওকে খুচরো, অনেক খবরই দিল। অতীশদার মুখ থেকে যখন ছোড়দির কথা একটু একটু করে জেনেছে, তখন তাঁর কাছ থেকে এই নিষেধাজ্ঞাও পেয়েছে, মা'র কানে যেন ছোড়দির ইচ্ছের কথা ঘুণাক্ষরেও না যায়। সব ব্যবস্থা পাকাপাকি করে তবে ছোড়দি মাকে জানাবে। আর ইতিমধ্যে মা'র কানে যদি কোন কথা ওঠে তো রক্ষে নেই। নানান কৈফিয়ৎ তলব করবে, শেষ পর্যন্ত চেষ্টা করে দেখার আগেই সব কিছু হয়তো কোথায় উড়িয়ে ফুরিয়ে দেবে। ওর কাজ নেহাৎ হালকা নয় একেবারে। মা'র সঙ্গে কথাবার্তায় অনেকখানি অভিনয় করে যেতে হবে, যাতে ছোড়দির ইচ্ছে কার্যকরী হওয়ার আগে আসল সত্যটা মা'র কাছ থেকে অনেকদিন গোপন থাকে।

অতীশদার কাছ থেকে ছোড়দির উদ্দেশ্যের আরও খানিকটা জানতে পারা গেল একদিন। ছোড়দির মন কোন একটা গভীর চিন্তাকে অবিরাম ছুঁয়ে আছে এটা তার খুবই জানা, তবু ব্যাপারটা এমনই যে কিছু হবে তা সে কি করে আঁচ করবে। ঠিক লোকই আসল কথা জানতে পারে। ছোড়দির মনের তলায় তলায় যে মতলব পাক খাচ্ছে, তা যিনি জানতে পারেন তিনি ঠিকই জেনেছেন যথা সময়ে। আর তাঁরই কাছ থেকে জানল কথাটা।

বুঝলে ব্যাপারটা যা ভাবছ তা নয়। গড়িয়েছে অনেক দূর, অতীশদা নিজের স্বাভাবিক ভঙ্গিতে রহস্য করে বলে।

আমি তো শুধু মুখ দেখেই অনুমান করছি।

তোমার ভাবনাও তাই কম।

কিন্তু আপনার মুখ দেখে যে বাড়ছে। অতীশদা হেসে ফেলে ওর কথায়।

তা মিথ্যে বলনি। শেষ পর্যন্ত যা শুনছি তাতে গুরুদায়িত্ব বলেই মনে হচ্ছে।

কি বলে কী ?

ঠিকানা বহুদিন থেকেই জোগাড় করা আছে। এইবার কাজে লাগান হবে সেই ঠিকানা। বসুন্ধরা, তার বোন—এদের তো তুমি জান।

খুব ভাল চিনি। বসুন্ধরা, ওর দিদির নাম কুহেলি। অরবিন্দবাবুর মেয়ে ওরা। অরবিন্দবাবু তো এখন বরানগরে না বনহুগলীতে দোতলা বাড়ি করেছেন।

বরানগরে না, বনহুগলীতে।

ওই রকমই শুনেছি। আমার ঠিক মনে নেই।

বনহুগলীতে, সে তো অনেকদিন হল বাড়ি করেছেন।

হ্যাঁ। তা প্রায় বছর বারো চোদ্দ আগেকার কথা। ভাড়া বাড়ি ছেড়ে ওখানে দুখানা ঘর তুলে উঠে গেলেন। আমরা এলুম ওঁদের বাড়িতে। মাকে সারা জীবন দুঃখ করে বাবাকে বলতে শুনেছি, সবাই-কার ভাগ্য ফিরল, শুধু ফিরল না তোমার। যুদ্ধের সময় অরবিন্দবাবু নানা টুকিটাকি ব্যবসা করতেন শুনেছি। হোটেলে হোটেলে মদ, খাবার

সব সাপ্লাই করতেন সোলজারদের জন্যে। নিয়মিত অর্ডার পেয়ে, সাপ্লাই দিয়ে বেশ টু পাইস কামিয়েছেন শুনেছি। যিনি এত কাজের কাজ করতে পারেন, বাড়ি করার কাজটা কি তিনি ভুলে যাবেন মনে করেছেন না কি ?

কিন্তু তারপরও যে আর কাজ করেছেন সে খবরটা রাখ ?

আবার কি করলেন ?

শুধু বাড়ি হলেই হয় না বুঝলে, সোস্থাল পোজিশনের জন্যে আর দুচারটে জিনিসের দরকার। অরবিন্দবাবু ইজ ভেরি এ্যালার্ট।

তার মানে বলছেন নেম অ্যাণ্ড ফেম—এই তো।

ইয়েস। হি ইজ এ্যাট্ প্রেজেণ্ট সেক্রেটারি অফ এ গার্লস স্কুল।

ইজ ইট ? শুনেছিলুম বটে—

তুমি আছ কোথায়।

না, আমার ঠিক পরিষ্কার মনে ছিল না।

নাউ ইউ এ্যাড্ মিট হি ইজ এ ম্যান অফ পোজিশন।

আই মাস্ট।

এবার তবে জেনে রাখ যে-চাকরির কথা এতক্ষণ বলা হচ্ছে সে-চাকরির জন্যেই অরবিন্দবাবুর বাড়ির ঠিকানা এত দরকার।

যাক এবার তবে যাত্রা করছেন বোঝা গেল।

হ্যাঁ, শুভ দিনক্ষণ দেখে বেড়িয়ে পড়া আর কি।

আর এর পরেই ছোড়দির সামনে কথাটা উত্থাপন করল একদিন অতীশদা। ছোড়দি অবাক হল না। শুধু জানান দিল ছোড়দির সঙ্গে অতীশদার যেমন অনেক গোপন কথা পরামর্শ হয়, আবার সেই গোপন কথা নিয়ে আরও গোপনীয় আলোচনা তারই সঙ্গে হয় কখন কখন অতীশদার আড়ালে। হাসতে হাসতে স্বভাবসিদ্ধ কায়দায় অতীশদা ছোড়দিকে লক্ষ্য করে তাকে বলেছে, চিঠি নিয়ে তো যাচ্ছি বুঝলে, এখন প্রাণ নিয়ে ফিরতে পারলে হয়।

কি রকম ? অতীশদাকে উৎসাহিত করবার জন্যেই অতিরিক্ত আগ্রহ নিয়ে প্রশ্ন করে।

কেন, সেই চিঠির গল্প শোননি ?—যাহার কথা বলিয়াছিলুম এই

পত্রবাহক সেই লোক। যেদিন পত্র পাইবে সেই দিন রাত্রেই ইহার প্রাণনাশ করিবে। প্রথমে আদর আপ্যায়ণের ত্রুটি করিবে না, নতুবা ইহার মনে সন্দেহ জাগিতে পারে। কথা মত কাজ করিয়ো।

অতীশদার কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সে আর ছোড়দি দুজনেই হেসে ফেলে।

তার মানে আমায় কি বলতে চাইছেন বুঝতে পারছি। আমি একটি রাক্ষসী—এই তো, ছোড়দির মুখের কথার সঙ্গে চোখের দৃষ্টি আর গলার স্বরের কোন মিল নেই কিন্তু।

অতীশদা কথার সুত্র খুঁজছিল, আর পেয়েও গেল। বলল, না এটা একেবারেই মডার্ন ব্যাপার তো, তাই কনক্লুশানে হত্যা-টত্যা কিছু নেই। তবে যা শুধু অনেক মিষ্টি কথা শোনাবার পর বলবে, এখন তো ঠিক এ মুহূর্তে কোন ভেকান্সি নেই—খুব বেশি কোয়ালিফায়েড ক্যাণ্ডিডেট হলে না হয় চেষ্টা করে দেখা যেতো। আদর যত্ন খুবই করবে, চাকরিটাই নেহাৎ দেবে না যা।

আর যদি দেয়, তা হলে ?

তা হলে বাজি হারা

বেশ। মনে রাখবেন কিন্তু। অনিন্দ্য সাক্ষী রইল, ছোড়দি আবার সেই ছেলেমানুষী ভঙ্গিতে বাজি রাখার মত করে কথার শেষে ওর দিকে তর্জনী তুলে দেখায়।

কুহেলিকে সে একবার না দুবার মোটে দেখেছে সারা জীবনে। বসুন্ধরার বোন বলেই যা কুহেলিকে স্মরণে রাখতে হয়েছে। না হলে হয় তো কবে একদিন স্মৃতিতে তার অবয়ব ফিকে হতে হতে সম্পূর্ণ বিস্মৃতির রূপ পেত। বসুন্ধরা তার দিদির কথায় মুখর হয়ে উঠত। দিদির সম্পর্কে তার গর্বের ভাব এখন মনে পড়ে অল্প অল্প। খুব ভাল ছবি আঁকত নাকি বসুন্ধরার দিদি কুহেলি। তার দিদির আঁকা যে-ছবি দেখিয়েছিল বসুন্ধরা তাকে আর ছোড়দিকে দেয়ালের গায়ে তা দেখে ওরা দুজনেই বাস্তবিক মুগ্ধ হয়েছিল। অথচ এই কুহেলি বা অরুদি এরা কেউই তাদের শিল্পের যথাযথ চর্চা করল না। কুহেলি শিল্পী হল

না, আর অরুদিও হল না যথার্থ ক্যামেরাম্যান। এদের দুজনের কারও কথাই ওর বেশি করে ভাববার নয়। তবু ও ভেবেছে, আর ভেবে আশ্চর্য হয়েছে আর কোথায় দুঃখ পেয়েছে। বাংলা দেশের বেশির ভাগ মেয়েই এমনি করে বিয়ের পর সংসারের ভিড়ে হারিয়ে যায়, তখন তাদের পূর্ব জীবনের, কৈশোর বা যৌবনের কোন কৃতী শিল্পকর্মের সামান্য চিহ্নটুকুও থাকে না। অরুদিরও একদিন বিয়ে হয়ে যাবে শেষ পর্যন্ত। আর সেই অরুদির ভিতরের ক্যামেরাম্যানকেও খুঁজে পাওয়া যাবে না।

কুহেলির বিয়ে অনেকদিন আগেই হয়ে গেছে। এখন সে সন্তানের মধ্যে নিজের অসমাপ্ত শিল্পচর্চার কোন গুণ খুঁজে বার করার চেষ্টা করছে কি। তার বিয়ের খবর ছোড়দির কানে যথা সময়ে পৌঁছেছে। তবু ছোড়দি সে-খবরে বিশেষ বিষণ্ণ বোধ করেনি বোধ হয়। তবে বসুন্ধরার বিয়ের খবরটা যেদিন হঠাৎ ছোড়দির কানে এসে পৌঁছল ছোড়দিকে কেমন একটু অসহায় মনে হয়েছিল। শ্বেতার বিয়ে হয়ে গেল, তারপর বসুন্ধরারও বিয়ে হয়ে গেল। তবে কি শুধু ছোড়দিই পড়ে থাকবে। বিয়ে হওয়ার আগে পর্যন্তও মেয়েরা কেমন থাকে যেন। অনেক দূরে দূরে থেকেও বন্ধুত্ব বজায় রেখে চলতে পারে। কিন্তু বিয়ের পরই বুঝি দলছাড়া হয়ে পড়ে। কাছে পিঠে থেকেও সব যোগাযোগ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।

বসুন্ধরার কথা তবু ভোলেনি ছোড়দি। দেখা সাক্ষাতের সুযোগ সুবিধে ক্ষীণ হয়ে এলেও স্মরণে বসুন্ধরাকে সজীব করে রেখেছে। ছেলেবেলার জীবনের এমন কেউ কেউ থাকে যারা স্মৃতির খোলা পাতায় নিজেদের কুঁদে রেখে যায়, কিছুতে যে নাম তোলা যায় না। বিস্মৃতির সহস্র ঢেউ এসেও তাদের ভাসিয়ে নিয়ে যেতে পারে না। সময়ের হাত পড়েনি এমন কিছুই নেই জাগতিক সংসারে। সময়কে স্মৃতির বড় ভয়। সময়ের ছোট বড় ব্যবধানে স্মৃতি যে বিবর্ণ হয় না তা নয়। তবু এমন অনেক নাম থাকে, এমন নামের অনেক মুখ থাকে যাদের স্মৃতি অবহেলা করতে পারে না, সময়ের দুঃসহ নির্মম অত্যাচারেও। বসুন্ধরাকে, বসুন্ধরার নাম আর মুখ স্মৃতিতে প্রায় অক্ষুণ্ণ রাখার চেষ্টা করে এসেছে ছোড়দি। যদিও মনের ভীতি একেবারে তাড়াতে পারেনি। বিয়ের পর স্বামীর

সংসারে সেই কবেকার হারিয়েযাওয়া বসুন্ধরাকে এখনও অটুট ফিরে পাওয়া যাবে ?

এই বসুন্ধরাকেই লিখেছে ছোড়দি। তাকে অনুরোধ করেছে তার বাবার স্কুলে একটা চাকরি করে দিতে হবে। কেমন করে দেবে তা সে জানে না। তবে এটুকু বিশ্বাস রাখে, বসুন্ধরা থাকতে তার বাবার স্কুলে পারুলের একটা চাকরি নিশ্চয় হবে। ছোড়দি আরও জানিয়েছে, এই চাকরির ওপর তার ভবিষ্যত নির্ভর করছে। কারণ ডিগ্রি তাকে একটা নিতেই হবে। আর তা ছাড়া স্কুলের চাকরির ব্যাপারেই তার ডিগ্রির প্রয়োজন অনিবার্য। তার বাবার সঙ্গে পরে গিয়ে সে দেখা করবে। আগে বরং সে-ই একটু বলে রাখুক। তারপরে সে নিজেই যাবে একদিন তার কথা মত। ঠাট্টা করে আরও একটু লিখেছে, জানিস তো আজকাল সুপারিশ ছাড়া কোথাও টুঁ-করা যায় না। তাই তোকেই আগে থেকে ধরাধরি করছি। আমার চাকরি শখের নয়, এটা কিন্তু ভুলিস নে।

চিঠিখানার ওপর এক পলক চোখ বুলিয়ে নিয়েই অতীশদা বলেছে, শখের নয় আবার। এ চিঠি পড়েই বুঝতে পারবে, চাকরি শখ ছাড়া আর কিছু নয়। যার চাকরি ছাড়া চলবে না সে পড়ি-মরি করে নিজে ছুটে যায়। বেয়ারা দিয়ে পাঠায় না।

বসুন্ধরা এখানে আছে কিনা কি করে জানব। বেশ বলেন এক একটা। আর এ সব চিঠি পোস্টে দিলে ভাল দেখায়। আপনাকে বসুন্ধরা খুব ভাল চেনে। নামটা একবার শুনলেই দেখবেন মুখের চেহারা কি রকম হয়, বেয়ারা মনে করবে না অন্তত, ছোড়দি কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে ও ছোড়দির সলজ্জ দৃষ্টির ইশারা ধরতে পারে। অতীশদার দিকে চেয়ে বুঝতে পারে, ক্ষণিকের চকিত অবকাশে কখন একটুখানি লজ্জা অতীশদাকেও ছুঁয়ে গেছে তার স্বাভাবিক পৌরুষকে নাড়া দিয়ে, নিস্তেজ করে।

বুঝতে পারছি, খুব খাতিরের ব্যাপার। বেয়ারা মনে করবে কোন দুঃখে, সম্রাট মনে করে সিংহাসন পেতে দেবে, এই তো ?

আমি বেয়ারা বলিনি আগে। আপনিই বলেছেন, বেয়ারা দিয়ে পাঠায় না, ছোড়দি অন্যায়ের প্রতিবাদ করার মতো বলে।

যাক কাল পত্র নিয়ে শুভ যাত্রা করা যাক, কি বলো। লোকে যে কি করে বেকার থাকে তা বুঝি না। এই ছাখো, বেকার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই কেমন চাকরি জুটে গেল, অতীশদা তার দিকে তাকিয়েই সমানে কথা বলে।

দিন, আমার চিঠি আমায় দিয়ে দিন। আমি পোস্টেই পাঠাব, ছোড়দি হাত বাড়ায়। ও অতীশদা আর ছোড়দির দিকে এক মুহূর্ত তাকিয়ে থেকে লক্ষ্য করে দুজনের নীরব দৃষ্টি বিনিময়।

অতীশদা চিঠিখানা সেই যে একবার পকেটস্থ করেছে তা আর দ্বিতীয়বার ছোড়দির সামনে বার করেনি। ছোড়দিও তাই নিশ্চিন্ত হয়েছে। ডাকে পাঠাতে হয়নি ছোড়দিকে চিঠিখানা। চোখ বুঁজে ভাবতে পেরেছে বসুন্ধরাকে লেখা চিঠি বসুন্ধরার হাতে না-পড়লেও অরবিন্দবাবুর হাতে পড়েছে। আর তারপর যথাযথ ব্যবস্থাও হয়েছে চিঠিখানার। তারপর? সেটাও কি ছোড়দি মনে মনে হিসেব করে রাখেনি।

অতীশদা চিঠি পৌঁছিয়ে দিয়েছে ছোড়দির দেওয়া-ঠিকানায়। নির্ভুল সম্পন্ন করেছে অতীশদা। অরবিন্দবাবুকে নিজের পরিচয় যতটুকু দিয়েছে তার সহস্র গুন করে বলেছে তাঁর মেয়ে বসুন্ধরার সঙ্গে ছোড়দির সম্পর্কের কথা।

ছোড়দির বিয়ের কথাও তুলেছেন তিনি কথার ফাঁকে ফাঁকে। অতীশদা নাকি বেশ গুছিয়ে গাছিয়ে কথার উত্তর দিয়েছে। তাঁর কথার, আলাপের কোনও অসতর্ক ফাঁকেও নাকি অরবিন্দবাবু সন্দেহ করতে পারেননি একমাত্র ও অদ্বিতীয় সম্ভাব্য পাত্রটি অতীশ বোস ছাড়া আর কেউ নয়। যত শুনেছেন বা জিজ্ঞাসা করেছেন ছোড়দির কথা বা তাদের পরিবারের কথা তার চেয়ে অনেক বেশি বলেছেন নিজের জীবনের সাফল্যের কথা, বর্তমান আর ভবিষ্যতের নব নব কর্মপন্থার কথা। কথার ফাঁকে তার সম্পর্কে একবার মন্তব্য করেছেন, সে তো এখন একেবারে লায়েক হয়ে গেছে। কতটুকু দেখেছিলুম ওকে। তা কাজ কর্ম কিছু করছে না কি?

অতীশদা জবাবে সংক্ষেপে বলেছে, হ্যাঁ করছে একটা।

এতেই সন্তুষ্ট হয়েছেন অরবিন্দবাবু। যেন এর বেশি প্রত্যাশা তার

মত ছেলেদের কাছ থেকে তাঁর আর কিছু নেই। বলেছেন, ভাল ভাল। গোড়া থেকে একটা চাকরি বাকরিও যদি মন দিয়ে করে—একটু থেমে অন্যপথে কথা ঘুরিয়েছেন, তবে কি জান, আজকাল ছেলে ছোকরাদের মধ্যে অ্যাম্বিশন দেখি না। না পড়াশুনোয় না চাকরি বাকরিতে। কোন গতিকে হাতের কাছে যা পেলো তা-ই নিয়েই ঠেলে ঠুলে চলল। দেখছি তো নিজের জামাইদের। অমন কোয়ালিফায়েড ছেলে হয়েও শুধু বাপের সম্পত্তির ওপর নির্ভর করে জীবনটা কাটিয়ে দিতে চায়। আমার বড় জামায়ের কথা বলছি। আর আমি ছাখো, এখন এ বয়সে শুধু এ্যাম্বিশান নিয়ে বেঁচে আছি। কোথায় ব্যবসা, কোথায় স্কুল, নিঃশ্বাসটুকু ফেলার সময় নেই। সবাই দেখছে আমি বড় হয়েছি আজ, পয়সা করেছি। কিন্তু আমিও তো একদিন ছোট ছিলুম রে বাপু। কাঠ খড় যে কি পুড়িয়েছি সে হিসেবটা কেউ রাখে, তাঁর কণ্ঠের ক্ষোভ অতীশদার মনে হয়েছে কোনদিন নিঃশেষ হবার নয়।

আসল কথাটার একটা সুরাহা করার প্রত্যাশায় ক্লান্তিকর বক্তৃতাও অম্লান মুখে অতীশদা ধৈর্য ধরে শুনেছে। শেষে বলেছে, চিঠিখানা একটু মনে করে পৌঁছে দেবেন। আর যদি সম্ভব হয়তো এই ঠিকানায় একবার আসতে বলবেন না, অতীশদা আলাদা একটুকরো কাগজে তাদের বাড়ির ঠিকানাটা লিখে অরবিন্দবাবুর হাতে দিয়েছে। চাকরির কথা ভেঙে কিছু বলেনি।

আরে ঠিক আছে ঠিক আছে, লেখবার আর দরকার হবে না, অতীশদার হাত থেকে কাগজের টুকরোটা নিতে নিতে প্রায় কৃত্রিম হেসেছেন নাকি অরবিন্দবাবু।

তারপর এক পালা হল অতীশদা ফেরবার পর। ছোড়দিকে প্রায় কাঁদিয়ে ছেড়েছে।

বুঝলে অতীশ বোসের মত উন্নাসিক লোকেরও নাক ভেঙে দিতে পারে এমন লোক আছে সংসারে। এই না হলে স্কুলের সেক্রেটারী। অতীশদা তার দিকে চেয়ে ছোড়দিকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলে।

আপনি গেলেন কেন? আমি তো বলেছিলুম পোস্টে পাঠাব। যাওয়াও চাই আবার কথাও শোনাবেন—

পোস্টে পাঠালে আর দেখতে হত না। সেক্রেটারীর মেয়ের কাছ থেকে নয়, স্ট্রেট্‌ একেবারে সেক্রেটারীর কাছ থেকেই রিপ্লাই আসত।

তা যা বলেছেন, কথাটা যেন তারিফ করার মত, এমনি ভাবে ও অতীশদার ওপর থেকে চোখ তুলে ছোড়দির মুখের ওপর সরিয়ে নিয়ে যায়।

চাকরি হবার আগেই তো এই। চিঠি নিয়ে যাও, তারপর এ্যাপ্লিকেশন নিয়ে যাও। আর, এরপর বাকি আছে কী কী জান? চাকরি হলে স্পেশাল ট্র্যামে বা বাসে তুলে দাও, টিফিন ক্যারিয়ার হাতে নিয়ে টিফিন পৌঁছে দাও, আর অ্যাব্‌সেন্ট হওয়ার দরকার হলে স্কুলে গিয়ে পড়িয়ে দিয়ে এস।

সব সম্ভব হলেও ওটি সম্ভব নয়, বুঝতে পেরেছেন। মনে রাখবেন—ওটা গার্লস স্কুল।

রিয়েলি ইট ইজ সো, আপনি ভুলে যাচ্ছেন...

বেশ ঠিক আছে। লাইফে অ্যাম্বিশন থাকার দরকার তো? আজ থেকে আমার অ্যাম্বিশন হল গার্লস স্কুলের সেক্রেটারী হওয়া—কি?

হ্যাঁ, তা হতে পারেন, ও সায় দেয়।

অ্যান্‌ আইড্‌ল ব্রেন ইজ এ ডেভিল্‌স ওয়ার্কসপ, ছোড়দি প্রেমের দৃষ্টিতে কিঞ্চিৎ কৃত্রিম ভর্ৎসনা মিশিয়ে বলে। অতীশদাও এই চাইছিল বোধ হয়। উৎসাহিত হয়ে শেষ কথা কটি বলেই উঠে দাঁড়ায়, ইয়েস, হিয়ার ইজ অ্যান্‌ আইডিয়াল স্কুল মিস্ট্রেস।

আই অ্যাম্‌ ওয়ান উইথ ইউ, সে উপসংহারটুকু জুড়ে দেয়।

চার না পাঁচ দিন মোটে কেটেছে এরপর। ছোড়দির ধৈর্য ধরা আর সহ্য হচ্ছে না মনে হয়। চিঠি পাঠানর পর থেকে পাড়ায় পিওন এলে, ছোড়দির চোখমুখের বা চলাফেরার ব্যস্ততায় একটি কথাই মনে হয়েছে, পিওনের ব্যাগে যত চিঠি আছে সব ছোড়দির, আর সে সব চিঠিরই সংবাদ এক। কারণ তাদের লেখিকা বসুন্ধরা, সমস্ত চিঠিগুলোরই বিষয় এক। ছোড়দির চাকরির কথা, বসুন্ধরার বাবার স্কুলে।

একদিন পিওন তাদের বাড়ির দু চারখানা আগের বাড়িতে কড়া নেড়েও তাদের দরজায় যখন এল না, তখন ছোড়দির চোখে আফসোসের বেদনা

তাকেও একটু বিচলিত করল। বুঝল ছোড়দি বসুন্ধরার চিঠির জন্যে মরিয়া হয়ে উঠেছে। হাবভাবের ব্যস্ততায় ছোড়দি নিজের কাথাটারই সাক্ষ্য দিলে, চাকরির ইচ্ছেটা সত্যিসত্যিই একটা খামকা খেয়াল বা শখ নয়। নিতান্তই আন্তরিক ইচ্ছে ওটা।

অত ছটফট করছিস কেন? তোর চিঠি এলে কি কেউ কেড়ে রেখে দেবে?—তবু ও না-বলে পারেনি।

নিজের ব্যাপার হলে বুঝতে পারতিস, ছোড়দির কথার ঢঙে উৎসাহে কোথায় ভাঁটা পড়েছে মনে হল। আর মনে হওয়াটাও অহেতুক কিছু নয়। যে রকম উঠে পড়ে লেগেছে ছোড়দি।

স্থাখ এসে যাবে শিপ্রা, কথাগুলো যে সান্ত্বনায় ভিজেছে নিজেরই কানে মনে হল।

না আঁচালে বিশ্বাস নেই রে কিছু।

সেটা সত্যি। তবে তোর কেস বলেই যা আমার কিছুটা আশ্বাস, আবার কথা বলে ও ছোড়দির মনে হারানো বিশ্বাস ফিরিয়ে আনতে চায়।

ওরা নিজেরা কিছু না-জানালে আবার লোক পাঠিয়ে খোঁজ নেওয়া ভাল দেখায়?

না না, সেটা মোটেই ভাল হবে না।

পোস্টে চিঠি পাঠাব একখানা?

কিচ্ছু পাঠাবার দরকার নেই। একটু ধৈর্য ধরে থাক।

ছোড়দির মুখের দিকে তাকালে মনে হবে, ছোড়দির দৃষ্টি শুধু বলছে, বিপাকে পড়লে এমন সান্ত্বনা তুমিও আমার কাছ থেকে পেতে। আর তখন বুঝতে এমন সান্ত্বনায় মনের উৎকণ্ঠা বাড়ে বই কমে না। সবই বুঝতে পারে কিন্তু করতে পারেটা কি। হয় তো অনেক কিছু করার দরকার ছিল তবু শেষ পর্যন্ত সে বা ছোড়দি অপেক্ষা করা ছাড়া আর কিছুই করল না।

সপ্তাহের শেষে রবিবারের গা-ঢালা দুপুর। ওদের বাড়ির দরজায় জোর কড়া নাড়ার শব্দ উঠল।

সে দুপুরের খাওয়া সেরে সিগারেট ধরিয়ে স্মৃতির মামাবাবুর দেওয়া

উপন্যাসখানা নিয়ে বসেছে। শেষ করতেই হবে, এমন একটা জেদ মনের মধ্যে জোর করে চেপে বসেছে। আর কারণও আছে। স্মৃতিদের বাড়িতে যে কতদিন যায়নি তা প্রায় হিসেব করে বলা মুশকিল। ফোনে দু চার দিন কথা হয়েছে, অফিসেও নাম মাত্র দেখা সাক্ষাত হয়েছে। তাও চায়ের দোকানে দু কাপ চায়ের মুখোমুখি হাত ঘড়ির দিকে কড়া নজর রেখে বাঁধা-ধরা সময় নিয়ে। স্মৃতি বাড়ি যাওয়ার কথা তুললেই ছল ছুতোয় কাটিয়ে দিয়েছে। অফিসের কাজের চাপের কথা বার বার উল্লেখ করেছে, বাড়ির নানা ছোটখাট সমস্যার কথা তুলেছে। মাথা ঠাণ্ডা করে হাতে সময় নিয়ে কোথাও বসে দু চার ঘণ্টা গল্প করা বা কথা বলার সময় তার মোটেই নেই স্মৃতির অভিমান চাড়া দিয়ে উঠল। আর বেশি অনুরোধও করল না স্মৃতিরেখা। তাই ক'দিন ধরেই তার ভাবনাটা বেড়েছে। স্মৃতিরেখার সঙ্গে দেখা করার একটা তাগিদ অনুভব করছে মনের কোন অজ্ঞেয় অস্পষ্ট নিভৃতে। তারও অভিমান স্মৃতির মত প্রবল না? কিন্তু অনেকদিন যে স্মৃতিদের বাড়িতে যায় নি। তাদের বাড়ির পথের কথা ভাবলেই পা দুটো যেন জড়িয়ে যাবে মনে হয়। অথচ কোন একটা সহজ ছুতোয় যদি যাওয়া যেত। শেষকালে মনে পড়েছে স্মৃতির মামার দেওয়া ইংরেজ লেখকের উপন্যাসখানার কথাই। অনেকদিন ধরে বইখানা পড়ে রয়েছে। কিংবা হয়তো আটকেই রেখেছে সে নিজের কাছে। তাই ভাবল তাড়াতাড়ি শেষ করে ফেরত দিয়ে আসার কথা। যেন এই বইখানা পড়ে না থাকলে সে যে আবার কবে স্মৃতিরেখাদের বাড়িতে আসত তা নির্দিষ্ট করে বলা শক্ত। এই মতলবটা মাথায় আসায় খুশি হয়ে বইখানা পড়ে ফেলার জন্যে সে যেন একটু বেশি তৎপর হল। মনে মনে সব ব্যাপারটাকে নিজের বিবেক বুদ্ধি দিয়ে বিচার করে সে মজা পেল, আপন মনেই হাসল বা। অর্থাৎ যে বই তার এমন উপকার করতে পারে প্রয়োজনের মুহূর্তে, সেই বইয়ের লেখকের প্রতিও তার বিশেষ দায়িত্ব আছে। আর এই কৃতজ্ঞতা বোধ থেকেই অসীম নিষ্ঠা নিয়ে সে বইখানা শেষ করবে, এই মন নিয়ে পড়তে শুরু করেছে।

ছোড়দি পাশের ঘরে দিবানিদ্রায় পূর্ণ মগ্ন হয়েছে। মাথার কাছে নিশ্চয়ই পাঠ্য পুস্তকের খানকয়েক ইতস্তত ছড়িয়ে রেখেছে। যেন

পরীক্ষার প্রয়োজনের চেয়ে অলস মধ্যাহ্নের নিরুপদ্রব নিদ্রা আনার প্রয়োজনেই তাদের আরও বেশি দরকার।

ঠিক এমন জোরে তাদের দরজায় অনেকদিন কেউ কড়া নাড়েনি। কারণ পরিচিত সবায়ের কড়া নাড়ার শব্দ শুনে শুনে তার কান অভ্যস্ত। কেবল অনেক সময় মনি-অর্ডার নিয়ে এলেই পিওনকে এমন কড়া নাড়তে শুনেছে কখন সখন। যেন বুকের মধ্যে ঢেড়া পিটল কেউ।

বইখানা উলটো করে রেখে বালিশের ওপর ও উঠে বসে একটু সময় নেয় সে। কিছু সেকেণ্ড বিরতির পরে আবার দ্বিতীয়বার সজোরে কড়া নাড়ার শব্দ আসে। মনে মনে ভাবে, তাকে হঠাৎ আবার এ সময়ে কার দরকার পড়ল। দীনেনের কাছে বাড়ির ঠিকানা আছে তবে কি দীনেনই এসেছে এবার শেষ চেষ্টায় মরিয়া হয়ে? ভাবতে ভাবতে জানালার কাছে এগিয়ে যায়, চোখ নিচু করে দেখে। পিঠের ওপর থেকে ঝোলা আঁচলটাই বেশি করে চোখে পড়ে। অদ্ভুত কায়দায় বাঁধা বড় খোঁপাটাও নজরে পড়ে এক দৃষ্টিতে। একটি বাহু ঘাড়ের ওপর তুলে খোঁপার ওপর আঙুল বুলিয়ে চুল ঠিক করছে। মেয়েটির মুখ কার হতে পারে কিছুতেই আন্দাজ করতে পারে না। কাপড়ের রং দিয়ে বিচার করলে স্মৃতিরেখাও হতে পারত।

দাঁড়ান, ঘরের জানালায় মুখ রেখে দৃষ্টি নিচু করে ও বলে।

সঙ্গে সঙ্গে ওপর দিকে মুখ তোলে মেয়েটি। জানালায় তার ঊর্ধ্ব দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখে স্বল্পক্ষণ। আর সেই ফাঁকেই চোখাচোখি হয় ওর সঙ্গে। চকিতে জানালা থেকে সরে আসে, ঘরের বাইরে এসে বৈদ্যনাথকে দরজা খুলে দিয়ে আসতে বলে।

বৈদ্যনাথের দুপুরের খাওয়া তখনও সারা হয়নি, খেতে খেতেই উঠে পড়ে। অন্য সময় হলে হয়তো ও বলত, আচ্ছা বৈদ্যনাথ তোমাকে উঠতে হবে না, আমিই দেখছি। কিন্তু এ মুহূর্তে পারল না। অপরিচিত মেয়েটির সঙ্গে চোখাচোখি হওয়ার কথা ভাবতেই কেমন লজ্জা পেল। কি ভাবতে পারে মেয়েটি? কিছুই না হয়তো। তবু ওর নিজে গিয়ে দরজা খুলে দেওয়াটা কেমন বাধো-বাধো ঠেকল কে, কি দরকারে এসেছে, বৈদ্যনাথই গিয়ে আগে জেনে আসুক।

আর সামান্য কটি মুহূর্ত যাবার পরই বৈদ্যনাথ ওপরে চলে আসে সংবাদ নিয়ে। ওর বুঝি তর সইছিল না। বৈদ্যনাথ আসার সঙ্গে সঙ্গেই প্রশ্ন করে, কে বৈদ্যনাথ ? নাম জিজ্ঞাসা করেছ ?

না, দিদিকে একবার ডেকে দিতে বললে।

নামটা জিজ্ঞাসা করতে হয়।

আমায় যেতেই বললে, তুমি একবার ডেকে দাওনা ওনাকে, পারুল দিদির নাম করলে।

ডেকে দিচ্ছি, বলেছ তো ?

হ্যাঁ।

ও তাড়াতাড়ি পাশের ঘরে গিয়ে ছোড়দিকে ঘুম থেকে তোলে। খুব জোরে নাড়া দেয় পিঠের ওপর, ডাকে, এই ছোড়দি—এই !

ধড়ফড় করে উঠে বসে, এমন চোখে চায়, তাকালেই মনে হবে দুপুরের গাঢ় ঘুমে কিছুক্ষণের মধ্যেই প্রায় অচেতন হয়েছিল ছোড়দি।

এই তোকে কে ডাকছে নিচে অনেকক্ষণ।

আমাকে ! তন্দ্রাচ্ছন্ন যে ভাবটুকু এতক্ষণও ছিল তা যেন নিমেষে ছিঁড়ে গেল। ঘুমে যদিও বা স্বপ্নের কথা মনে না থাকে, এখন এই হঠাৎ জাগা অবস্থায় ছোড়দি একটা স্বপ্নকে নিজের চারদিকে হাত ছুঁড়ে অনুভব করতে চায়, ছোড়দির চোখে তাকালেই মনে হবে একটা স্বপ্নের বুননকে ছিঁড়ে তাকে অস্বীকার করতে না পারলে ছোড়দি কিছুতেই বিশ্বাস করবে না, তাকে কেউ ডাকছে সত্যি সত্যি। ও আবার মৃদু ঠেলা দেয়, প্রায় উঠিয়েই দিতে চায়।

এই যা না, তোকে নিচে কে ডাকছে। আমি ঠিক চিনতে পারলুম না।

ছোড়দি যেতে যেতেই কাপড়টা একটু গুছিয়ে নেয়। মেয়েদের এই কাপড় গোছান আর খোঁপা ঠিক করা। এর কোন সংখ্যা নেই। হাজার ঠিক থাকলেও কথা কইতে কইতে বা গল্প করতে করতে একটু অবকাশ পেলেই ঠিক করে নেবে, জ্ঞাতসারে কি অজ্ঞাতসারে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই ওদের ওপরে ওঠার অপরিসর ছোট সিঁড়িটা ছোড়দি আর আগন্তুক মেয়েটির কণ্ঠের কোলাহলে ভরে ওঠে। শুনতে

পাওয়া যায় দুজনে কথা বলতে বলতে ওপরে উঠে আসে। ছোড়দি প্রায় জড়িয়ে ধরে নিয়ে আসছে বান্ধবীকে। দুজনের কারও কথা বিচ্ছিন্ন হয়ে কানে আসে না। একমাত্র কণ্ঠস্বরের তফাৎটুকুতে বোঝা যায় দুজনে কথা বলছে। ওরা উঠে বারান্দার মুখোমুখি আসতেই ও চট করে নিজের জায়গায় চলে যায়। আধশোয়া অবস্থায় বইখানা আবার মুখের ওপর তুলে ধরে।

ওর অভিনয় বেশিক্ষণ স্থায়ী হয় না কিন্তু। হুড়মুড় করে ঘরের মধ্যে এসে ঢোকে ছোড়দি বান্ধবীকে নিয়ে। ওকে আর অর্ধশায়িত হয়ে থাকতে দেয় না। সোজা হয়ে উঠে বসতে হয় ওকে। ওপরের জানালা থেকে খোঁপা, ছড়ান কাঁপান আঁচল আর বাহুর কিঞ্চিৎ অংশ দেখে যত সুন্দরী মনে হয়েছিল সামনাসামনি ঠিক সেইরকম সুন্দরী মনে হল না। সাজের মধ্যে সৌন্দর্যবোধের চেয়ে সুগঠিত দেহের বিভিন্ন অংশকে প্রকট করার চেষ্টাই বেশি। উন্নত বক্ষকে আরও উন্নত করে দেখানর মধ্যে কোথায় যেন একটা নির্লজ্জ বেহায়াপনা আছে। (হয়তো অনেকের কাছেই নেই)। না হলে এমন নির্বিকার চিত্তে অতি সূক্ষ্ম শৌখিন আচ্ছাদনের নিচে বক্ষ এমন অস্বাভাবিক উন্নত করে রাখে কি করে। রাস্তায় তারাই যখন অতি লাজনম্র পদক্ষেপে পুরুষের সন্ধানী দৃষ্টিকে উপেক্ষা করে হাঁটে তখন তার মনে দ্বিধা জাগে। এ মুহূর্তে এই মেয়েটির এমন কঠিন উদ্ধত ভঙ্গিতে বুক বাঁধা দেখে তার নিজেরই চোখ নামিয়ে নিতে ইচ্ছে হল। লজ্জা যেন তারই বেশি পাওয়া দরকার অমন স্পষ্ট করে একটি মেয়ের বুকের দিকে চোখ রাখার জন্যে। স্বাভাবিক জিনিসকে অহেতুক অস্বাভাবিক করে তোলার মধ্যে সৌন্দর্য চর্চার যে কি থাকতে পারে তা তার মাথায় আসে না। হয়তো এমনি শখ মানুষের। আর কারও শখের ওপর তো হাত নেই। যাই হোক মেয়েটি বেশ সুশ্রী। সমস্ত চেহারায় এমন চটক আছে যা সাধারণ পুরুষকে টানবে।

ওর মনের মধ্যে চিন্তার আলোড়ন এমন দ্রুত ঘুরে যখন প্রায় একটা পূর্ণ বৃত্তের আকার পাচ্ছে তখন শুনতে পেল ছোড়দির গলার স্বর, একে চিনতে পারিস, বসুন্ধরা।

এই তবে সেই বসুন্ধরা। আরেকবার দ্রুত চোখ বুলিয়ে নেয় বসুন্ধরার সারা অবয়বের ওপর। সিঁথির সিঁদুর অতি শীর্ণ সরু সুতোর মত চুলের দুই স্তবকের মাঝখানের চিহ্নিত প্রায় অস্পষ্ট পথকে একটু রাঙিয়ে গেছে। আর হাতের ঝকঝকে কয়েক গাছা সোনার চুড়ির সঙ্গে শুভ্র শৌখিন সূক্ষ্ম কারুকার্য করা হালকা সরু একটি শাঁখা।

চিনতে না-পারলেও নাম বলে দিতে পারি, অনিন্দ্য রায়, কথার শেষে বসুন্ধরা হাসির সঙ্গে প্রগলভতা ছিটোয়।

বসুন্ধরার কথায় এবার সত্যি লজ্জা পেল। যেন পাকা গৃহিণীর ঢঙে স্নেহ করার মত করে বলে বসুন্ধরা। বোঝাতে চায় একটি বিবাহিতা যুবতী মেয়ে তার বয়সী যে কোন যুবককে নিজের চেয়ে অনেক অনভিজ্ঞ মনে করে, ঠিক এই ভাবেই কথা বলার দাবি রাখে। কিন্তু এটাই বসুন্ধরার সব নয় কিন্তু। তার হাসির এই প্রগলভতা কি একেবারেই অগ্রাহ্য করার মত? বসুন্ধরা জানাতে চায় এমন একটা জীবনের স্বাদ সে পেয়েছে, যা থেকে ও বঞ্চিত। তবু মনে হল এই জীবনের স্বাদ পেলে ছোড়দির যা পরিবর্তন আসতে পারে তা সে এখুনি একবার কল্পনা করে নিতে পারে। আরও একটি ইচ্ছে সে হঠাৎই কি ভেবে পুর্ণ করে নিল। বসুন্ধরার অবয়বের মধ্যে স্মৃতিরেখাকে যেন দেখতে ইচ্ছে করল। তাই বসুন্ধরার শরীরটাকে স্মৃতির শরীর ভেবে কল্পনায় কিছু একটা গড়ার চেষ্টা করল। বিবাহিতা বসুন্ধরা যে নতুন একটা জীবনের স্বাদ পেয়েছে, স্মৃতি তার সামনে দাঁড়িয়ে তাকে সেই জীবনের বিচিত্র স্বাদের কথা বলছে, একটিও কথা না-বলে, শুধু পরমাশ্চর্য দুটি চোখের অপলক দৃষ্টির নিঃসীম নীরবতায়।

এই ভাবনার আগে কিন্তু তাকে একবার হাসতে হয়েছে প্রত্যুত্তরে, যে মুহূর্তে বসুন্ধরা তার নাম উচ্চারণ করেছে। হেসেই সে হাতের বইখানার পাতাগুলো গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত একবার এলোমেলো উলটিয়ে যায় মাথা নিচু করে। আচ্ছা, শ্বেতাদিকে অনেক দিন পরে, যখন প্রথম দেখল তখন কি ঠিক এই সলজ্জ আড়ষ্টতা। কিন্তু বসুন্ধরা সারা সন্ধ্যা উত্তীর্ণ করেও যদি তার সামনে দাঁড়িয়ে থাকে সে আড়ষ্টতা থেকে মুক্তি পাবে? শ্বেতাদির সঙ্গে তার কোথায় একটা অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক থেকে

গেছে। যে সম্পর্ক ঠিক ছোড়দি ছাড়া আর দ্বিতীয় কোন মেয়ের সঙ্গে গড়ে উঠতে পারে না।

আমি ওকে নিয়ে পাশের ঘরে যাচ্ছি, দরকারি কথা আছে। তুই একটু পরে আসিস, ছোড়দি বসুন্ধরাকে নিয়ে তুই ঘরের মধ্যবর্তী দরজার দিকে এগোয়। পিছন ফেরবার আগে বসুন্ধরা ওর দিকে একবার চায়।

দরকারি কথা আগে সেরে ফেলুন, সপ্রতিভ হওয়ার চেষ্টা করে বসুন্ধরার চোখের দিকে সোজাসুজি তাকিয়ে বলে।

ও এখন মনে মনে একটা খসড়া করতে পারে কি দরকারি কথা ছোড়দি বলতে পারে বসুন্ধরাকে।

প্রথমে বলবে খুব আশা করেছিল বসুন্ধরার কাছ থেকে শিগ্রী একটা জবাব পাবে। বসুন্ধরা যে সশরীরে এমন ভাবে এসে উপস্থিত হবে এটা তার কাছে কিন্তু একেবারেই অপ্রত্যাশিত। তারপরই জিজ্ঞাসা করে বসবে, কত দুর কি করলি বল। চাকরি হবে কি হবে না?

বসুন্ধরা সোজা সে প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে বলবে, ভাগ্যে চাকরি করার শখ চেপেছে, না হলে আর কবে দেখা হত কে জানে। তোর চাকরি হোক আর না হোক আমার কিন্তু লাভ হল, যাই বলিস। চাকরির কথা মনে না এলে আমাকে কিন্তু এত শিগ্রী মনে করতিস না—করতিস?

করেছি তো! বলতে পারিস নিজের দরকারে করেছি।

দরকার ছাড়া আর কি বসুন্ধরার মত মেয়েকে পারুল রায় মনে করে।

গালাগাল যত খুশি দে, কিন্তু রাগ করিস নে লক্ষ্মীটি।

ও! আমি সত্যি কথা বললেই গালাগাল দেওয়া হল। কেন তুমি কি একটিবারও সময় করে আমাদের ওখানে আসতে পারতে না। মাকে বলাই আছে। তুমি গেলেই মা আমাকে খবর পাঠাবে। বল, এবার কি বলবি?

তুই ঠিক বুঝবি না। একটার পর একটা যা যাচ্ছে না। মা'র শরীর তো এখন একেবারেই ভাল না। মনটা একেবারে ভেঙে গেছে। আমার তো মাথায় মাথায় শুধু ভাবনা, কি করে পরীক্ষাটা চোকাব। তারপর হঠাৎ এমন একটা গণ্ডগোল বাঁধল না—

কিসের গণ্ডগোল আবার?

ছোড়দি বসুন্ধরার প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়েও দিতে পারবে না। থমকে যাবে।

হঠাৎ পাশের ঘর থেকে উঁচু হাসির শব্দে তার চিন্তায় ছেদ পড়ে। পাশের ঘরে ওরা এই সব কথাই বলেছে, না সব কথাই ওর চিন্তার পর্দায় পর্দায় ধাক্কা খেয়ে একেবারেই উঠে এসেছে অবচেতন মনের নিঃসঙ্গ তলা থেকে। এটা কিন্তু ঠিক এ মুহূর্তে তার কাছে স্পষ্ট হয় না।

আর এই হাসির হিল্লোল থামার সঙ্গে সঙ্গেই প্রায় ছোড়দি চোখের পলকে এসে ওর হাত ধরে হিড় হিড় করে টানতে টানতে পাশের ঘরে নিয়ে যায়।

একেবারে মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দিল বসুন্ধরার, বলল, বসুন্ধরা বিশ্বাস করতে চায় না। তুই বলত ওকে সত্যি আমি চাকরি করব কিনা।

কি যে বলবে আর কি-ই বা বলা উচিত তা এক মুহূর্তে ভেবে পায় না। বসুন্ধরার মুখের দিকে তাকিয়ে মনে হয় একটু লজ্জা পেয়েছে বসুন্ধরা। যেন বলতে চায়, না না মোটেই তা নয়। আমি একটুও অবিশ্বাস করছি না যে ওর চাকরির দরকার নেই। এতক্ষণে ওর মুখে বলার কথা এসে গেছে, বলেছে বসুন্ধরাকে—আপনি কি সত্যিই বিশ্বাস করছেন না ?

আমার তো এখনও বিশ্বাস হচ্ছে না সত্যিই।

আমি কিন্তু বলছি ও সত্যি সত্যি চাকরি করবে।

কি ? এখনও বিশ্বাস হল না ? ছোড়দি ওর কথাটাকে জোর দেওয়ার মত করে বলে বসুন্ধরার বিশ্বাস আদায় করার জন্যে।

বসুন্ধরা ওর চোখের দিকে দৃষ্টি রেখে তবু অবিশ্বাসের হাসি হাসে। সেই হাসির দিকে চেয়ে তার নিজের প্রতিবাদকে দুর্বল মনে হল। এখুনি এই মুহূর্তে এমন এক বিশেষ প্রমাণের দরকার যা দিয়ে বসুন্ধরার মুখের হাসির অবিশ্বাসকে তুচ্ছ করা যায়। অতীশদার চাকরি গেছে। তা বলে তো সংসারের টাকায় কম পড়লে চলবে না। সেই জন্যেই আপাতত ছোড়দির একটা চাকরির দরকার। এর চেয়েও কি বড় প্রমাণের দরকার কিছু আছে। কিন্তু এটা তো সবই মনের চিন্তা, মুখের কথা তো নয়। মনে মনে অনেক ভাবনাকেই প্রশ্রয় দেওয়া যায়, তা বলে মুখের কথায় সেই

সব চিন্তাকে ব্যক্ত করা যায় না। মরে গেলেও কি সে আর ছোড়দি বলতে পারবে বসুন্ধরাকে, অতীশদার চাকরি গেছে। সেই জন্যেই ছোড়দির একটা চাকরির বিশেষ প্রয়োজন। কি করে মুখ ফুটে বলতে পারে কথাটা। অতীশদার চাকরি নেই বলেই কি ছোড়দির চাকরির গুরুত্ব এত বেশি? সংসারে বাড়তি টাকা জোগান দেওয়ার জন্যেই কি অতীশদার অস্তিত্ব এত বড় করে চোখে পড়েছিল। কথাটা ঠিক এমন করে ভাবতে পারে না। মা ছাড়াও, সে আর ছোড়দি তো অতীশদকে বরাবর পরম আপন জন মনে করে এসেছে।

আমার কথা বিশ্বাস করবেন তো?

তা অবিশ্যি না-করে উপায় নেই।

আমি বলছি আপনাকে, ও চাকরি পেলে করবে।

তা হলে ঠিক করবি? তার কথাটাকে যাচাই করে ছোড়দির দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করে বসুন্ধরা।

কথা দিচ্ছি করব। লক্ষ্মীটি তুই ভাল করে চেষ্টা কর।

করলে ভাল করেই করতে হবে, এবার ওর দিকে চেয়ে বসুন্ধরা বর্ষীয়সীর মত হাসে।

তবে মাকে এখন কিচ্ছুটি বলিস নে এ নিয়ে।

কেন? মাসিমার আপত্তি আছে না কি?

না মানে ঠিক আপত্তি না-হলেও—ওই রকম। মাকে তো জানেনেই, কণ্ঠস্বরে হঠাৎই সে অতি আত্মীয়তার আমেজ আনে। যেন তাদের মাকে বসুন্ধরার চেয়ে ভাল আর কে চেনে।

বসুন্ধরা সেদিনের মত উঠল। ছোড়দির ইচ্ছেটা মা'র কাছে গোপন রেখেই উঠল। মাকে বলল, এ পথে এসেছিলুম মাসিমা। কতদিন যে এদিকে আসিনি। পথঘাট তো ভুলেই গিয়েছিলুম প্রায়। ভাবলুম পারুলকে একবার দেখে যাই।

বেশ করেছ। মাঝে মাঝে তো এলেই পার। অবিশ্যি এখন গিন্নী বান্নি হয়েছ। জামায়ের খবর কি?

মা'র প্রশ্নে, বিশেষ করে ওর সামনে, একটু লজ্জাই পেয়েছে মনে হল বসুন্ধরা। সঙ্গে সঙ্গে লজ্জার কিছু আভাস তার চোখেও ধরা পড়েছে।

হ্যাঁ ভালই আছে, সংক্ষেপে উত্তর সারল।

তারপর আঁচল ঠিক করতে করতে কাপড় গুছিয়ে উঠে দাঁড়ায়, ছোড়দির দিকে গভীর অর্থপূর্ণ দৃষ্টি হেনে বলে, তবে ওই কথাই রইল তো ?

হ্যাঁ, ছোড়দি মাথা নাড়ে।

কি কথা যে রইল, মা'র মুখ দেখে তার কিছুমাত্র অনুমান করা যায় না। ছোড়দি দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দেওয়ার জন্যে সিঁড়ি বেয়ে বসুন্ধরার সঙ্গে নিচে নেমে যায়।

চাকরির সব ব্যবস্থা ঠিক হয়ে যাওয়ার পরও মা কিচ্ছু জানতে পারল না। এমন কি যেদিন সকালে চাকরিতে প্রথম চোখের দেখা দিতে যাচ্ছে সেই সকালেও নয়। ছোড়দির কাপড়চোপড়ের অস্বাভাবিক পারিপাট্য মা'র দৃষ্টি কিছুমাত্র আকর্ষণ করেনি। শুধু একটু অবাক হয়েছে এমন সাতসকালে সাজগোজ করে সামান্য কিছু মুখে দিয়ে খাওয়ার পালা চুকিয়ে কোথায় ছুটছে!

যত তাড়া করার দরকার তার চেয়ে অনেক তাড়া দেখিয়েছে ছোড়দি। কাপড় চোপড় ঠিক করবার জন্যেই হাতে সময় নিয়েছে ঘণ্টাখানেক। কতবার খুলল আর কতবার যে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে পরল তার ঠিক নেই। তারপর চুল ঠিক করার পালা। কাপড় ঠিক হয়তো চুল ঠিক হয় না। তাও যদি বা শেষকালে সামলায়, মুখের পাউডার ঘষা আর ঠিক মত হয় না কিছুতেই। হয় বেশি হয়ে যায়, কিংবা হয়তো তুলতে তুলতে মুখের আসল রঙ বেরিয়ে পড়ে। মুখ দিয়ে নানা বিরক্তির শব্দ অস্ফুট উচ্চারণ করে। তারপর তাকে বলতে হয় কখন ঠিক নিখুঁত হয়েছে। তার মত দ্বিতীয় ব্যক্তি যখন দেখে ঠিক বলেছে তখন আশ্বস্ত হওয়ার যথেষ্ট কারণ আছে।

খাওয়ার আগে কাপড় আর চুলের পরিচর্যা। তারপর কোন রকমে আড়ষ্ট হয়ে বসে দু চার গ্রাস নামমাত্র ঠুকরে ঠুকরে মুখে দিয়ে ভাতের থালায় জল ঢেলে উঠে পড়েছে, খুব সাবধানে কাপড় বাঁচিয়ে। মা বলেছে, এমন খেতে না-বসলেই পারতিস!

নিরুত্তর থেকে উঠে পড়েছে ছোড়দি। আর একটি মুহূর্ত সময় নেই। বহুদিন আগে কেনা অতীশদার দেওয়া ছোট শৌখিন চামড়ার হাত ব্যাগটার মধ্যে জমানো কটা টাকা থেকে দুটো টাকা পুরে নিল।

ও সমস্ত ক্ষণ লক্ষ্য করেছে ছোড়দিকে। এবার হাসল ছোড়দির দিকে চেয়ে। ছোড়দি নিশ্চয়ই ওর হাসির অর্থ ধরতে পারবে। অর্থাৎ এখনও আরও ক'মিনিট। মানে দেবদেবীর ছবির নিচে মাথা রেখে চোখ বুজে আশীর্বাদ প্রার্থনা।

একেবারে শেষে মা'র পদধূলি নেওয়ার পালা। মা'র পায়ের ধুলো নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মা বুকের কাছে মাথা টেনে আনে, ডান হাতখানা মাথায় কিছুক্ষণ রেখে চোখ বুজে থাকে। তারপর সেই হাতখানা মাথা থেকে তুলে ঘাড়ের ওপর আনে। সেখান থেকে তুলে সারা পিঠের ওপর একবার আলতো বুলিয়ে সরিয়ে নেয়!

ছোড়দি আর একটি মুহূর্তও অপেক্ষা করে না। ওকে তাড়া দেয়, চ' চ'। ও তৈরি হয়েই ছিল অফিসের টাইমের আর অনেক আগেই ওকে আজ বেরুতে হচ্ছে।

ছোড়দিকে আগে হাওড়ায় পৌঁছে দিতে হবে। তারপর সেখান থেকে শিবপুরের ট্র্যামে কিংবা বাসে। পথের এই দূরত্বের কথা ভেবে, বিশেষ করে ছোড়দি বলেই, সে নিজেও প্রথমটা একটু চিন্তান্বিত হয়েছে। না হলে এর চেয়ে আর অনেক জটিল পথঘাটের দূরত্ব ভেঙে আজকাল অনেক বাড়ির মেয়েরাই নিজেদের কর্মজীবনের গুরু দায়িত্ব পালন করছে।

ও বেরুল ছোড়দিকে নিয়ে। মা পথের দূরত্বের কথা চিন্তামাত্রও করেনি। মা'র কাছে সবটুকুই অজানা থাকল। শুধু জানল বসুন্ধরার বড় বোন কুহেলির ছোট ছেলের জন্মদিন উপলক্ষে বসুন্ধরাদের বাড়িতে জোর ব্যবস্থা হবে। খুব খুশি হবে কুহেলি যদি ছোড়দি সকাল থেকে গিয়ে রাত্রি পর্যন্ত কাটিয়ে আসে। অনেকদিন দেখা সাক্ষাৎ নেই। খুব হৈ হৈ করা যাবে। দরকার হলে ছোড়দিকে রান্নায় হাত লাগাতেও হতে পারে।

অফিস থেকে ফিরে সন্ধেবেলা প্রথমই দেখা অতীশদার সঙ্গে।

ওর বিছানায় লম্বা করে পা ছড়িয়ে চায়ের কাপ নিয়ে সিগারেট টানছে। ও ঘরে ঢোকার পর সহাস দৃষ্টিতে এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে ওর দিকে চেয়ে বলল, ইট ইজ অল রাইট—

কি ফিরেছে? ওর জিজ্ঞাসায় ব্যগ্রতা ফুটে উঠে। তাড়াতাড়ি হাতঘড়ির দিকে চোখ নামায়।

অতীশদার উত্তরও কানে যায়—হ্যাঁ।

খুব সকাল সকাল বলুন।

তা সকাল সকাল বই কি!

কি, চাকরি হবে মনে করেন?

হবে কি হে, হয়ে গেছে।

সত্যি বলছেন?

ওয়েট, এখুনি জানতে পারবে।

ওর মুখের দিকে তাকিয়ে অতীশদা ঠিক ধরতে পেরেছেন ছোড়দির সাফল্যে তার নিজের আনন্দ উৎসাহ ছোড়দির চেয়ে কিছু মাত্র কম নয়। কোন কোন ক্ষেত্রে হয়তো বেশি। যেমন ঠিক এ ক্ষেত্রে।

এরপর ছোড়দি নিজেই উপস্থিত হল সশরীরে। ছোড়দির মুখ থেকেই সবটুকু শুনে তৃপ্ত হল।

বসুন্ধরার বাবা অরবিন্দবাবু নিজে উপস্থিত ছিলেন। হেডমিস্ট্রেসকে যতটুকু বলার সবটুকু বলেছেন তিনি। সেক্রেটারীর নিজের ক্যাণ্ডিডেট্ হলে যা হয়। হেডমিস্ট্রেস হাসি মুখে বলেছেন, মন দিয়ে কাজ করবেন তো?

ছোড়দি ঘাড় কাত করে জানিয়েছে সে করবে।

মেয়েদের কিন্তু যত শান্ত মনে করছেন তা নয়।

হেসে ছোড়দি নিরুত্তর থেকেছে। ছোড়দির হাসি বেশভূষা মুগ্ধ করেছে হেডমিস্ট্রেসকে।

ছোড়দির হাত থেকে এ্যাপ্লিকেশন নিয়ে যত্ন করে রেখেছেন ফাইলের মধ্যে। বলেছেন, হ্যাঁ, তবে কিন্তু বি. এ. পরীক্ষাটা চটপট সেরে ফেলতে হবে।

ছোড়দি নম্র কণ্ঠে জবাব দিয়েছে, আমি সামনের বারেই দিয়ে দেব।

খুশি হয়েছেন প্রতিশ্রুতিতে। অরবিন্দবাবু হেডমিস্ট্রেস দুজনেই। সারা স্কুল ঘুরে দেখিয়েছেন অরবিন্দুবাবু সঙ্গে করে নিয়ে নিজের মেয়ের মত। স্কুলের মেয়েদের মধ্যে চাপা গুঞ্জন উঠেছে, স্কুলে নতুন মিস্ট্রেস আসছেন। নিচু ক্লাসের মেয়েরা কেউ কেউ আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে ছোড়দিকে। আপাতত আর কিছু না হোক চেহারায় অন্তত খুশি করেছেন নতুন মিস্ট্রেস।

বুঝলে আমি তো তোমাকে বলেই ছিলুম, আমার কাছে আসতেই হবে। অতীশ বোস আর তার বজ্রনির্ঘোষ, বুঝলে ?—অতীশদা ছোড়দির পরীক্ষা দেওয়ার কথা প্রসঙ্গেই ঠাট্টা করে বলতে চায় কথাগুলো।

আমার তো বলাই আছে। এক টিন সিগারেট আর একখানা বই, ছোড়দির উত্তর মনে হয় তৈরি ছিল।

এক টিন সিগারেট আমার দেড় দিনের খোরাক।

আর, একখানা বই দেড় ঘণ্টার।

এক মাসের সিগারেট খরচা আর এক ডজন নতুন বই, আর—

বলুন আর কি কি।

আচ্ছা থাক। আপাতত এই হলেই চলবে।

দাঁড়ান টাকা জমাই। আপনি সিগারেট খেয়ে যান আর বই কিনুন। আমি তিন মাসের টাকা জমিয়ে একেবারে ধার শোধ করব।

সে রাত্রে অতীশদা নিজেই ভাঙল কথাটা মা'র কাছে।

পারুলের একটা চাকরির ব্যবস্থা হয়েছে মাসিমা, স্কুলে পড়ানোর চাকরি আর কি। অতীশদা খবরটা দেওয়ার সঙ্গেই তৈরি হয়েছিল, মা'র মুখের অবস্থা কি হতে পারে। তাই মাকে কথা বলার কোন অবকাশ না-দিয়েই বলে গেছে, আমাকে অনেক দিন ধরেই বলছে। আমি খুব ভাল করে ভেবে দেখেছি, তারপর মত দিয়েছি। আপনার শেষ পর্যন্ত অমত থাকবে না আমার বিশ্বাস ছিল। আজকাল লেখাপড়া শিখে অনেক মেয়েরাই কিন্তু এ ধরনের চাকরি করছে। আর ঠিক একেবারে অফিসের কাজ হলে আমি চট করে মত দিতুম না।

লেখাপড়া শিখে এটা তো একটা অভিজ্ঞতা। তাই মনে করলুম করেই দেখুক না কিছুদিন।

আমায় কিন্তু একটি কথাও বলেনি।

সে দোষ আমার মাসিমা। আমি বারণ করেছিলুম। যদি আপনি শুনেই অমত করে বসেন।

অনেকদিন এমন কঠিন গম্ভীর দৃপ্ত কণ্ঠে মা'র সঙ্গে অতীশদা কথা বলেনি। অতীশদার কণ্ঠস্বর কেমন অনমনীয় ঠেকছিল। মা'র স্নেহান্ধ ভালবাসাকে মাঝে মাঝে শাসন করার জন্যেই অতীশদার ধীর কণ্ঠের দৃপ্তি বা অনমনীয়তার প্রয়োজন বুঝি। মা'র প্রতিবাদের কণ্ঠকে সম্পূর্ণ নিস্তেজ করার জন্যেই অতীশদার পৌরুষের কাঠিন্য সহসা এক এক সময় নিজেকে জাহির করেছে।

মা'র মুখের অসন্তোষ ছাড়াও বিহ্বলতা তার চোখে ধরা পড়েছে। এরপর কি কথাটা ঠিক বলা দরকার তা খুঁজতেই মা বুঝি অগাধ সময় নেবে।

অতীশদা আবার বলেছে, তা ছাড়া আমিও হঠাৎ একটু বিপদে পড়ে গেছি।

বিপদটা কি হতে পারে, মা'র মুখ দেখে মনে হয় না মা বিন্দুমাত্রও আঁচ করেছে। শুধু উদ্‌গ্রীব দৃষ্টি তুলে রাখে।

আমার চাকরিটা হঠাৎ গেছে—

সে কি! (এক মুহূর্তে কি নিদারুণ অসহায় হয়ে ওঠে মা'র মুখ)

ছোড়দির চাকরি নেওয়ার খবরে অসন্তোষের যে কটি রেখা পড়েছিল মা'র কপালে তা দ্রুত হাতে নিশ্চিহ্ন করে, কে যেন মা'র সারা মুখে দুঃসহ অপার বেদনার কঠিন পাত্রটি একটি নিমেষে উপুড় করে দিল। এই কথা কটার পর আর কোন কিছু শোনবার ধৈর্য তিলমাত্র নেই।

অতীশদা তবু বলেছে, সেই জন্যেই একটু অসুবিধের মধ্যে পড়ে গেছি। তাই ভাবলুম এ সময়টা কটা মাস যদি পারুল এই রকম একটা কিছু করে। এমন চট করে যে জুটে যাবে তাও তো ভাবিনি। তা ছাড়া খুব চেনা জানা লোকেদের জায়গায়।

অতীশদা থামল, মাকে শুধু এইটুকু চিন্তা করার অবকাশ দিয়ে—এরপরও কি মা বলবে মা'র অন্ধ স্নেহের সংস্কারই বড় হোক। কি ভাবছে মা এখন? বসুন্ধরার আসা থেকে আজ সকালে ছোড়দির আধপেটা খেয়ে ছোটা অবধি, সব কথাই মা একটি অবিচ্ছিন্ন চিন্তার আবর্তে ভেবে গেছে চক্ষের পলকে। মা'র মুখে আর কোন কথা আসেনি।

সেই রাত্রে কড়িকাঠের গায়ে-ঝোলা টুকরো আলোর দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে গভীর রাত পর্যন্ত ভেবেছে মা'রই কথা। রাস্তার বাইরে থেকে ছিটকে-আসা কড়িকাঠের মাথায় ওই ছিন্নাংশ আলোর সঙ্গে বিষণ্নমনের কত অপরিমেয় বিষাদ আর চিন্তাক্রান্ত অস্থির জীবনের অসংখ্য দুঃস্বপ্ন যেন জড়াজড়ি করে আছে নিবিড় আত্মগোপনের বাসনায়। নিজের জীবনের অপূর্ণ কোন সাধ বা ব্যর্থ কোন গভীর ইচ্ছার কথা যখনই ভেবেছে তখনই শতদীর্ণ মনের প্রতিচ্ছবি খুঁজে পেয়েছে ঘরের নিরেট-নিস্তব্ধ অন্ধকারের মাঝখানে ছিটকে-আসা ওই এক টুকরো রহস্যময় দুর্জ্ঞেয় আলোয়।

ছোড়দির চাকরি করতে যাওয়া মা কি কোন মতেই বরদাস্ত করতে পারত। মা'র মনের সংস্কারের দীর্ঘ কঠিন প্রাচীর ডিঙিয়ে অতীশদার কোন যুক্তিই টিকতো না বোধ হয়। কিন্তু পর মুহূর্তে যে সংবাদ মা'র কানে পৌঁছল তাতে মার সমস্ত প্রতিরোধ শক্তি নিমেষে দুর্বল হয়ে গেল। অতীশদার চাকরি নেই, সেই জন্যেই ছোড়দির চাকরির দরকার। ছোড়দি চাকরি যদি না করে? মা আর ভাবতে পারবে না। অনিশ্চয়তা অনটন। মা তাদের কল্পনাতেও ঠাঁই দিতে পারবে না। অতএব মা হার মেনেছে। নিজের ইচ্ছেকে জলাঞ্জলি দিয়েছে। সংস্কারের শক্ত বেড়াকে ইচ্ছার বিরুদ্ধে ভেঙে গুঁড়িয়েছে। কারণ অতীশদা চাকরি খুইয়েছে, এমন অতি সহজ অতি সরল সত্যকে মা যতবার টুকরো টুকরো করে ভেবে দেখেছে ততবারই মনের দিক থেকে অসহায়, আরও প্রতীকারহীন অসহায় অবস্থায় নেমে গেছে। মা আরেকবার নিশ্চিত সমর্পণ করেছে নিজেকে ভাগ্যের হাতে।

মা বুঝল অতীশদার চাকরি নেই। মা যেমন বুঝল ছোড়দির চাকরির প্রয়োজন অপরিহার্য, ছোড়দি এখন থেকে চাকরি জীবনে অভ্যস্থ হবে ক্রমে ক্রমে, তেমনি বুঝল অতীশদা আর ছোড়দির বিয়েটাও আপাতত হল না। আবার কোথা থেকে অনিশ্চয়তা এসে মা'র অনেকদিনের লালন করা ভীরু ইচ্ছেটাকে গ্রাস করল।

॥ ১০ ॥

অফিসে দুদিন পর পর ফোন এল স্মৃতিরেখার কাছ থেকে। প্রথমদিন ফোন ধরে গোড়ায় বুঝতেই পারেনি স্মৃতির কণ্ঠস্বর। অন্যমনস্ক ছিল, না বেশ কটা দিনের অসাক্ষাৎ হেতু ভেবেছে স্মৃতি এই সামান্য সময়ের ব্যবধানে তাকে ডাকতেই পারে না। অন্য কোন মেয়ে ডাকছে। এমন অবাক হওয়ার মত করে 'কে' বলেছে যে ওপাশ থেকে স্মৃতির ঠাট্টা মেশানো কণ্ঠস্বরে লজ্জা পেয়েছে। স্মৃতির কণ্ঠ শোনা গেছে ফোনে, খুব বেশি অবাক হচ্ছেন মনে হল। দেখবেন, আমাদের বাড়ির ঠিকানাটা মনে আছে তো আবার? ও পরদিন যাওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে খুব তাড়াতাড়ি ফোন ছেড়ে দিয়েছে। কিন্তু পরদিন যাওয়া হয়ে ওঠেনি। হয়ে ওঠেনি না-বলে ইচ্ছে করেই যায়নি বলা ভাল।

আবার যথা সময়ে দুপুরের দিকে ফোন এসেছে। স্মৃতির কণ্ঠস্বরে অভিমানপ্রসূত ঠাট্টার ঝাঁঝ শুনতে পাওয়া যায়। আজকাল স্মৃতির সব ব্যবহার, কথাবার্তা, চাহনি থেকে স্পষ্ট স্মৃতির মেজাজ ধরতে পারে। নির্ভুল বলে দিতে পারে কি মেজাজে থাকলে স্মৃতি এমন করে চাইবে, ঠিক এমনই করে কথা বলবে, বা স্মৃতির ব্যবহার যথার্থ এমনই হবে। আর এরই দাবিতে কি সে স্মৃতিকে সাহস করে বলতে পারে, স্মৃতি আমি তোমাকে জানি। ভীষণ কাছে থেকে জানি। ঠিক সে কারণেই বলতে পারি, তুমি আমাকে ভালবেসেছ। আমাদের পরিচয়ের যে বয়স তাতে তোমার আমার সম্পর্ক একদিন ভালবাসায় এসে ঠেকতই। আর ভালবাসায় এসে ঠেকবে বলেই সম্পর্কটাকে তুমি অমন আলগা হাতে দীর্ঘ হতে দিয়েছ। তুমি খুব চালাক মেয়ে। মুখে অনেক কিছু অস্ফুট রাখলেও আমি কি কিছু বুঝি না। তা-ই যদি না-হবে, তুমি কবে ইচ্ছে করলেই সম্পর্কের সুতোটাকে অনায়াসে একটানে ছিঁড়ে ফেলতে পারতে।

আমাকে কি তবে বিশ্বাস করতে হবে আমার বিদ্যে বুদ্ধি অমূল্য ? না আমি ছাড়া তুমি আর মাস্টারমশাই খুঁজে পেতে না ? আসলে কি জান, তুমি বুঝেছ, লোকটা পাগলের মত ভালবেসে এখন একেবারে অসহায় অবস্থায় এসে নেমেছে। লোকটার আর যত ত্রুটি বা অভাবই থাক, ভালবাসায় কোন ফাঁক নেই। সেই জন্যেই বোধ হয় অমন সহৃদয়া হয়েছ। এই নির্মম শহরে অমন সহৃদয়ার সংখ্যা যে নগণ্য তা আমি নিজের সব কিছু দিয়ে বিশ্বাস করি।

যা বলেছি তা ঠিকই। কাল সন্ধেবেলা আমাদের বাড়ির ঠিকানা খুঁজে পাননি। কলকাতা শহরের ঠিকানা তো! রাস্তাটা মনে আছে নিশ্চয়ই। বলুন, ঠিকানাটা একবার—বলে দেব ফোনে ?

খুব লজ্জিত হয়ে মাফ চেয়েছে, কথা দিয়েও রাখতে পারেনি এই কারণে। তারপরে বলেছে, কাল অতি অবশ্যই যাব আর তা ছাড়া তার বড় মামার বইখানাও তো পড়ে আছে তার কাছে অনেক দিন হল। বইখানা ফেরত দেওয়াও তো দরকার। যেন বইখানা ফেরত দেওয়ার তাগিদেই তোমাদের বাড়ি যাওয়া দরকার অন্তত একবারও। স্মৃতিও ছাড়বার পাত্রী নয়। সেও তো তাকে চিনেছে। বলেছে, ও যখন ফোন ছাড়বে ছাড়বে করছে, হ্যাঁ, মনেই ছিল না বইখানার কথা। বড়মামা বলছিল বটে একবার। নিয়ে এলে তো ভালই হয়। তবে না-পড়ে আনার দরকার নেই।

হাসির সঙ্গে কিঞ্চিৎ শ্লেষ মিশিয়ে ফোন ছেড়ে দিয়েছে।

ওদের সম্পর্কের এই কটা বছরে ও স্মৃতিরেখাকে ঠিক কত বার পরাস্ত করতে পেরেছে।

স্মৃতির বড়মামার দেওয়া বইখানা নিয়ে কথা মত উপস্থিত হয়েছে স্মৃতিরেখাদের বাড়িতে। স্মৃতি ওর পড়ার ঘরেই ছিল। মুখ নিচু করেছিল হুমড়ি খাওয়ার মত কি একখানা ফিল্ম ম্যাগাজিনের পাতায়। ও যখন ঘরে ঢুকেছে তখন স্মৃতির খেয়াল হয়নি ঠিক ঘরে কোন দ্বিতীয় ব্যক্তির উপস্থিতি। ছোট একটা শব্দ তুলে স্মৃতির মুখোমুখি সোফাটায় বসবার আগেই যখন ছোট্ট নিচু গোল টেবিলের ওপর হাতের বইখানা

ফেলে দেয় তখনই স্মৃতির চমক ভাঙে। মুখ উঁচু করে তোলে। স্মৃতির দৃষ্টিতে এমনি ভাব যে তার এই আসা বহু প্রত্যাশিত এমন কিছু একটা নয়। যেন, এসেছ বস—এই ভাব। অথচ এই মনোভাব বা উদাসীন ব্যবহারের মধ্যেই স্মৃতির মেজাজের সবটুকু অতি স্পষ্ট পড়তে পারে সে। মধ্যের কটা দিনের মন কষাকষি, অসাক্ষাৎ, মান অভিমান তাদেরই পূর্ণাকৃতি এখন স্মৃতির সারা মুখ দৃষ্টির উষ্ণতা আচ্ছন্ন করে আছে। অথচ আজ না-এলে রেগে মেগে লম্বা একখানা চিঠি লিখে বসত না তা-ই বা কে বলতে পারে। স্মৃতির দৃষ্টির অপ্রসন্নতার মধ্যে যে কপটতা তা তাকে বিশেষ চিন্তান্বিত করল না।

স্মৃতি ওকে বসতে দেখে তাড়াতাড়ি বইখানা মুড়ে ফেলে। মলাটের ওপর চোখে পড়ে অতি পরিচিত এক অভিনেত্রীর মুখচ্ছবি। সেই দিকে তার নজর পড়তেই স্মৃতি উলটিয়ে রাখল বইখানা। তখন নজরে পড়ে তেলের বিজ্ঞাপনে একটি মেয়ের মুখ। ও মৃদু হাসল। শুধু বোঝাতে চাইল, সামনে সোজা করে রাখ আর উলটিয়েই রাখ, সেই একটি মেয়েরই মুখ। ওর হাসির অর্থ স্মৃতি কি ভাবে নিল কে জানে। মুখ ঠিক গম্ভীর না-হলেও বিশেষ প্রসন্ন মনে হল না।

এই যে তোমার বড়মামার বইখানা, সে কথা বলল প্রথম।

স্মৃতি ঠোঁটে কেমন একটা তাচ্ছিল্যের ইঙ্গিত তুলে নীরব থাকল, বইখানার ওপর সামান্য একটু দৃষ্টি রেখে।

আজকাল তবে ফিল্ম ম্যাগাজিনের খুব আমদানি হচ্ছে—অন্য দিন হলে ওর এই সাধারণ কথাটার সূত্র ধরে স্মৃতি যথার্থ প্রেমিকার মত কথায়, চটুল চাহনিতে সামনের দীর্ঘ আলমারির বৃহৎ আয়নায় থেকে থেকে দেখে নিত, তাদের দুজনকে মুখোমুখি বসে দেখায় কেমন। এলোমেলো কথা, হাসি আর চপলতায় উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠত অতি সামান্য কারণে। কিন্তু আজ এ সন্ধ্যায় গাম্ভীর্য ভাঙবে না কোন মতে, এই প্রতিজ্ঞা করে বসে আছে।

হ্যাঁ, অনেকদিন তো দেখা নেই কি পড়ছি টড়ছি আজকাল কি করে জানাব, স্বাভাবিক গাম্ভীর্য বজায় রেখে মুখস্থ পার্টের মত বলে স্মৃতিরেখা।

কিছু একটা মনে আসে তার। বলতে যাবে, এমন সময় স্মৃতি বাধা দেয়, বলে, ফোনটা ধরে আসি।

নিজের জায়গা ছেড়ে উঠে যায়। তারপর যেন ওকে শুনিয়ে শুনিয়ে ফোনে কথা বলে, উচ্ছ্বল হয়ে ওঠে খুশির প্রাবল্যে। ও হাতে করে ফিল্ম ম্যাগাজিনখানা টেনে নেয়। পাতা উলটিয়ে বইয়ের ছবিগুলোর ওপর চোখ রাখলেও কান থাকে সর্বক্ষণ স্মৃতিরেখার কথায়। ঘরের পাশের প্রশস্ত বারান্দা থেকে স্মৃতির কণ্ঠস্বর কানে আসে। বেতের ঢালু চেয়ারটায় বসে পা দুলিয়ে দুলিয়ে ফোন করছে। মাথা নিচু করে আড়চোখে স্মৃতিকে একবার দেখে নেওয়া যায়।

হ্যাঁ হ্যাঁ বলুন, আচ্ছা...আচ্ছা...আসুন না, আজই আসুন। আমি? হ্যাঁ আমি আছি, কটা পর্যন্ত? অনেকক্ষণ, ধরুন সারা রাত, তারপরই স্মৃতির চপল হাসি ভেঙে ভেঙে ছড়িয়ে পড়ে। আর সেই হাসির এক একটি তরঙ্গ তার কানের পর্দায় ধাক্কা দিয়ে তার বুকের মধ্যে অহেতুক কিসের জ্বালা ধরায়।

আমাদের বাড়ির দরজা, বুঝলেন সিংহদ্বার, রাত দশটা পর্যন্ত খোলা থাকবে। দয়া করে আসবেন কি?

ও ফোন ছেড়ে দিয়ে ঘরের মধ্যে আসে। এবার কি তার দুর্বলতা ধরা পড়ে যাবে স্মৃতির কাছে? স্বাভাবিক থাকার চেষ্টা করলেও ওর ব্যবহারের অস্বাভাবিকতা ওকে ধরিয়ে দেবে স্মৃতির চোখে? বাস্তবিক কি ভেবেছে সে স্মৃতি যতক্ষণ ফোন করেছে? ভেবেছে, এই মুহূর্তে স্মৃতিকে সত্যিই কেউ ফোন করেছে, না ওর আসার সম্ভাবনা আছে বলেই ব্যাপারটাকে সে এমন করে সাজিয়ে রেখেছে। রীতিমত একটা সমস্যার মত ভাবতে ভাবতে ঘেমেছে। নিতান্ত অকরুণ মনে হয়েছে স্মৃতির ব্যবহার। হঠাৎ বিরূপ হয়ে উঠেছে সমস্ত মন।

ফোন ছেড়ে দিয়ে যখন ফিরে তার নিজের জায়গায় এসে বসল তখন তার চোখ বিজয়িনীর গর্বের আলোয় জ্বলছে। তাকে পরাস্ত করার, অনেকখানি বুঝি অভিমানের জ্বালা মেটানর, একটা ফিকির খুঁজেছে আর তা মিলেও গেছে অপ্রত্যাশিত...দেখ তোমাকে ফোনে অনুরোধ করে আনা যায় না, অথচ তোমার চেয়ে অনেক করিতকর্মা পুরুষের কাছ

থেকেও ফোন আসে আমার কাছে। আর সে ফোনে অনুরোধ আসে বাড়িতে উপস্থিত থাকার। দেখ রাজা বিনাও রাজ্য চলে, আর তুমি ছাড়া...

স্মৃতির চোখের বর্তমান চাউনিতে এই উপহাসই প্রকট। ফোনে যে কটি কথা বলেছে সবগুলো মুখস্থ হয়ে গেছে। অনেকক্ষণ ফোন ছেড়ে দিয়েছে, তবু সব কথাগুলো এখনও কানে বাজছে কেন? কে ফোন করতে পারে? যে কেউ-ই পারে। ভীষণ সুপুরুষ, খুব কৃতী কর্মিষ্ঠ যে কোন পুরুষই পারে। স্মৃতি কি তাকে চূড়ান্ত অপমান করতে চায়। তাকে বুঝিয়ে দিতে চায়, এত মান অপমান বোধের অহঙ্কার শোভা পায় না। কিসেরই বা এত অহঙ্কার? রীতিমত বাড়ি বয়ে ডেকে এনে তাকে অপদস্ত করতে চায়। সমস্ত মন এক নিমেষে বিদ্রোহ করে উঠতে চায় স্মৃতির বিরুদ্ধে। কোথা থেকে পেল এমন দুঃসাহস। বাবার আর্থিক মর্যাদা আর মা'র দাম্ভিক গর্ব—এরাই তো স্মৃতির বেপরোয়া অহঙ্কারের মূলে। না, ছেলেমানুষী করে এখুনি উঠে গেলে ওর দুর্বলতার প্রশ্রয় পেয়ে হয়তো আর বেশি ক্ষমতার আস্ফালন দেখাবে। খুব চালাকি করে তাড়াতাড়ি উঠে পড়তে হবে। যে দরকারেই ডেকে থাক সব কিছুই অসার অদরকারি, এটাই বুঝিয়ে দিয়ে হঠাৎ এক সময় সোফা ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে পড়তে হবে, তারপর আর কথা বলার সুযোগটুকু মাত্র না-দিয়ে দ্রুতপদে ঘর ছেড়ে সিঁড়ি বেয়ে নিচে নামতে হবে।

তারপর কি খবর বল? খুব তো দরকার দরকার করছিলে। ফোন ফেটে যায় আর কি! খুব সহজ স্বাভাবিক হয়ে কথা বলার ভান করে।

স্মৃতির মুখ দেখে একেবারে অবিশ্বাসও করা যায় না, পরাস্ত করার পর এবার যেন সান্ত্বনা দেওয়ার জন্যে অল্প একটু কোমল নরম হবে। স্মৃতির কথাতেও তারই আভাস পাওয়া গেল, আমার কিছু দরকার নয়, বাবার।

কই কি দরকার ঠিক বুঝলুম না তো।

অনেকদিন আসনি তো বাবার সঙ্গে দেখা হয়নি। দেখা হলে

হয়তো বাবা বোঝাতে পারত, স্মৃতির মুখে লজ্জা আর রাগের দ্বৈত ভাব স্পষ্ট হয়।

শাসন করার পর এবার বুঝি সোহাগের সুরে কথা বলতে চায়।

কিন্তু কিছুতেই মন থেকে তাড়াতে পারে না অদৃশ্য প্রতিদ্বন্দ্বীর কথা। একবার ঘড়ির দিকে চোখ রাখল। সময় দেখেই আবার মনে পড়ল আর তো কিছুক্ষণের মধ্যেই সে এসে পড়বে। হয়তো তার এই জায়গায় সোফার এই ধারটাতেই আসন নেবে। তারপর কথায় গল্পে হাসি ঠাট্টায় সন্ধ্যা উৎরে দেবে। ভাবতে ভাবতে মনের কথাটা মুখের আগায় এসে যায় আর ঠেলেও দেয় কথাটাকে মুখের বাইরে, আচ্ছা, তা হলে ওঠা যাক—

বাবার সঙ্গে দেখা করে গেলে পারতে...

কখন ফিরবেন। আর তুমিও তো ব্যস্ত আছ আজ, ঘড়ির দিকে চোখ নিচু রেখেই সে বলে।

এখুনি ফিরবে হয়তো।

না থাক, আজ যখন ব্যস্ত, কে আসবেন এখুনি

এ ঘরে বসতে পারতে, কণ্ঠে একটু আপোসের সুর। যেন ফোনে যা বলেছে তা ফিরিয়ে নিতে চায় ঠিক এই মুহূর্তে।

সেও হয়তো এত তাড়াতাড়ি উঠত না। আর মুখের কথাগুলোও উচ্চারণ করত না। নানান কিছু ভাবতে ভাবতে কিসের উত্তেজনায় পেয়ে বসেছিল তার মন। আর সেই উত্তেজনার বশেই কখন কথাকটা বলে ফেলেছে, আর সম্পূর্ণ অজান্তে সোফা ছেড়ে দাঁড়িয়েও পড়েছে। স্মৃতিও নিজের জায়গা ছেড়ে কখন তার মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে। তাদের দুজনের দণ্ডায়মান প্রতিচ্ছবি দেখা যায় আলমারির দীর্ঘ আয়নায়। ধোপদুরস্ত সাদা ধুতিপাঞ্জাবির পোশাকে নিজেকে স্মৃতির অনুপযুক্ত মনে হয় না। ও যখন আয়নায় নিজেকে দেখে, স্মৃতিরেখা ওর দিকে চেয়ে থাকে। মনে মনে সাহস সঞ্চয় করে সাহসী হয়ে ওঠে। আর স্মৃতির চোখ দুটি হঠাৎ কেমন দুর্বল আর নিষ্প্রভ মনে হওয়ায় ভিতরে আরও নির্মম হয়ে ওঠার ইচ্ছে জাগে। চরম আঘাতের মত কিছু একটা হানতে ইচ্ছে করে। যেন এতক্ষণে তারও সুযোগ মিলেছে।

আচ্ছা, আমি উঠছি তা হলে, একটু কাজও আছে। ঠিক আছে তোমার বাবার সঙ্গে দেখা করব এসে একদিন। তুমি যদি পার তো এস না এর মধ্যে আমাদের বাড়িতে, খুব মোলায়েম করে কথাগুলো বলে। জানে এমন করে বললেই স্মৃতির মনে সত্যি কিছু জ্বালা ধরবে। ভাল করে তাকালে বোঝা যাবে দৃষ্টি দুর্বলতর হয়ে উঠেছে ইতিমধ্যে।

রাস্তায় পা-ফেলবার পর কিন্তু নিজের মনের দুশ্চিন্তাই চতুর্গুণ হয়ে ওঠে। কিছুক্ষণ পর তার জায়গায় সোফায় এসে যে বসবে সে বোধ হয় এতক্ষণে পথে নেমে পড়েছে তারই মত। তফাৎ শুধু যা তার প্রস্থানে আর সেই ব্যক্তিটির আগমনে। অদৃশ্য প্রতিদ্বন্দ্বীকে নির্দয় নির্মম মনে হল, আর মনে হল তার অপরাধ ক্ষমাহীন।

আবার অন্যরকম বোঝাতে চাইল মনকে। এ স্মৃতিরেখার পুরনো খেলা নয়ত। শুধু একটু নতুন কায়দায়? সন্ধ্যায় তাদের বাড়িতে গেছে পড়াবার জন্যে, আর সে অনেকদিনের সঞ্চিত অভিমানের পাত্রটি উজাড় করে বলেছে, আমার একটু কাজ আছে আজ। বেরুতে হবে। আজ আর পড়তে পারব না। এক ভদ্রলোক পাঞ্জাবে যাচ্ছেন কিনা, তাঁকে তুলে দিতে যাব স্টেশনে। কাল কিন্তু আসবেন।

ও ছেলেমানুষী করে তার পরদিন যায়নি।

সেই রকম আজ সন্ধেবেলাও হয়তো ফোনের ব্যাপারটা সাজিয়ে ঠিক করে রেখেছিল গোড়া থেকে।

হয়তো তাও নয়। আগের খেলাটা মিথ্যে বলে এখনকার খেলাটা সত্যি নয় কে বলতে পারে।

কিন্তু স্মৃতির মুখচোখ তো অন্য কথা বলেছে। ওঠার কথা পাড়তে, আর ওঠার সঙ্গে সঙ্গে তার দৃষ্টি অমন নিষ্প্রভ দেখাল কেন, যে দৃষ্টির চাউনিতে সে বলতে চেয়েছে—না না উঠছ কেন? কেউ আসবে না, এ-সন্ধ্যায় তোমার কথাই ভাবছিলুম...বস, লক্ষ্মীটি।

ও কিন্তু মোটেই আশা করেনি স্মৃতি আসবে। যে অপরাধ করেছে

তা ক্ষমাহীন। স্মৃতি নিশ্চয় সে সন্ধ্যায় আশা করেছে ও বসবে, অনেকক্ষণ বসবে। তার কথা শুনবে যতক্ষণ না সে সব কথা শেষ করেছে। তারপর তার বাবা আসবেন। তাঁরও অনেক কথা আছে, সে সব কথাও শুনবে। কি কথা বলবেন তিনি। বেশ কিছুদিন আগে দেখা হলেই তাঁকে বলতে শুনেছে, কথা আছে আপনার সঙ্গে... কিন্তু কী কথা ? হ্যাঁ ওর একটা চাকরির কথা বটে। মোটা মাইনের বেশ ভাল একটা চাকরি। যে চাকরির ভবিষ্যত আছে। আর ভবিষ্যত আছে বলেই মেয়ের ভবিষ্যতও তার ভাগ্যের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার সম্ভাবনা আছে। ওর দিক থেকে তেমন গরজ ছিল না বলেই কি কথাটা পাড়ব পাড়ব করেও পাড়তে পারেন নি। কোথায় বাধা পেয়েছেন। ওরও কি মনের তলে তলে গোপন ইচ্ছেটা ঘোরাফেরা করছিল না ? একটা মনের মত চাকরির জোরে জীবনকে একেবারে অন্য রকমে গড়ে পিটে নেওয়া যায়। অন্য বাঁক দেওয়া যায় একেবারে। চাকরির পদমর্যাদা আর আর্থিক সাফল্যে স্মৃতির মত একটি মেয়ের ভার নিয়ে তাকে সুখি করা যায় না ! মা'র আর কতটুকুই বা দাবি তাদের সংসারে। ছোড়দির জীবনের হাল ধরবার জন্যে আছে অতীশদা। অভাব শুধু সুযোগের। আর সে অভাব পূর্ণ করবার জন্যেই তো স্মৃতির বড় মামা তাকে এনে জুটিয়ে দিয়েছেন এ-বাড়িতে। স্মৃতির মত মেয়ের পরীক্ষায় আশাতীত সাফল্যে উৎসাহিত পুলকিত হয়েই বুঝি তার বাবা নিজে ছুটে এসেছেন, মুখোমুখি দাঁড়িয়েছেন নিজেই সুযোগ হয়ে। তিনি কি মেয়ের নাড়ি টিপে দেখেন নি। নিশ্চয় দেখেছেন। আর বুঝেছেন মেয়ের পীড়া একেবারেই প্রেমপীড়া। কথাটা হঠাৎই মনে পড়ে যায়। কে বলেছিল যেন ? তারকবাবু না শিবরতনবাবু কে যেন বলছিলেন। না ওঁদের কেউ না। স্মৃতির ছোটমামাই বলেছিলেন, একটা ভাল মত চাকরি বাকরি না-হলে চলে না। কি কথায় কথায় একবার বলেছিল সে, একটা ভাল চাকরির দরকার বুঝলেন। কেন যে দরকার সেটা গোপন রাখলেও বড়মামা তার চাপা ভীরু ইচ্ছেটার গন্ধ পেয়েছেন কেমন করে, বলেছেন, দরকার যে কেন তাও তো বুঝি। রহস্যময় হেসে ফিরে বলেছেন, কিন্তু ভায়া সত্যি কথা বলব ? আজকালকার দুনিয়ায়

নিজের দৌড় আর কতটুকু। ঠেলা দেওয়ার ভাল লোক থাকা চাই। আর নেহাৎ ভাগ্যবান ছাড়া কার কপালে জুটবে তেমন লোক। বুঝলে, সংসারে তিনটি লোক আছে করবার জন্যে। বাপ করবে ছেলের জন্যে, মামা করবে ভাগনের জন্যে, আর শ্বশুর করবে জামায়ের জন্যে।

ও জিজ্ঞাসা করেছে, তা হলে আপনার কাছে আমার কোন চান্স নেই। যাই হোক, আপনি কার জন্যে করছেন?

ভাগনে না থাকায় আপাতত ভাগনীর জন্যেই করতে হচ্ছে।

হো-হো করে হেসে উঠেছেন বড়মামা। আর তাঁর কথায় কিসের ইঙ্গিত পেয়ে সে লজ্জায় মাথা নিচু করতে চেয়েছে। তাঁর সব কথায় একটি প্রচ্ছন্ন অথচ সুনিশ্চিত ইঙ্গিত ছিল কিসের দিকে। নেহাৎই নিতান্ত রসিক রগুড়ে মেজাজের লোক বলে চট করে নিগূঢ় ইঙ্গিতটুকু ধরা অন্যসব শ্রোতাদের পক্ষে কঠিন ছিল।

স্মৃতি বিছানার একেবারে মাথার কাছে টেবিল ঘেঁষে বসেছিল জানালার দিকে মুখ করে। টেবিলের ওপর ছোট্ট সেলফটা থেকে অনেকগুলো বই নামিয়েছে। খান দুই চার বিছানার ওপরেও ছড়িয়েছে। আর সেলফের বইগুলোরও কিছু জায়গা বদল করে রেখেছে। টেবিল ক্লথের একটা কোণ উলটে ওপরে উঠে গেছে। আর তারই ফাঁক দিয়ে টেবিলের চকচকে পালিশ করা কোণাটা বেরিয়ে পড়েছে। ওলটানো অংশটুকুর কিনারা ঘেঁষে একটি সরলরেখার মত ধুলোর আস্তরণ। মনে পড়ে এক মুহূর্ত টেবিলক্লথটা কাচা হয়নি বেশ কয়েকদিন। অংশটুকু উলটিয়ে সেলফের এক কোণে আটকে গেছে। ওর ইচ্ছে হচ্ছিল স্মৃতির চোখ থেকে ওই অংশটুকু সরিয়ে নেয়। বাঁ হাত দিয়ে নামিয়ে টেনে ঠিক করে দেয়। কিন্তু স্মৃতি এমন ভাবে টেবিল ঘেঁষে বসে আছে যে ও ইচ্ছা সত্ত্বেও টেবিল ক্লথটা ঠিক করে দিতে পারে না।

স্মৃতির মুখ থেকে খবর পেল ছোড়দির সঙ্গে তার দেখা হয়েছে। স্মৃতিকে বসতে বলে বেরিয়েছে। নতুন চাকরির খবর দিতে গেছে শ্বেতাদিকে। সে ভেবেছে মুখ দেখে কি কিছু সন্দেহ করেছে ছোড়দি, তার আর স্মৃতির গভীর মনোমালিন্যের কথা। যদি ছোড়দি কিছু সন্দেহ করে থাকে তো স্মৃতির অস্বস্তি কি হতে পারে তার

এখনকার মুখের দিকে চেয়ে ভেবে দেখার চেষ্টা করল। স্মৃতি মুখ নিচু করে রেখেছিল। আর তাইতেই সে কথাটা চিন্তা করার অবকাশ পেয়েছে। যদি এই মুহূর্তে মুখ তোলে তো সে আর তাকিয়ে থাকতে পারবে না। চোখ নামিয়ে নেবে বা দৃষ্টিকে স্থানান্তর করবে। আর সেই সঙ্গে তার এই এখনকার ভাবনাও ছিটকে যাবে কোথায়।

স্মৃতি কিন্তু সত্যি মুখ তুলল। ও তাড়াতাড়ি হাতের সিগারেট দুই ঠোঁটের মাঝখানে সজোরে চেপে সিগারেটের অন্য মুখের দিকে স্থির নজর রেখে অগ্নি সংযোগ করল। তারপর দু আঙুলে দেশলাইয়ের কাঠিটা শূন্যে নাড়তে নাড়তে কাঠিটার ডগা থেকে আগুন নিবিয়ে ফেলার চেষ্টা করল। কিন্তু আগুনটা তবু নিবল না। শেষে মুখ থেকে সিগারেট হাতে এনে ধোঁয়া ছেড়ে এক ফুঁয়ে নিবিয়ে দিল আগুনটা।

স্মৃতিরেখার মুখে আসন্ন সন্ধ্যার এই অপস্রিয়মাণ আলোয় সে যা পড়তে পারে তা—রাগ দুঃখ অভিমানের ক্ষোভ বা পরাজয়ের ব্যর্থতার জ্বালা সেখানে স্পষ্ট, তবু আপোস করার স্বচ্ছ ইঙ্গিতটুকুও একেবারে অপঠিত থাকে না।

যাক তা হলে কথা রেখেছ।

কথা দিয়ে আমি কথা রেখেই থাকি।

খুব সরল হয়ে গেল কিন্তু। আমি ভেবেছিলুম হয়তো বলবে, সবাই যদি একধার থেকে কথার খেলাপ করে...

সব সময় আমার অত সাজান-গোছানো কথা আসে না।

তা হলে মাঝে মধ্যে আসে। কিন্তু আমার তো দেখি সব সময় আসে। কি করে আসে বল তো?

তা আমি কি করে জানব? ওইখানেই বোধ হয় নামের সার্থকতা।

এই তো বেশ এসেছে। তবে নেহাৎই যা বাপ-মার দেওয়া নামটার অপমান করছ।

ঝগড়া করতে পেলে আর কিছু চাও না, না?

ঝগড়া করার ঠিক লোকটিকে যদি আমার এই ঘরে পাই, তো ঝগড়া করার একটা মেজাজ আসে।

স্মৃতি নিরুত্তর থেকে চোখের দৃষ্টিতে ভর্ৎসনা করে। আর এই

নীরবতার জন্যেই নিজের কথাগুলো নিজের কানে স্পষ্ট বাজে, লজ্জাও পায় হঠাৎ।

এরপর যে-কথায় যাওয়া দরকার মনে হল তার সেজন্যে একটু প্রস্তুতির প্রয়োজন বোধ করল। তাই স্মৃতির কাছে ঘেঁষে গিয়ে প্রায় তার গাল ছুঁই-ছুঁই করে টেবিলের ওপর থেকে সিগারেটের প্যাকেটটা তুলে নেয়। সিগারেটের অনেকগুলো প্যাকেট পড়ে আছে। বেশির ভাগগুলোই খালি। অনেক সময় তুয়েকটা প্যাকেট থেকে একটা কি তুটো সিগারেট খুঁজে পেতে বারও করেছে। যেমন এ-মুহূর্তে হাতে ধরা এই প্যাকেটটা থেকে। ওর যেন মনে পড়ছিল প্যাকেটটার একটা সিগারেট বোধ হয় এখনও অক্ষত আছে। মুখের স্তিমিত হাসির মধ্যেই বুঝি ওর মনের কথাটা শব্দ হয়ে ফুটল। কথা না বলেও বুঝি তাই নিঃশব্দ ভাষা দিল মনের ইচ্ছেটাকে: যাক, এখন দেখছি আছে তাহলে একটা। মুখে এক ঝলক হালকা হাসি ছিটিয়ে সিগারেটটা তু আঙুলে বার করে। তারপর আবার ও গাল ঘেঁষে দেশলায়ের জন্যে একেবারে টেবিলের অন্যপ্রান্তে হাত বাড়ায়। স্মৃতি কোনবারই এতটুকু সরে না। ওর হাত স্মৃতির গালের খুব কাছাকাছি হওয়া সত্তেও সে স্পর্শ বাঁচানর কোন চেষ্টাই করে না। স্মৃতি কি অধিকার বোধের কথাই জানাচ্ছে কিছুটা আকারে ইঙ্গিতে। যেন তোমার ওই প্রসারিত বাহুর স্পর্শে আমার গালের চামড়া কুঁচকে যাবে না, পুড়ে যাওয়া তো দূরের কথা। লাগুক না একটুখানি স্পর্শ। ক্ষতি কি। আর আমি স্বেচ্ছায় গায়ে হাত না-লাগালে তুমি নিজে তো কিছুতেই আমাকে ছোঁবে না। তোমার কোন হাতের পাঁচ আঙুলের তুটো আঙুল যদি আমার হাতখানাকে কখন ছুঁয়ে থাকে তো তার জন্যে আমার সাহসই বেশি দায়ি মনে রেখ। কবে যে একবার সেই হাত চেপে ধরেছিলে তা মনেই পড়ে না। অথচ এখনও সে কথা ভাবলে তোমার বুক ঢিপ-ঢিপ করে। আর ওর হৃদপিণ্ডের সেই কবেকার ঢিপ-ঢিপ শব্দটায় কান পেতে স্মৃতি বুঝি মাথা নিচু করে ঠাট্টার হাসিতে খিলখিলিয়ে উঠছে।

সিগারেটে আগুন ধরাতে ধরাতে মাথা নিচু করেই বলল, কই বললে না, কি কথা বলবেন, তোমার বাবা।

স্মৃতি মাথা নিচু করে বসে ছিল। যেন হঠাৎ তন্ময়তা ভেঙে ওর দরকারি প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্যে মুখ তুলেছে, চোখ তুলেছে ওর চোখের ওপর। কিন্তু এখনও খেয়াল নেই প্রশ্নটা কি ছিল। স্মৃতির চোখের বিস্ময়কে তড়িৎ অনুসরণ করে সে হুড়হুড় করে মুখের সব ধোঁয়া কুঞ্চিত ওষ্ঠদ্বয়ের ফাঁকে নির্গত করে আবার বলে, কি বলবেন যেন তোমার বাবা।

মুখ দেখেই মনে হয় যে-খাতে এতক্ষণ কথা চলছিল, এমন প্রশ্ন সেখানে বেখাপ্‌পা, অর্থাৎ স্মৃতি অন্তত এ-প্রশ্নের জন্যে ঠিক এখুনি তৈরি ছিল না। তাই উত্তর দেওয়ার জন্যে বুঝি একটু সময় নিল। সে স্বাভাবিক ছিল, প্রশ্নটার আঘাতে যেন সাময়িক অস্বাভাবিক হয়ে উঠল ; তাই আবার স্বাভাবিক হওয়ার জন্যে সময় নিতে হল।

গলার সরু হারের মনিটা সরে গিয়েছিল একপাশে। স্মৃতি হাত দিয়ে টানতে টানতে সেটাকে গলার নিচে ঠিক বুকের মাঝখানে আনার চেষ্টা করছিল। তার সিগারেট ধরানর মত এটাও কি স্মৃতিরেখার সময় নেওয়ার অছিলা? মাথা নিচু করে চোখ রেখেছে হারের মনিটার ওপর। দৃষ্টি নিশ্চয় নিজের বুকের উন্মুক্ত শুভ্রাংশের ওপর পড়েছে। বলতে কি ওর বেশ লোভ লাগছে বুকের ওই খোলা অংশটুকুর ওপর দৃষ্টি বুলতে। এখানেও কি তার সেই অধিকারবোধের প্রশ্ন। সে-ই একটিমাত্র পুরুষ যে এমন করে বেহায়ার মত তাকিয়ে থাকতে পারে একটি মেয়ের বুকের উপরিভাগের অনেকখানি খোলা অংশের দিকে। ওর দৃষ্টিতে কি সত্যিই নির্লজ্জপনা ফুটেছে। তা হলে তো সাহসেরই লক্ষণ বলতে হবে। স্মৃতি কি খুশি হবে ওর এই দৃষ্টির নির্ভীকতায়। যাই হোক, তাকিয়ে থাকতে যে ভাল লেগেছে সেটা অস্বীকার করে কোন লাভ নেই।

তোমার তো শোনবার সময় হল না, দুই স্তনের মধ্যবর্তী ঢাকা অংশটুকুর ওপরেই গলার নিচে বুকের যে খোলা অংশ, তার মাঝখানে হারের মনিটাকে ঠিক করতে করতে এতক্ষণে স্মৃতি কথার জবাব দেওয়ার সময় পেল।

ও কথা বলছ কেন? তুমিও তো ব্যস্ত ছিলে সেদিন। কার যেন আসবার কথা ছিল, ওর কথায় কি সে খোঁচাটা নতুন করে অনুভব করল?

যিনিই আসুন না কেন, তোমার বসার তো জায়গা ছিল।

তা অবিশ্যি ছিল না বলা যায় না। তবে কি জান—কথাটা জিবের ডগায় এনেও চেপে রাখল। ভেবে দেখুক কি হতে পারে কথাটা।

আসলে নিজেরই তাড়া ছিল, তাই বসতে পারনি।

না না! ফোনে অ্যাপয়েণ্ট্মেণ্ট রাখছেন একজন; আর তা ছাড়া আমি তো রোজই যাচ্ছি প্রায়।

ফোনের কথাটা যে কিছুতেই ভুলতে পারছে না সেটাই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে জানানর দরকার স্মৃতিকে। আর সে যে অনেক দিন যেতে পারেনি বা ইচ্ছে করেই যায়নি সেটাও মনে করিয়ে দেওয়া।

তুমিও তো মনে করতে পারতে, বাবার সঙ্গে অ্যাপয়েণ্ট্মেণ্ট আছে।

কোথায় তোমার সত্যিকারের অ্যাপয়েণ্টমেণ্ট, আর আমি ভেবে নেব যে—

কেন? আমি তো বললুমই, বাবার কি দরকার ছিল।

দ্যাখ, ফোনে অ্যাপয়েণ্ট্মেণ্টের একটা অন্য মূল্য, আর মুখে বলা—

তা ছাড়া দরকার তো বাবার সঙ্গে, বলে স্মৃতি এমন ভাবে তাকাল তার দিকে যে তার মনে হল সকৌতুক দৃষ্টিতে শুধু মাত্র একটি জিজ্ঞাসা, কি বললে খুশি হও বল তো?

আর এ কথার উত্তরে ও কি-ই বা বলতে পারে এখন? এতক্ষণ খোঁচা দেওয়ার নানা ফিকির খুঁজেছে, আর স্মৃতি পরিশেষে শুধু এইটুকু বলে তার সব কটি আঘাতকে একটি মাত্র মৃদু তাচ্ছিল্যে ফিরিয়ে দিয়েছে।

তা সেই কথাই জিজ্ঞাসা করছি। দরকারের কথা তো কিছু বললে না।

ওর কথার উত্তরে স্মৃতিরেখা নীরব রইল কিছুক্ষণ। আর সেই নীরবতা দিয়ে মনোবাসনাকে ব্যক্ত করল, পথে এস!

দরকারের কথা বলো না, সে রকম দরকার কিছু হলে কি আর বসতে না ?

তুমি রীতিমত উকিলের মত ক্রশ-করা আরম্ভ করলে দেখছি, স্মৃতিকে পুরোপুরি শান্ত করতে না-পারলে ওর মুখ থেকে আসল কথাটা কিছুতেই বার করা যাবে না।

নিজেকে বাঁচাবার জন্যে এখন যা মুখে আসছে তাই বলবে, এ আর বেশি কথা কি।

বিচারের ব্যাপার তাড়াতাড়ি চুকিয়ে এবার বলবে তো বল—এমনি সমর্পণের ভঙ্গিতে কথাগুলো বলে ফেলল যে স্মৃতিরেখাকে এবার মুখের রঙ বদলাতে হল। লজ্জার ছায়া পড়ল তার দুই চোখের দৃষ্টি ছাপিয়ে, দুই গণ্ডদেশ বেয়ে। আবার মুখে সেই অতি পরিচিত বিজয় গর্বের হাসি। অর্থাৎ আমার সঙ্গে যুদ্ধে নামার শখ এখনও।

বল এইবার, বেশ ধীরে সুস্থে গুছিয়ে বল, আমার লাস্ট রিকোয়েস্ট কিন্তু, কথার শেষে চাপা হেসে এমন ভাব দেখাল যে আর অনুরোধ করবে না।

ধীরে সুস্থে বলার কোন উপায় আছে।

বেশ তা হলে টেম্পার লুজ করেই বল।

আমি টেম্পার লুজ করি না-করি বাবার অন্তত করা উচিত ছিল। নেহাৎই যা—বলে—

কেন কি এমন ক্ষমাহীন অপরাধ।

বাবাকে চাকরির ব্যাপারে স্পষ্ট করে কিছু জানালে না আজ পর্যন্ত।

কেন, আমি তো বলেছিলুম আমার কথা।

কী বলেছ তুমিই জান।

বলেছি তো স্পষ্ট, পেলে আমি করতে রাজী আছি।

এমন করে কথা বলো না। চাকরি উড়ে উড়ে আসবে তোমার কাছে। বাজার তো ভালই জান, যারা চেষ্টা করবে তাদের কথাটা একটু ভাল করে ভেবে দেখ।

তোমার কথা শুনে কী মনে হচ্ছে জান ? বলব ? চাকরির বাজারে একজন বেশ এক্স্পিরিয়েন্স্‌ড পার্স‌ন, কিংবা ধর এম্প্লয়ার।

সব কথাই এমনি হেসে উড়িয়ে দেবে। যাদের ভাবতে বল তাদেরও স্পষ্টাস্পষ্টি কিছু বল না, খোলাখুলি।

ভাববার মধ্যে তো আছ এক তুমি, কথাটা বলার শেষে নিজেকে একটু সামলে নেওয়ার চেষ্টা করে।

এ সব আমার পুরনো হয়ে গেছে, চোখে মুখে রাগ আর অসন্তোষের ছায়া স্পষ্ট ধরা পড়ে। অথচ তার দৃষ্টিতে হৃদয়ের আন্তরিকতার কিছুমাত্র চাপা পড়ে না যা কপটতা দিয়ে গোপন করতে গিয়েও অনেক সময় পারেনি।

স্মৃতির মুখের দিকে তাকিয়ে তার ধৈর্যচ্যুতি দেখে প্রায় হাসবার উপক্রম করছিল। কারণ এমন পাকা হিসেবী মহিলার মত তার কর্ম জীবনের ভবিষ্যতের কথা ভেবেছে। কিন্তু কেন?

বাবা আমাকে আরও কি জিজ্ঞাসা করেছে তাও তো জান না।

কি, আমার সম্পর্কে?

তোমার সম্পর্কে কেন, আমার সম্পর্কে।

কি?

আমার বিয়ের কথা, কথাগুলো বলার শেষে স্মৃতিরেখার চোখ মুখের যে অবস্থা হল, তাতে তার মনে হল দুজনে আর বসে থাকতে পারবে না বেশিক্ষণ সামনাসামনি। স্মৃতির বাবা যা জিজ্ঞাসা করেছেন তা তার সম্পর্কেও বই কি।

হঠাৎ মনে পড়ল সেই এক সন্ধের কথাটা।

খালি গায়ে একটা ঢিলে ডোরাকাটা পা-জামা পরে বাবা বুঝি ভুল করেই ঢুকে পড়েছিলেন পড়ার ঘরে। চেয়ার ছেড়ে ও উঠে দাঁড়িয়েছিল, তার দেখাদেখি স্মৃতিরেখাও উঠে দাঁড়িয়েছিল। স্মৃতির মুখ দেখে তার মনে হয়েছিল, যেন আগে থেকেই জানে কী কথা বলতে পারেন তার বাবা। লজ্জায় অধোবদন হয়ে দাঁড়িয়েছিল, যেন কোন কৃত অপরাধের জন্যে। বাবাও বুঝি মেয়ের এ চেহারার জন্যে অনেকদিন থেকেই একটু একটু তৈরী হচ্ছিলেন। বিনা প্রস্তুতিতেই তাই কথাগুলো বলে ফেলেছেন, এ রকম করে তো আর চলে না, স্মৃতির একটা ব্যবস্থা করতে হয়। হ্যাঁ—আপনার চাকরির কি হল? কিছু ভেবে দেখলেন নাকি?

সেই সন্ধ্যায় তার মনে হয়েছিল মেয়ের প্রতি অন্ধ ভালবাসার কথাটাই সরবে জানিয়ে গেলেন ভদ্রলোক। মেয়ের একটা ব্যবস্থা করার সঙ্গে তার চাকরির, মোটা মাইনের একটা চাকরির, ব্যবস্থার ক্ষীণ সূত্রটি জুড়ে সে রোমাঞ্চিত হয়ে উঠেছিল, তার সারা গা ঘেমে উঠেছিল। স্মৃতির জন্যে তার অটুট ভালবাসার সব দুর্বলতা সত্ত্বেও এটা যেন নিতান্তই অবিশ্বাস্য কিছু একটা মনে হয়েছিল।

কটা দিন একেবারে ডুব দিয়ে ছিল ওই ঘটনাটার পর।

তারপর স্মৃতির বাবার প্রশ্নটা যখন সাময়িক চাপা পড়েছিল, আর সেই প্রশ্নের সোজাসুজি কোন উত্তর দিতে না-পারায় মনের যে চাপা অস্বস্তি আর অস্থিরতা তা যখন ক্রমে একদিন ক্ষীণ হয়ে এল, তখন আবার একদিন স্মৃতিরেখাদের বাড়িতে গিয়ে হাজির হল।

এই সন্ধ্যায় এ মুহূর্তে দুজনে যেমন বোবা হয়ে বসে আছে মুখোমুখি, সেদিনও স্মৃতির বাবা কথা কটা বলে ঘর ছেড়ে চলে যাবার পর দুজনে ঠিক এমনই অনেক কটি মুহূর্ত পর পর একটিও কথা না-বলে বসে ছিল।

ঘরের জানালার মুখে তখনও বিকেলের আলোর অবশিষ্টাংশটুকু লেগে ছিল। আর সেই পলাতক ম্লান আলোর শেষ আভাটুকুতে টেবিলের কিয়দংশ তখন কিছু স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল। স্মৃতির কথার অস্বস্তি ঘরের অস্পষ্ট আলোয় আরও বেশি অস্বস্তিকর মনে হল। এই কথার পর ঘরের অস্বচ্ছ আলোয় বসে থাকা মানে, তার মনে হল, লজ্জাকে আর বেশি প্রশ্রয় দেওয়া।

উঠে ঘরের আলো জ্বেলে দিল।

নিজের জায়গায় ফিরে এসে বসল আবার। বলল, ভাল কথা, তুমি কি বললে তোমার বাবাকে ?

ঘরের আলোয় স্মৃতির মুখ স্পষ্ট দেখা গেলে ওর মনে হল যেন বিপুল কিছু আশা করে বসে ছিল। হতাশ হয়েছে। কিংবা তার নিঃসাড়-নীরবতা দিয়ে শুধু জানিয়েছে, কি বলা উচিত।

কথার মোড় ফেরাতে হবে, হঠাৎই এ প্রয়োজন বোধ করল। আর স্মৃতিকে আবার সজাগ করতে হলে এখুনি শুধু একটি সংবাদই দেওয়া দরকার।

তুমি জান অতীশদার চাকরি নেই ?

না তো, ক্ষীণ কণ্ঠে জবাব দিল নিমেষে মুখ তুলে। চোখ দেখে মনে হল কোন স্বপ্নরাজ্যে অবগাহন সেরে স্মৃতিরেখা ফিরে এল রোজকার দুঃস্থ সংসারে।

সব চেয়ে মুশকিল এখন মাকে নিয়ে। ভেবে রেখেছিল ছোড়দির বিয়েটা এই শীতেই হয়ে যাবে। সবকিছু গেল ওলোট পালোট হয়ে। কবে যে ব্যাপারটা চুকবে, মা'র বিপন্ন মনোভাব এমন করে নিজের দৃষ্টিতে আত্মসাৎ করে চেয়ে রইল যে সেদিকে চেয়ে স্মৃতি এখন নানান কিছু ভেবে নিতে পারে।

কি ভাবতে পারে ওর কথায় আর দৃষ্টিতে ? তোমার বিয়ে তো এখুনি হয়ে যেতে পারে। আজ ঠিক করলে কালই বিয়ে হয়। যে কোন কৃতীপুরুষ তোমার বা তোমার বাবার ইচ্ছে হলেই তোমাকে মাল্য দেবেন। কিন্তু ছোড়দির কি ব্যবস্থা হবে বলতে পার ? একটিমাত্র পুরুষ অতীশদা, তা সেও পড়ল বিপাকে।

স্মৃতিরেখার মুখ দেখে শুধু মনে হল, এখন থেকে বাকি সময়টুকু সে নীরব শ্রোতা হয়ে তার যত কথা আছে বলার সব শুনে যেতে পারে।

সত্যি বলতে কি জান মা'র দুশ্চিন্তার চেয়ে আমার দুশ্চিন্তা আরও বেশি। মা তো মুখ ফুটে কিছু বলবে না। কিন্তু মা'র মুখ দেখলেই আমি ধরতে পারি, আসল কথাটা বলবার আগে এমন করেই বুঝি তাকে ভূমিকা তৈরী করতে হল।

স্মৃতি যেমন চুপ করেছিল তেমনি রইল। শুধু মৌন দৃষ্টির সঙ্কেত তার কথায় পুর্ণ সমর্থন জানাল।

আচ্ছা, তোমার বাবা তোমাকে ভীষণ ভালবাসেন না ?

হঠাৎ ?

না, মানে তুমি বোধ হয় নিজেও জান না।

কিছুটা নিশ্চয় জানি।

আমার মনে হয় যতটুকু জান, তারও অনেক বেশি ভালবাসেন।

হয়তো হবে।

হয়তো নয়, আমার তো মনে হয় নিশ্চিত না-হলে—

না-হলে কি ?

না-হলে আমাকে এত বেশি স্নেহ করতে পারতেন না কিছুতেই। আমার যতটুকু প্রাপ্য তারও অনেক বেশি স্নেহ করেছেন।

তাতে আপনার অসুবিধে কি ?

না, অসুবিধে কিছুই না, শুধু যা লজ্জা।

স্মৃতি চুপ করে থাকে। ওর কথার তাৎপর্য হয়তো কিছু ধরতেও পেরেছে।

আচ্ছা, লজ্জা যাতে না-পাও তার ব্যবস্থা করা যাবে, পরে বলেছে।

কথার কোন উত্তর সঙ্গে সঙ্গেই সে দিল না। বরং স্মৃতির মুখের দিকে চেয়ে নিজের কথাগুলোই বেশি করে চিন্তা করছিল।

তুমি সামনে আছ বলেই তোমার বাবার বিনা কারণে এই ছুটোছুটি। তাই ভাবছি—তোমার বাবার জায়গায় অন্য কেউ যদি থাকতেন—

তুমি কি এখন আবার যদির কথা ভাবছ ?

ভাবছি না কিছুই। শুধু ভাবছি তোমার মা কিন্তু ঠকতে চান না। আমি তাঁকে যতটুকু জেনেছি তাই থেকে বলতে পারি। আমার যেমন মনে হয় আমি তোমায় ঠকাচ্ছি। তুমি তোমার মাকে ঠকিয়ো না।

স্মৃতির মুখ দেখে মনে হল সব কথা সে উপলব্ধি করতে পারছে না। আর বেশি শোনার জন্যে অধিকতর আগ্রহ নিয়ে তাকিয়ে রইল।

তোমার কাছ থেকে তোমার মা'র কিন্তু অনেক আশা। কি মনে হয় জান, তোমার মা'র আশা ইচ্ছে তোমার পুর্ণ করা উচিত।

আমায় একা পেয়ে খালি উপদেশ দিয়ে যাবে না কি ?

তোমায় একা তো এই প্রথম পাচ্ছি না। উপদেশ দেবার কোন প্রয়োজন বোধ করেছি আগে ? আজ প্রয়োজনেই দিচ্ছি। কথাটা ভাল করে ভেবে দেখ।

খুব ভাল করে ভেবে দেখেছি। মন খারাপ বলে কি আমায় সামনে পেয়ে যা খুশি প্রাণ চায় বলে যাবে—

এক মুহূর্ত মনে হয় উত্তেজনায় অভিমানে অধীর হয়ে উঠেছে।

আমি যা বললুম তা একটু মাথা ঠাণ্ডা করে ভেবে দেখলেই বুঝতে

পারবে। তোমার মা চান তাঁর মতই তুমি জীবনে সুখী হও। (হয়তো আরও বেশি সুখী।) তোমার উচিত তোমার মাকে সুখী করা। তোমার বাবা তোমাকে খুবই স্নেহ করেন। তা বলে কি তোমার মা, (তোমার জীবনের সব চেয়ে বড় দিকটার কথা ভেবে) তোমার বাবার অন্ধ ভালবাসাকে মন থেকে সায় দেবেন?

তার কথার অর্থ এবার সত্যিসত্যিই স্মৃতিরেখার কাছে অনেকখানি পরিষ্কার হয়েছে। স্মৃতির মুখ দেখে অন্তত তাই মনে হল। ওর শেষ কথাগুলোয় স্মৃতির মুখ অস্বাভাবিক করুণ আর গম্ভীর হয়ে উঠেছে। স্মৃতির মুখের অনাবিল সৌন্দর্য এমন প্রবল না হলে তার করুণ দৃষ্টির বিষাদ হয়তো ওর চোখে এত বেশি ধরা পড়ত না। ও প্রায় স্বপ্নাবিষ্টের বিমুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল স্মৃতির আশ্চর্য অসহায় রিক্ত দুটি সুন্দর চোখের দিকে। আর তাই দেখেই যেন নির্মম হওয়ার এক জেদ চেপে বসল। স্মৃতির ওপর নয়। নিজের ওপর। নিজের জীবনের সর্বব্যাপী ব্যর্থতা নৈরাশ্যকে গলা টিপে মারার মত একটা ইচ্ছে যেন তার অন্য সব কিছু অবশ করে রাখুক। অথচ খুব ধীর ও সংযত কণ্ঠে কথাগুলো বলল, তাই বলছি কি জান, বিয়ে করা উচিৎ। শুধু তোমার বাবার ইচ্ছেই তো ইচ্ছে নয়, তোমার মা'রও ইচ্ছে আছে। তোমার মা'র অন্তত সাধ তাই। তিনি সুখী হবেন।

এরই জন্যে আপনার এত সময় লাগল? সামান্য কটি কথায় স্মৃতিরেখা এতক্ষণে সত্যিই বিদ্রোহ করে উঠল।

(না, এত সময় লাগত না নিশ্চয়ই যদি না তোমাকে বলতে হত।) তোমার বাবার সামনে দাঁড়িয়ে স্পষ্ট করে বলার ক্ষমতা আমার নেই। যা প্রাপ্য তার অনেক বেশি তিনি দিয়েছেন। অথচ আমার যোগ্যতা বিচারের কোন প্রশ্নই তাঁর মনে নেই। শুধু তুমি আছ।

স্মৃতি মুখ নিচু করে সব শুনে যাচ্ছিল নিঃশব্দে। তার বড় বড় নিশ্বাস ফেলার কটি শব্দ শুধু কানে আসে। তার মুখ দেখে বাস্তবিক মনে হল, এ সন্ধ্যায় অন্তত তার সব কথা ফুরিয়েছে। আর একটি কথাও যদি সে বলে।

—তাই তোমাকে ঠকাতে চাই না স্মৃতি, জান। হয়ত এটা আমার

একটা কম্‌প্লেক্‌স, তবু তা থেকে যখন মুক্তি নেই—নিজের কথাগুলো নিজের কানেই বড় দ্রুত আর কাঁপা-কাঁপা শোনাচ্ছিল। ইচ্ছে করেই থামল মুহূর্ত কয়েক কণ্ঠের স্বাভাবিক স্বর আনার জন্যে।

এই কম্‌প্লেক্‌স-এর জন্যে যে কাকে দায়ী করব তা জানি না। তবে বেশ বুঝতে পারছি এ থেকে আমার মুক্তি নেই। কিছুতেই মনে করতে পারছি না আমি তোমার যোগ্য। তোমার মা'রও তো একটা স্বাভাবিক দাবি আছে, তুমি তাঁর মত সুখী হবে জীবনে—সব অর্থে। এটা ভুলে যাচ্ছ কেন ?

নিজের কথা এতক্ষণে সবটুকু পরিষ্কার করে বলতে পেরেছে, শুধু এইটুকু ভেবে হালকা বোধ করল। আর তারই জন্যে একটা সিগারেট ধরানর প্রয়োজন অনুভব করল।

পরম আয়েসে এক মুখ ধোঁয়া বুক থেকে ওপরে টেনে মুখ দিয়ে আস্তে আস্তে বার করতে করতে অনেকটা স্বগতোক্তির ভঙ্গিতে বলল, বিশ্বাস কর, বিয়ের কথা আমি কিছুতেই ভাবতে পারিনি শেষ পর্যন্ত।

কথা ওই শুধু বলেছে সমানে। স্মৃতি তাল ঠুকে গেছে কথা যেখানে না-বললে নয় শুধু সেটুকু বলে।

ছোড়দি প্রায় অতর্কিতে ঘরে পা ফেলায় ওর চেয়ে স্মৃতিই বেশি স্বাভাবিক হওয়ার চেষ্টা করে মুখ তুলেছে সোজা হয়ে বসে। ও সমানে কথা-বলার সঙ্গে হাত-পা নেড়েছে আর সিগারেট খেয়ে ধোঁয়াও ছেড়েছে। মনের অস্বাভাবিক অবস্থা তাই মুখ চোখের চেহারায় খুব স্পষ্ট হয়ে ওঠেনি। ছোড়দি তাই অবাক হয়েছে স্মৃতিরেখার মুখের দিকে তাকিয়ে।

কি, এখনও বসে ? আজ আর বেরুনো হবে না নাকি ? সরস গলায় স্মৃতিকেই প্রথম প্রশ্ন করেছে ছোড়দি।

হ্যাঁ এইবার উঠব, হাতের চুড়ি আর ঘড়ি ঠিক করতে করতে আর গায়ের কাপড় সামলাতে সামলাতে একটু নড়েচড়ে বসে স্মৃতি খুব মিহি গলায় বলেছে। কিন্তু দৃষ্টির বিষাদ স্মৃতির সর্বাঙ্গ তখন বিষণ্ণ বিমর্ষ করে রেখেছে।

ভাল কথা, ক'টা বাজে দেখ তো তোমার ঘড়িতে ? স্মৃতিকেই ও প্রশ্ন

করে। স্মৃতির বর্তমান অস্বাভাবিকতার জন্য সে-ই যে দায়ী, তা থেকে মুক্ত করার জন্য সুযোগ দেওয়ার দায়িত্ব তারই।

এতক্ষণ যেন অস্বাভাবিক কিছুই ঘটেনি এমনই ভঙ্গিতে হাতঘড়ির দিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে স্মৃতি জবাব দিল, পৌনে ন'টা।

তারপর ছোড়দির দিকে তাকিয়ে জোর করে ম্লান হেসে বলল, আজ উঠব...

আজ ওঠ ক্ষতি নেই, তবে সামনের রোববারে আসা চাই। শ্বেতা আর অনিমেষবাবু আসবেন। অনিমেষবাবু চিঠি দিয়েছেন কাল কলকাতায় পৌঁছবেন, ছোড়দির কথার মধ্যে অনুরোধের চেয়ে আদেশের সুরই গাঢ়।

নিশ্চয়ই দেখব, আগের ম্লান হাসি নিয়েই বলল স্মৃতিরেখা।

দেখা-টেখা নয়, আসতে হবে। একটা দিনের তো মামলা। ওরা পরের দিনই চলে যাবে।

কাকে আসতে বলছে ছোড়দি। আর এসেছে স্মৃতি। অহঙ্কারে বাধলে আর কোন কিছুর বিচার নেই স্মৃতির কাছে। কিন্তু কি-ই বা করতে পারে সে। সে তো নিরুপায়। স্মৃতির কাছে তো স্বীকারই করেছে, তার কাঁটা কোথায়। আর তা থেকে তো তার মুক্তিও নেই কিছুতে।

কি তুই সঙ্গে যাবি না? ছোড়দি এতক্ষণে তাকে প্রশ্ন করল, অর্থাৎ যাওয়ার জন্যে উৎসাহিত করল। অন্যদিন হলে স্মৃতিরেখা নিজেই ইঙ্গিত দিত সঙ্গে যাওয়ার জন্যে। আজ কিছু বলবে না। আভাস বা ইঙ্গিত দেবে না একবারও। তাই স্মৃতিরেখার সঙ্গে যাওয়ার জন্যে ছোড়দির কথাতেই উঠতে হল। অন্যদিন এই যাওয়ার জন্যে নিজের দাম বাড়াতে হত। আর আজ অযাচিত ভাবেই উঠতে হবে, স্মৃতির কাছ থেকে কোন ডাক বা ইঙ্গিতটুকুও আসবে না।

স্মৃতিরেখার আচরণে মনে হল আজ ও সঙ্গে না-গেলেও কোন ক্ষতি ছিল না। স্মৃতি একাই চলে যেতে পারবে। এ যেন প্রয়োজনের তাগিদে নয়, নিতান্ত অভ্যাস বশেই তাকে সঙ্গে নেওয়া।

রাস্তায় বেরিয়ে অবস্থা আরও শোচনীয় হল। স্মৃতির হাঁটার ভঙ্গিতে মনে হল এখন নৈঃসঙ্গ ছাড়া তার আর অন্য কিছু কাম্য নেই। সে

একাই তাদের বাড়িতে এসেছিল, আর দু চারটে নিতান্ত দরকারি কথা সেরে একাই ফিরে যাচ্ছে। স্মৃতির পাশে তার অস্তিত্ব, নেহাৎই প্রাণ আছে বলেই নড়া-চড়া করে নিজেকে জীবন্ত বলে জাহির করা। এর চেয়ে অস্বস্তিকর আর কি থাকতে পারে।

খানিকক্ষণ নিঃশব্দে বিনা কথায় হাঁটার পর বললে, আমার কথাটা একটু বসে চিন্তা করলেই বুঝতে পারবে। তোমার মা'র মন আমি তোমার চেয়ে অনেক বেশি ভাল বুঝি। তাঁর কাছে তোমার অনেক দাবি। তিনি তোমাকে জীবনে খুব সুখী দেখতে চান, নিজে সুখী হতে চান।

কোন কথা বলা কেন, মুখে অস্ফুট শব্দ করাও নিষ্প্রয়োজন মনে করে স্মৃতি শুধু উষ্ণ দৃষ্টির নিচে হাতেবাঁধা ঘড়িটা কয়েক পলক তুলে ধরল। রাস্তার আলোয় ছোট্ট সুন্দর দামি ঘড়িটার কাচ কেমন চিক চিক করল, ঘন কৃষ্ণপক্ষের আড়ালে স্মৃতির সদাভাসমান চোখের নিবিড় কালো মণি দুটোও নিশ্চয় চিকচিক করেছিল, ভাল করে লক্ষ্য করলে চোখে না-পড়ার কোন কারণ নেই।

ভাল করে তাকিয়ে দেখার চেষ্টা করেনি। বরং বাকি আরও কটি কথা বলার তাগিদ অনুভব করেছে।

আমার মা যেমন এই জীবন থেকে ক্রমাগত মুক্তি চাইছে; আমি ঠিকই বলছি, আমার মাকে চিনতে আমার তো কোন ভুল নেই... তোমার মাও তেমনি তাঁর জীবনের সাধ আহ্লাদের একটিও নষ্ট হতে দিতে চান না। কেনই বা চাইবেন তাঁর তো কোন দোষ নেই। তাঁর অবস্থায় পড়লে আমার মা কি চাইত বলা মুশকিল। তাঁকে আমি কেন ঠকাব বল। তোমার আমার সম্পর্ক একটা বিশেষ গণ্ডি ছাড়িয়ে আর কোথাও যাবে না সেটা তিনি হয়তো গোড়া থেকেই ঠিক করে রেখেছেন, আর হয়তোবাই বলি কেন—আর তোমার বাবার কথা? আমি তো তোমায় বলেছি, একেবারেই আলাদা, তার কারণও তোমায় বলেছি—

ভেঙে ভেঙে টুকরো টুকরো করে এতগুলো কথা বলতে অনেক সময় নিয়েছে সে, অনেকখানি পথও চলে এসেছে।

সামনের একটা সিনেমা হলের বাইরের ধাঁধানো আলোর মধ্যে দুজনে

এসে পড়েছে। স্মৃতির মুখের ওপর চোখ পড়তে দেখে ওর দৃষ্টি সিনেমা হলের মাথায় টাঙানো মস্ত ছবিটার দিকে নিবদ্ধ। মস্ত বড় নানা রঙের একখানা ছবি। নায়িকা মালা হাতে নৃত্যরতা আর নায়ক অদূরে একটা ঢিপির ওপর বসে বিমুগ্ধ চোখে তাকিয়ে আছে তার দিকে।

স্মৃতিরেখা কি তবে ওর একটি কথাও কানে তোলেনি। ওই ছবিতে আঁকা কোন পুরুষের কথা মনে মনে কল্পনা করছিল। তাকে তিরস্কারও করছিল মনে মনে, আপনার মতো সামান্য লোকের অমূল্য উপদেশ না পেলেও আমার চলত। আমার বিয়ে ঠিকই হবে, আপনি দেখতেও পাবেন।...তারপর অতর্কিতে এসে হাজির হবে তার কাছে একদিন স্মৃতির বিয়ের চিঠি। অহঙ্কারে বাধলে স্মৃতিরেখার মতো মেয়েদের কাছে কোন কিছুর ক্ষমা নেই। জয়-করার উদ্দাম নেশায় ওরা সব কিছু ভাসিয়ে নিয়ে যেতে চায়। সেখানে বাধা পেলে ওরা কোন কিছু সহানুভূতি ভালবাসা বা হৃদয় দিয়ে বিচার করার দৃষ্টি হারিয়ে ফেলে অন্ধ হয়। অথচ এই স্মৃতিরেখা কি কোনদিন ভালবাসার টানে কারও হাত ধরে গাছতলায় এসে দাঁড়াতে পারে? দোষই বা কি স্মৃতিরেখার। এতদিন যে-অহঙ্কার যে-সংস্কার দিয়ে স্মৃতিরেখার মা মেয়েকে একটু একটু করে এতবড় করে তুলেছেন, তা থেকে স্মৃতিরই বা মুক্তি কোথায়। স্মৃতি কি করে ভুলে যায় মা'র রক্ত তার শরীরে আগুনের মতো জ্বলছে চলতে ফিরতে সারাক্ষণ। ভালই হয়েছে, যে-কথা স্মৃতিকে একদিন বলতে হত তা আজই বলতে পেরেছে।

স্মৃতি ভুল বুঝেছে। তবু তারই মধ্যে ভালবাসার ব্যথায় যতখানি দগ্ধেছে, প্রায় ততখানি দগ্ধেছে অহঙ্কারের পরাজয়ে। স্মৃতিরেখার জায়গায় অতি দুঃস্থ নিঃসহায় সাধারণ একটি মেয়ের কথা ভেবে ওর বেশি করে মনে হয়েছে কথাটা।

এই ভাবে এসপ্লানেডের চৌমাথায় এসে দাঁড়িয়েছে দুজনে। এতক্ষণ রাস্তার ভিড় কোলাহল নজরে আসেনি কারও। এইবার ভাল করে চোখে পড়ল কলকাতার সান্ধ্য কোলাহল, নাগরিক ভিড়। পৃথিবীর সব লোক জীবনের অসীম ক্লান্তিতে ভুগে ভুগে উন্মাদ বাধাহীন হয়ে বেরিয়ে পড়েছে সামান্য কটি স্নিগ্ধ সিক্ত মুহূর্তকে অক্ষয় করে রাখার

প্রয়াসে। জীবনের নানা উচ্ছলতা এখানে এই চৌমাথায় এসে মিলেছে একটি গাঢ় স্রোতে। এ মুহূর্তে এই স্রোতে যে গা-ভাসাতে পেরেছে সে বুঝেছে যৌবনের ভোগের মূল্য কি, আর এ মূল্যের উপলব্ধি ছাড়া, জীবনের আর দ্বিতীয় অর্থ কি থাকতে পারে। এখানে দাঁড়িয়ে সুখের ভোগের তৃপ্তির প্রতিযোগিতায় প্রত্যেকটি মানুষ আপেক্ষিক ভাবে নিজেকে বঞ্চিত মনে করছে। যে কোনদিনও ভাগ্য মানে না, সেও অনুচ্চারিত কণ্ঠে আক্ষেপ করেছে, সবই ভাগ্য !

অন্যদিন হলে স্মৃতির পিঠে আলতো হাত রেখে বা প্রয়োজনে স্মৃতিরেখার কব্জি নিজের মুঠির মধ্যে, হয়তো একটা অভ্যাসের মতোই, চেপে ধরে রাস্তার এলোমেলো জনতা, ট্রাম-বাস-মোটরের আরও নানান যানবাহন চলাচলের, কোলাহলের গোলকধাঁধা পেরিয়ে রাস্তার অন্য ফুটে এসে দাঁড়িয়েছে।

স্মৃতি ট্র্যামে ওঠবার পরই সে লক্ষ্য করেছে কোথায় গিয়ে আসন নিল। তারপরই দুষ্টুবুদ্ধি চাড়া দিয়ে উঠেছে। গিয়ে উঠেছে সেকেণ্ড ক্লাশে। গন্তব্যে পৌঁছলে স্মৃতি ট্র্যাম থেকে নেমে খুব অবাক হয়ে গেছে ওকে দেখে। কৃত্রিম রাগ দেখিয়ে বলেছে, এরকম চোরের মতন ফলো করার কোন মানে হয় না।

পিছনের সিটের ভদ্রলোক কিন্তু বেশ স্মার্ট, আমি অনেকক্ষণ ধরে লক্ষ্য করছিলুম, আরও একটু চটিয়ে দেওয়ার জন্যে ও হয়তো বলেছে।

ধন্য তুমি !

তবে আমাদের সেকেণ্ড ক্লাশ কামরাতেও একটি মেয়ে উঠেছিল। নেহাৎই সেকেণ্ড ক্লাশ বলে যা কারও চোখে পড়ল না।

আজ কিন্তু হাত কেমন আড়ষ্ট হয়ে রইল। অন্যদিন হলে তারই শুধু গাড়ি ঘোড়া ভিড়ের ওপর নজর রাখার দরকার। স্মৃতি শুধু তার ওপর নির্ভর করে তাকে অনুসরণ করে বা তার পাশাপাশি থেকে পার হয়ে যাবে রাস্তাটা। আজ দুজনকে সমান নজর রাখতে হচ্ছে রাস্তা পার হওয়ার সময়। দুজনের কেউ পরস্পরকে চেনে না। শুধু ভিড়ের মধ্যে থেকে ছিটকে এসে পাশাপাশি দাঁড়িয়েছে সাময়িক।

ট্র্যাম এল। আর এতক্ষণের নীরবতা নিয়ে স্মৃতি ট্র্যামেও উঠল।

তার দিকে একটু ঘাড় কাত করল, ঠিক পিছন ফিরল না। স্পষ্ট কেন অস্পষ্ট চোখেও একবার তাকাল না।

অনেকদিন স্মৃতির সঙ্গে এক ট্র্যামে যেতে যেতে কত কি সব ভেবেছে, যখন ট্র্যামটা এসপ্লানেডের আলো আর কোলাহল ছাড়িয়ে অন্ধকারের মধ্যে এসে গেছে। ওপাশে আলিপুর আর খিদিরপুরের ট্র্যামরাস্তাটার দিকে চেয়ে চেয়ে ও শুধু ময়দানের অন্ধকারই দেখতে পাচ্ছিল। থিয়েটার রোড আসার আগে পর্যন্ত এমনই অন্ধকার পাবে। ময়দানের এই অন্ধকার যেন অসমাপ্ত। আর সাদা ট্র্যামের ছোট্ট শরীরটা সেই অন্ধকারের মধ্যে একটু একটু করে ডুবে যাচ্ছে। সেই ছেলেবেলার একখানা ছবির বইয়ের কথাই মনে আসছিল। একটা অন্ধকার টানেল আর তার মধ্যে দিয়ে ছুটে চলেছে একখানা এঞ্জিন। ভাবতে ভাবতে কল্পনার কোন অতলে গিয়ে ঠেকেছিল মনের চিন্তা। মনে হয়েছিল একটা অজগর মস্ত হাঁ করে আছে, আর একটা ক্ষ্যাপা বুনো মোষ তার নিশ্বাসের যাদুতে সেই প্রকাণ্ড হাঁ-য়ের মধ্যে নিজেকে ফেলে দিচ্ছে।

স্মৃতিরেখার ট্র্যাম চলে গেল। হঠাৎই মনে হল বুঝি শেষবারের মতো ট্র্যামে তুলে দিল। তারপর আর দুয়েকটা ট্র্যাম এসে দাঁড়াল।

এইবার সিগারেটের দরকার। কিন্তু পকেটে আর একটিও সিগারেট নেই। ধর্মতলার ওদিকে গিয়ে সিগারেট কিনবে। এক কাপ চায়েরও প্রয়োজন। আর নির্জনতা ভাল লাগছে না। কতকগুলো লোকের মুখ দেখা দরকার স্পষ্ট করে। এক কাপ চা নিয়ে, একটা সিগারেট ধরিয়ে, দু পাঁচটা লোকের মুখের দিকে তাকিয়ে তাদের আলাপ বা এমনকি শুধু কণ্ঠস্বর শুনতে পেলে বেঁচে যায়।

॥ ১১ ॥

শ্বেতাদি আর অনিমেষবাবু প্রায় ঠিক ঘড়ির কাঁটা ধরেই এসেছেন। কলকাতা ছাড়ার আগে আর কোথাও যাওয়া হয়ে উঠুক আর নাই উঠুক তাদের এখানে এসে অন্তত একবার দেখা দিয়ে যেতেই হবে। আর কাউকে না-হোক ছোড়দিকে বিশেষ করে বড় ভয় শ্বেতাদির। এখানে দেখা না-করে পালিয়ে গিয়ে, হাজার মাইল দুর থেকে যে চিঠি লিখে জানাবে, আসার সময় এমন তাড়াহুড়ো—ভাই পারুল, তোর সঙ্গেও একটিবার দেখা করে আসতে পারলুম না, তা চলবে না। তা ছাড়া এতদিন পরে এসেছে শ্বেতাদি। শুধুমাত্র চোখের দেখাই দিয়ে যাবে তা নয়, বসে প্রাণ খুলে কথা বলে, গল্প করেও যাবে।

আশ্চর্য জমিয়ে কথা বলতে পারেন শ্বেতাদির স্বামী অনিমেষবাবু। লোকটি সম্পর্কে যতটুকু শুনেছে, দেখে আরও বেশি অবাক হল, তাজ্জব বনে গেল। ঠিক যেন স্মৃতির মামাকে দেখছে, অন্য পোশাকে মেক-আপ নিয়ে। কোথায় দুজনের গভীর মিল। মুখের দিকে তাকালে মনে হবে এ শহরে যত যুবক নির্জনতা বা বিষণ্ণতা রোগে ভুগছে, তারা এসে স্মৃতির মামা বা অনিমেষবাবুর সঙ্গে দেখা করুক। তাঁদের কারও একজনের সঙ্গে মুখোমুখি এসে কিছুক্ষণ বসুক। তা হলেই তারা বুঝতে পারবে তাদের রোগের মহৌষধ কোথায় মিলবে।

শ্বেতাদির মা দেখেশুনেই জামাই বেছেচেন। সুন্দর দামি স্যুটে অনিমেষবাবুর গৌরবর্ণ চেহারা বেশ খুলেছে। চোখে দামি ফ্রেমের চশমা। মুখে শৌখিন পাইপ। তা থেকে অতিরিক্ত দামি তামাকের ধোঁয়া ছাড়লেন। মুখে কারণে অকারণে হাসি। অথচ যে হাসি শুধু তিনিই হাসতে পারেন, অন্য কাউকে যেন মানায় না। সংসারে বাঁচতে গেলে এমন একটা সাফল্যের প্রয়োজন, যা না-হলে কারও কথা বা

হাসির মধ্যে আত্মপ্রত্যয়ের দৃঢ়তা বা সফলতার দীপ্তি ফুটে ওঠে না। সেই অর্থে সবাইকার হাসিও অন্যের চোখে তাৎপর্যময় বা অসাধারণ হয়ে ওঠে না। অনিমেষবাবু সে বিচারে নিতান্তই ভাগ্যবান কৃতী পুরুষ। আর এইখানেই তার মনে হল অনিমেষবাবুর সঙ্গে স্মৃতির ছোটমামার মস্ত তফাৎ। তিনি হয়তো হাসির তাগিদে বা জোর করেই হেসেছেন। কেউ তারিফ করল কিনা সেদিকে বিশেষ নজর নেই তাঁর। কিন্তু অনিমেষবাবুর দাবি আছে। তিনি চান তাঁর হাসি কথা লোকে তারিফ করুক। নিজের পরিচিত বন্ধুবান্ধব আত্মীয়স্বজনদের কাছে যেমন দাবি আছে, তেমনি আছে স্ত্রীর পরিচিত সবায়ের কাছে। তাঁর হাসির অর্থ সব সময় বুঝি একটিই, জীবনে আশাতীত সফল ও অসামান্য কৃতী একজন পুরুষ এমনি করে হাসতে পারে। অতীশদা বা তার মতো কেউ এই ভাবে হাসলে লোকহাসানোই হবে। বিশেষ করে অবিবাহিতা মেয়েরা সে হাসিকে কোন মর্যাদা দেবে না। যদি কোন কোন মেয়ে দিয়ে থাকে তো তাদের ঔদার্যের তুলনা নেই। এই ভাবনা থেকেই স্মৃতিরেখার ঔদার্যের কথা ভেবে সে অবাক হয়।

শ্বেতাদির সাজপোশাক আজ অন্য দিনের তুলনায় বেশি করে চোখে পড়ার মত। জমকাল মূল্যবান সিল্কের শাড়ি জড়িয়েছে। গায়ের জামাও দামি সিল্কের। গায়ের মুখের রঙ যেন তাইতেই আরও বেশি চড়া মনে হয়। মাথায় অভিনব কায়দায় খোঁপা বেঁধেছে। এমন কায়দায় খোঁপা বেঁধে দৃষ্টিতে বিভ্রম ঘটাতে দেখেছে একমাত্র স্মৃতিকে। ওর মনে হয়েছে এতে বেশ সময় লাগে। আর তা ছাড়া কেশ পরিচর্যার আপ-টু-ডেট ফ্যাশনও জানা চাই। বলা বাহুল্য ছোড়দির বোধ হয় ঐ দুটোর কোনটাই নেই। স্মৃতির দিকে যেমন করে চেয়ে থেকেছে অবাক চোখে, আজ শ্বেতাদির দিকে প্রায় সেই বিস্ময় নিয়ে চেয়ে থাকে। শ্বেতাদিকে বার বার আপাঙ্গ দেখেও যেন ছোড়দির চোখের বিস্ময় কাটতে চায় না। ওর কি জানি মনে হল ছোড়দিকে দেখে, ছোড়দি নিজেই বুঝি সেজেছে।

শ্বেতাদির সাজের মধ্যে সবচেয়ে আকর্ষণীয় হয়েছে গলার হার। আজ একেবারে নতুন রকমের একটা কি পরে এসেছে গলায়। ওটাকে

হার বলে, না অন্য কিছু একটা নাম আছে ওটার। ছোড়দি গলার ওইটার দিকেই বুঝি সারাক্ষণ তাকিয়ে আছে। শ্বেতা চিরকাল আশ্চর্য কিছু দেখিয়ে গেল।

মা বলছে কাল এই কাপড়খানা পড়েই যেতে। আমারও ইচ্ছে, তুই কি বলিস? শ্বেতাদি যেন এখন সুযোগ পেলে ছোড়দির মতই চায় নিজের সব ব্যাপারে, এমন করে জিজ্ঞাসা করল।

খুব ভাল দেখাচ্ছে, এটা পরেই যা, ছোড়দি যখন কথা বলছে তখন অনিমেষবাবু ছোড়দির ওপর চোখ রাখেন।

এটা কি রকম হয়েছে কিছু বললি না, গলার হারটা বুকের ওপর থেকে ছোড়দির চোখের ওপর তুলে ধরে জিজ্ঞাসা করে শ্বেতাদি।

সেটাও বলা দরকার? চমৎকার হয়েছে, ছোড়দি খুশিতে প্রগলভ হয়ে ওঠে।

তোর বিয়েতে ঠিক এই রকম একটা দেব, কি পছন্দ তো?

যা! মার খাবি কিন্তু শ্বেতা, কোথায় বিয়ে তা-র...

অনিমেষবাবু এতক্ষণ ছোড়দির আর শ্বেতাদির কথায় কান রেখে ছোড়দির মুখের দিকেই তাকিয়ে আছেন। এবার স্ত্রীর ওপর চোখ সরিয়ে এনে বললেন, তুমি দয়া করে ওই প্যাটার্ন ছাড়া আর যা খুশি পছন্দ কর। আমার খুব শিক্ষা হয়েছে। ব্যাপারটা না বললে আপনি বুঝতে পারবেন না ঠিক, ছোড়দির মুখের দিকে দৃষ্টি ফিরিয়ে কথা শেষ করেন অনিমেষবাবু।

বেশ তো, একটু বুঝিয়েই বলুন না।

কি বলব নাকি? স্ত্রীর দিকে প্রেমের দৃষ্টিতে তাকিয়ে অনিমেষবাবু বলেন।

ছোড়দির দৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে তারও দৃষ্টি গিয়ে পড়ল শ্বেতাদির ওপর! লজ্জায় যেন ভেঙে পড়বে শ্বেতাদি। কোন কথা যে কোন কথায় টেনে নিয়ে যেতে পারেন তার স্বামী তা শ্বেতাদি জীবনের শেষ দিনটিও বোধ হয় জানতে পারবে না। শ্বেতাদির মুখে অন্তত এখন সেই ভাবই স্পষ্ট। যেন কি কুক্ষণেই মুখ দিয়ে বেরিয়েছিল কথাটা। এখন সামলাও।

হ্যাঁ হ্যাঁ বলুন আপনি, শ্বেতাদির কনসেণ্ট আছে, এই বার ও উৎসাহ

দেয়। ওর উৎসাহ পেয়ে অনিমেষবাবু বলেন, তা হলে বলাই যাক। সবায়ের যখন এত ইচ্ছে শোনার—

শ্বেতাদি ঘর থেকে বেরিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করতে ছোড়দি হাত ধরে টেনে নিয়ে আসে ঘরের মধ্যে।

সে বার ভাই কটা দিনের জন্মে বোম্বেতে এক হোটেলে উঠতে হয়েছে। বিয়ের পরই তো তিন চারটে মাস একা ঘুরলুম। তাই ভাবলুম এবার বউ সঙ্গে থাক, বুঝলেন—

এখন সুদে আসলে শোধ তুলছ তাই।

বাধা দিও না, চুপচাপ শুনে যাও। ওরই মধ্যে কর্তব্যও পালন করলুম। একদিন সিনেমাও গেলুম দুজনে। ফেরবার পথে এক দোকানের শো কেসে ওইটি নজরে পড়ল। নজরে পড়ার মতো জিনিস, আমিও অস্বীকার করি না। মুখ দেখেই বুঝতে পারলুম, খুব পছন্দ। মুখ ফুটে একবার বললেই হয়। তবু নানা কিছু ভেবে চুপ করে রইলুম। দোকানটার সামনে বেশিক্ষণ দাঁড়াতে চাইলুম না। কপালে নাচছে কে রুখবে বলুন। সকালে চা খাচ্ছি পরদিন, এমন সময় ম্যানেজারের দুত ইনভিটেশন নিয়ে এসে হাজির সরাসরি আমার হোটেলের ঠিকানায়। বিকেলে টি-পার্টির আমন্ত্রণ। সেই সকালে সব কাজ কম্ম ফেলে দোকান খুঁজতে বেরুলুম। ওই রকম এক আধখানা গয়না না-থাকলে নাকি টি-পার্টিতে যাওয়া চলে না।

মিথ্যে কথা বলে বলে না—মুখে একেবারে চড়া পড়ে গেছে।

আরে আমার চাকরির ক্রেডিট তো ওখানে।

তারপর কি করলেন শুনি, শেষ করুন, ছোড়দি বলল।

ভেবে দেখুন কি হিমসিম খেয়েছি দোকান খুঁজে বার করতে। তারপর বারোশোটি টাকা নগদ দিয়ে ঘরে এনেছি। আবার ওই প্যাটার্ন।

এ আর এমন কি করেছেন, শ্বেতাদির দিকে চেয়ে হেসে বলে ছোড়দি।

আমার অবস্থার কথা একবারও ভেবে দেখেছেন?

আপনার আর্থিক অবস্থার কথা না-হয় ছেড়ে দিলুম, মানসিক অবস্থার কথা খুব ভাল করেই ভেবে দেখেছি। স্রেফ নিজের প্রেস্টিজ বাঁচানর জন্মে করেছেন, ও বলে।

স্বামীর কথায় শ্বেতাদিও কোথায় অস্বস্তি বোধ করেছে। বিশেষত ছোড়দির মতো তারই সমবয়সী আরেকটি মেয়ের সামনে। গহনার ব্যথা তাকে না-হোক ছোড়দিকে নিশ্চয় স্পর্শ করবে। শ্বেতাদি বুঝি মনে মনে লজ্জা পেয়ে এ আলোচনায় ক্ষান্তি চাইছিল সারাক্ষণ।

আপনিও ভাই শেষকালে আমাকে চোর বানালেন। যার জন্যে চুরি করি সে তো সব সময়ে চোর বলছে, অনিমেষবাবু তার কথার জবাবে একটু ভেবে নিয়ে বলেন।

নিশ্চয়! আপনার প্রেস্টিজে লাগবে, তাই আপনি দৌড়দৌড়ি করে কিনে এনেছেন। এ আমার সোজা কথা, তার কথায় অনিমেষবাবু কোথায় গর্ব অনুভব করলেন। কারণ আহত হওয়ার কথা নয়।

কোথায়, সে ব্যক্তিটির দেখা নেই, অতীশদার অদর্শনেই কথাটা বলে অনিমেষবাবু ফের তাঁর শৌখিন পাইপে তামাক ভরতে লাগলেন।

সত্যি কোথায় তিনি! আজ আসবেন না নাকি? ছোড়দির মুখের দিকে চেয়ে প্রশ্ন করে শ্বেতাদি।

আসবেন ঠিকই, একটু দাম বাড়ানো অভ্যেস তো, ছোড়দি সবে কথা শেষ করেছে, এমনি সময় প্রায় বিনা নোটিশে অতীশদা এসে হাজির।

আরে আসুন, আসুন। বলতে বলতেই এসে গেছেন। এই মাত্র আপনার নাম করা হচ্ছিল, কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে জায়গা ছেড়ে একটু পা-ভেঙে দাঁড়ানোর ভঙ্গি করেন অনিমেষবাবু।

কি রকম কণ্ট্রোভার্শিয়াল পার্সন দেখেছেন তো, যেখানে আমি নেই সেখানেই আমাকে নিয়ে কথা, অতীশদা কথার শেষে একবার ছোড়দির দিকে চায়।

ওই অহঙ্কারেই গেলেন! অনিমেষবাবু আর শ্বেতাদির যৌথ উপস্থিতি ভুলে ছোড়দি স্বাভাবিক স্বরেই বলে।

এই, কি বলছিলি একটু আগে বলব? ছোড়দিকে শাসিয়ে অতীশদার মুখের দিকে এমন ক'রে তাকাল যেন এখুনি বলে দেবে শ্বেতাদি।

খবরদার শ্বেতা!

কি খবর বলুন আপনার। কাউকে দেখার আগে তার সম্বন্ধে এত

কথা আর কখনও শুনিনি মশাই, যত শুনেছি আপনার সম্পর্কে। আর আমার সোর্সটিকে নিশ্চয় জানেন, অনিমেষবাবু একটু বাঁকা চোখে তাকান শ্বেতাদির দিকে। অতীশদা শ্বেতাদির দিকে তাকিয়ে একটু হাসল। যেন কৃতজ্ঞতা জানাল। তারপর বলল অনিমেষবাবুকে

রাজনীতি তো আর করলেন না, বিখ্যাত হবেন কোথা থেকে।

বিখ্যাত হতে চাইনা মশাই। এখন মান সম্মানটুকু বাঁচিয়ে চলতে পারলেই হয়। এই তো, একটি সামান্য কণ্ঠহার নিয়ে ভায়া আমাকে একবার কোনঠাসা করে ছাড়লেন।

সামান্য বলবেন না, অসামান্য বলুন। দামটা বলে দিন অতীশদাকে।

আরে, এমন কিছু নয় মশাই। সামান্য একটি কণ্ঠহারের প্যাটার্ন, তাও আপনার বিয়ের উপহার প্রসঙ্গে।

আমার বিয়ের উপহার ?

হ্যাঁ, তাতে কোন সন্দেহ নেই, অনিমেষবাবুর গলার স্বর খুব ঘনিষ্ঠ মনে হল।

না মশাই, আমার বিয়েতে গোল্ড মার্কেটের কোন রোল নেই। ওই জন্যে বিয়ের আগেই সব কণ্ট্রাক্ট হয়ে যাচ্ছে। যেদিন হারের প্যাটার্ন নিয়ে একটি কথা উঠবে সেদিনই কিন্তু ডিভোর্স, অতীশদা সোজাসুজি তাকাল ছোড়দির চোখে। শ্বেতাদিও চোখ ফেরাল ছোড়দির দিকে। কি অবস্থা হয় ছোড়দির, দেখার জন্যে।

ছোড়দি হারের প্যাটার্ন নিয়ে আলোচনা করছে অতীশদার সঙ্গে, আর অতীশদা রীতিমত গম্ভীর হয়ে মনোযোগ দিয়ে শুনছে ছোড়দির কথা, দৃশ্যটা কল্পনা করতেই সব ব্যাপারটা কেমন অস্বাভাবিক মনে করে তার হাসি পেল।

এ ব্যাপারে কিন্তু সবচেয়ে সুবিধে স্মৃতির, তার মা'র আলমারিতে নিশ্চয় গলার হারের প্যাটার্নের আপ-টু-ডেট ফ্যাশনের সব তালিকাগুলোই আছে। শুধু স্মৃতির পছন্দের অপেক্ষায় থাকা। ওর যদি সত্যিই পছন্দের প্রশ্ন ওঠে তা হলে ওর বাবা নিজেই ছুটবেন। আর মা কি বাধা দেবেন তাঁকে।

এতক্ষণ কথা গল্পের মাঝখানে স্মৃতির কথা ঠিক ভাল করে মনে

আসেনি। ছোড়দি যে স্মৃতিকে আজ বিশেষ করে আসতে বলেছিল, বার বার মনে পড়ল সে কথা। সে ধ্রুব জানে আসবে না, আসতে পারে না। তবু তার অনুপস্থিতি তাকে পীড়া দিচ্ছে, প্রায় দগ্ধাচ্ছে। ছোড়দির বিন্দুমাত্রও ধারণা ছিল না, স্মৃতি আসতে পারে না বা আসবে না। বরং আসবে নিশ্চিত আসবে, এই বিশ্বাসেই অনুরোধ করেছিল। তবু এখন একবারও মনে পড়েনি ছোড়দির ওর না-আসার কথা। এইখানেই কি ওর দুর্বলতা? আচ্ছা, স্মৃতি এ সন্ধ্যায় উপস্থিত থাকলে তার নিজের কিছু লাভ হত? যে-কথাগুলো বলেছিল সব ফিরিয়ে নিত আজ এই মুখর সন্ধ্যার ঘন আলাপে। আর স্মৃতিও মনের ভার লঘু করে দিয়ে সুখী হওয়ার গাঢ় স্বপ্ন নিয়ে বিদায় চাইত। কিন্তু ছোড়দির তো একবার অন্তত মনে পড়া উচিত ছিল স্মৃতিরেখার কথা। একটি মুখর সন্ধ্যার নিবিড় কোলাহল কৌতুকালাপ ছোড়দির মনে স্মৃতির অনুপস্থিতির অভাববোধকে ঘুম পাড়িয়ে রেখেছে। জীবনের অনেক সকাল অপরাহ্ন ও সন্ধ্যার সহস্র কোলাহলের মাঝখানে স্মৃতিরেখার চিন্তায় তার স্থায়ী অনুপস্থিতির ব্যথাও কবে আস্তে আস্তে একেবারে ডুবে যাবে। একদিন স্মৃতিরেখা হয়তো ভেবে অবাক হয়ে যাবে অনিন্দ্য রায় নামে একটি যুবককে গভীর ভালবেসে সে জীবনে সম্পূর্ণ হতে চেয়েছিল। তারপর মনে হবে দিন ক্ষণ কাল কিছুই তো ঠিক ঠিক স্মরণ করতে পারছে না। বাঁচার কোন পর্বে ঠিক ঘটেছিল ঘটনাগুলো কিছুতেই স্মরণে আসে না, আসে না। তারপর স্মরণ করার চেষ্টা বৃথা মনে করবে। নিজের মনেই হাসবে হয়তো বা পরক্ষণে। যে-হাসির অর্থ তার নিজের কাছে, নিজের একাকীত্বের কাছেও দুর্জ্ঞেয় থাকবে।

যাক ওসব কথা। এবার বলুন মশাই কবে ইনভিটেশন পাচ্ছি? আবার কথার সূত্রপাত করেন অনিমেষবাবু অতীশদাকে উদ্দেশ্য করে।

দাঁড়ান এই তো সবে কনসেণ্ট পেয়েছি। তা ছাড়া জানেন তো বর্তমানে আমার অবস্থা?

কী?

যাকে বলে প্রায় কনফার্মড বেকার।

যাক, কনফার্মড ব্যাচেলর থাকার ভয় থেকে তো মুক্তি দিয়েছেন।

ছোড়দির মুখে লজ্জার ছোপ লেগেছে এরই মধ্যে ও লক্ষ্য করে।

অবিশ্যি করেও ফেলা যায় বিয়েটা। আমি তো বিয়ে করছি না, আমাকে বিয়ে করা হচ্ছে। আর আমাকে যিনি বিবাহ করছেন তিনি তো এখন রোজগেরে, এখবরটা জানেন তো?

হ্যাঁ, পারুল সত্যিই একটা মাস্টারি করছে, স্বামীর যাতে অবিশ্বাস না-হয় তারই জন্যে যেন শ্বেতাদি বললে।

খুব সুখবর বলুন, আপনি ফরচুনেট। উল্লসিত হয়ে বললেন অনিমেষবাবু।

তা বলতে পারেন। এই দুর্দিনের বাজারে বেকার একটি লোকের, যার কোন ভবিষ্যত নেই, বিয়ে হয়ে যাচ্ছে ভাবতে পারেন?

আমি তো মশাই সত্যিই পারি না।

ওই তো ওইটুকুই বলবেন, প্রাণখুলে বলতে শেখেন নি। একটি পুরুষ বিনা পণে বিয়ে করলে তাকে উদার বলবেন, আর একটি মেয়ে একজন বেকার পুরুষকে উদ্ধার করল সেটার বেলায় কিছু না।

ধন্য মশাই আপনারা, মানে রাজনীতি করা লোকেরা, আসেও আপনাদের মাথায়।

আপনাদের তুলনায় কি এমন বলুন। দরকার হলে কোম্পানীর লাভের জন্যে চার পাঁচটা ভাষাতেই কথা শুরু করবেন।

সেটা তো নেহাৎই পেটের দায়ে।

পেট কি শুধু আপনাদেরই আছে।

যা খুশি মনে হয় বলুন।

সত্যি কি মনে হয় বলব? রাজনীতি করা লোকেদের সবচেয়ে বড় কম্‌পিটিটর কে জানেন, একজন পাকা এক্‌স্পিরিয়েন্সড সেল্‌স রেপ্রেসেণ্টেটিভ। কথায় আপনার সঙ্গে একজন পোলিটিকাল ওয়ার্কার পারবে মনে করেছেন?

যা মনে হয় বলুন; এটা কি সত্যি কম্‌প্লিমেণ্ট দিচ্ছেন?

পুরোপুরি।

অতীশদার মুখ থেকে শব্দ কটা বেরুনর সঙ্গে সঙ্গে হো-হো করে

হেসে ওঠেন অনিমেষবাবু। শ্বেতাদি আর ছোড়দিও সে হাসিতে যোগ না দিয়ে পারে না।

এতক্ষণে মা রান্নাঘর থেকে ছুটি পেল। আঁচলে মুখের ঘাম মুছতে মুছতে যখন ঘরে এসে ঢুকল তখন অনিমেষবাবুর হাসির শব্দতরঙ্গ একেবারে মিলিয়ে যায়নি। তাই মা'কে অমন ঘামা ঘামা অবস্থায় দেখে সবাই একটু অপ্রতিভ বোধ করে। মুখের হাসি মুছে ফেলে প্রায় এক সঙ্গে মা'র দিকে চোখ ফেরায়। বুঝতে পারে মা সারাক্ষণ উনুনের আঁচ লাগিয়ে দু জনের চা খাবারের ব্যবস্থা করছিল।

তুমি কি বিয়ে বাড়ির রান্না করতে বসেছ নাকি মাসিমা? সকৌতুক প্রশ্ন করে শ্বেতাদি।

তা করবটা কি? এত বড় বড় মেয়েদের যা কাণ্ডজ্ঞান, মা মুখে হাসি টেনে অনিমেষবাবুর দিকে চায়।

আপনার অতিরিক্ত আদরে আদরেই হয়েছে, অনিমেষবাবুর কণ্ঠের আন্তরিকতায় মা খুশি হল খুব। মুখ দেখে তো তাই মনে হয়।

আমাকে ডাকলে না কেন? শ্বেতাদির কথা যেন তৈরীই ছিল।

আজ তো ডাকলে পারতুম। কাল তোমায় কোথায় পাবো। আমার কাছে কি আর তোমাদের মন টেঁকে, থাকবে কেন আমার কাছে? মা'র কথাগুলো অনিমেষবাবু সহৃদয় শ্রোতার মত শুনলেন। ওর শুধু মনে হল, মা কি জীবনে এমন একটি সুযোগ খুঁজছে, যখন ছোড়দিকে নিয়ে অতীশদা অনেক দূরে চলে যাওয়ার প্রাক্কালে মা'র সঙ্গে দেখা করতে এসেছে, আর মা ছোড়দিকেই বলছে কথাগুলো।

আচ্ছা, আমি যদি সত্যি সত্যি তোমার সঙ্গে থাকি, সেই ছেলেবেলার আব্দারের সুরে শ্বেতাদি মা'কে ধরে বলে।

জামাই তাহলে আমাকে আস্ত রাখবে না কি মনে করেছিস, মা শ্বেতাদিকে আদর করতে করতে অনিমেষবাবুর দিকে তাকিয়ে বলে।

সবাই আমায় দোষী করছে বলে আপনিও করবেন মাসিমা? খুব অন্তরঙ্গ কণ্ঠে মা'র কথার উত্তরে বলেন অনিমেষবাবু।

না না বাবা তোমাকে দোষ দেবো—এসেছ এই আমার কত ভাগ্যি।

ওসব বললে কিন্তু মাসিমা আমি আর এ মুখো হচ্ছি না।

ওকথা বলো না বাবা। এখনো কি তোমাদের চা খাবার টাইম হবে না হবে-না? শ্বেতাদির দিকে চায় মা।

তুমি তো একথা বলছ মাসিমা। যে কাণ্ড বাঁধিয়ে বসে আছে না দিদি, শ্বেতাদি ওর দিকে চেয়ে এইবার কথা শেষ করে।

যে অস্বস্তির জন্যে সে ও ঘর থেকে এ ঘরে চলে এল, তার চেয়েও বেশি অস্বস্তি ছোড়দির এখানে। বলাইবাবুর ছাড়া অন্য কারো সঙ্গে অরুদির বিয়ে হলে কথা ছিল না। অরুদির বিয়ে, আর বিয়ে শেষপর্যন্ত বলাইবাবুর সঙ্গেই। অথচ খবরটা শ্বেতাদিই বা চেপে রাখে কি করে?

যা হয়েছে ভালই হয়েছে। তা বলাইদা এখন কোথায়, শ্বেতাদির তাকানোর উত্তরে ওকে একটা কিছু বলতে হয়।

এখন বাড়ি ফেরার তো কথা নয়। মনে হয় চিঠি পেয়েই ফিরেছেন বলাইদা, শ্বেতাদি অনেকখানি নিশ্চিন্ত হয়েছে মনে হয় কথার ভঙ্গিতে।

তবে যা-ই বল, আমার ছোট জামায়ের মত কেউ নয়। চেহারায় বিদ্যেবুদ্ধিতে—আর মেয়েই বা কটা মেলে এমন, মা কথা শেষ করে শ্বেতাদির গালে একটু চাপ দেয়।

মা কি খুশি হয়নি বলাইদা-অরুদির এই বিয়ের খবরে। তাই শ্বেতাদি আর অনিমেষবাবুর দৈত জীবনকে এত বেশি বড় করে দেখছে। মনের অশান্ত ক্ষোভ আর অস্বস্তিকর ভাবনাটাকে এমন করে প্রকাশ করেছে। সংসারে টাকার জোরে যে অসাধ্য সাধন হয় এ বিশ্বাস মা'র চিরকালের। এইবার যেন তার একটা জলন্ত প্রমাণ পেল। অনেক টাকা থাকলে মা কি ছোড়দির ভাবনা থেকে মুক্তি পেত না অনায়াসে। অতীশদার চাকরির অপেক্ষায় থাকত না। ছোড়দির জন্যে পাত্র জোগাড় করত। এত বড় দেশটা থেকে কি ছোড়দির পাত্র জুটত না, মা যদি অকৃপণ হাতে টাকা ঢালত। কিন্তু মা কি সত্যিই বিশ্বাস করে, টাকা থাকলে মা ছোড়দিকে অতীশদার সম্পর্ক থেকে বিচ্ছিন্ন করে অন্য কোথাও পাঠিয়ে দিতে পারত। বাবার জীবদ্দশায় যদি বা সম্ভব হত বাবার মৃত্যুর পর ছোড়দি-অতীশদার সম্পর্ক যেখানে এসে ঠেকেছে, তাতে মা'র এ চেষ্টা কিছুতেই সফল হত না। এ নিয়ে মাকে প্রশ্ন করার কোন

সুযোগ পায়নি, তবে অনুমান করেছে ঠিকই মা'র মুখ দেখে, মুখের কথা শুনে।

ঠিক এ মুহূর্তে মা'র মুখ থেকে ওই কথাগুলো না-বেরুলে ওর মনের মধ্যেও হয়তো কথাগুলো এমন দ্রুত পাক খেয়ে যেত না। যে ক্ষোভ আফশোসের ব্যথাকে মা দিনে রাতে পুষে রেখেছে, সম্পূর্ণ অজান্তে কখনও কখনও এই ভাবে অসাবধান অসতর্ক মুহূর্তে কিসের তাড়নায় প্রকাশ পেয়েছে। মা'র লক্ষ্য রাখার কথা নয়, লক্ষ্য রেখেছে সে। আর তারও প্রয়োজন হত না যদি বাবা বেঁচে থাকত। যদি মা জীবনের সাধারণ সাচ্ছল্য খুঁজে পেত সকাল সন্ধ্যার নিতান্ত ঘরোয়া প্রাত্যহিক সংসারে।

মনের মধ্যে কথাগুলো, তড়িৎ হাওয়ার বেগে যেমন একখানা খোলা বইয়ের হালকা পাতাগুলো উলটিয়ে যায় হাত দিয়ে বাধা দেওয়ার আগেই, তেমনি করে ওলোটপালোট করে দিয়ে গেল স্বাভাবিক চিন্তাকে কটি মিনিট।

আর এই ভাবনার সামান্য অবকাশে ওঘর থেকে অনিমেষবাবুর কণ্ঠস্বর শোনা গেল, মাসিমা, এবার যে উঠতে হয়।

মা ডাক শুনেই পাশের ঘরে যাওয়ার জন্যে উঠল। সে মাকে অনুসরণ করল। মাকে দেখে অনিমেষবাবু আরেকবার বললেন, যেন নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও, এবার যে উঠব মাসিমা—

উঠবে ?

হ্যাঁ, আমার এক আত্মীয়র বাড়ি একটু ঘুরে যেতে হবে। আজ রাত্তিরের ট্রেনই ধরব, সময় পাব না।

না, তা হলে আর দেরি করে লাভ নেই। পারুল—

মা'র ডাকে স্বল্পক্ষণ পরেই ছোড়দি শ্বেতাদিকে নিয়ে উপস্থিত হয় এ ঘরে।

আবার কবে আসছ ? মা জিজ্ঞাসা করে অনিমেষবাবুকে।

বছর খানেকের তো আগে নয়। আর এখানে এলে আপনার সঙ্গে দেখা না-করে উপায় নেই। কথার শেষে আবার আন্তরিক হাসেন অনিমেষবাবু।

জায়গা ছেড়ে সামনে এগিয়ে এসে নিচু হয়ে মা'র পায়ে হাত দেন। মা বাধা দেয় না। মুখে শুধু বলে, থাক বাবা, থাক।

তারপর শ্বেতাদি যখন মাকে প্রণাম করার জন্যে নিচু হল, মা দুহাতে শ্বেতাদিকে টেনে তুলে আনে বুকের কাছে, তারপর শ্বেতাদির মাথাটা নিজের কাঁধের ওপর চেপে ধরে একটু ক্ষণ। সস্নেহে আদর করে মাথায় গালে হাত বুলিয়ে।

শ্বেতাদি মা'র কানে কানে কি যেন বললে আর ছোড়দির দিকে চেয়ে মৃদু হাসল। যেন সে হাসির রহস্য একমাত্র ছোড়দির কাছেই স্পষ্ট, যেমন কানে-কানে বলা অস্ফুট কথা কটি মা'র কানেই পেঁাছেছে।

সবই তো দেখতে পাচ্ছিস, ইচ্ছে থাকলেও হাত-পা বাঁধা নিজের অক্ষমতার গোপন কথাটা মা ঘরের সবায়ের কাছে প্রকাশ করতে চাইল। মা বুঝি নিতান্ত চুপিসাড়ে শ্বেতাদির কানেই কথাগুলো বলতে চেয়েছিল, কিন্তু পারল না। দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে সেই নাভি থেকে বুক ঠেলে ওপরে উঠে এসেছে। তারপর মা'র ইচ্ছার প্রতিরোধ সত্ত্বেও সবেগে বেরিয়েছে গলা দিয়ে। অতীশদা আর অনিমেষবাবুর কানেও স্পষ্ট গেছে।

মা'র মুখ দেখে মনে হয় মা লজ্জা পায়নি এতটুকু। শুধু শ্বেতাদির প্রশ্নই এ জন্যে দায়ী। ছোড়দির চোখের দৃষ্টি সলজ্জ আর মুখের চেহারা করুণ গাম্ভীর্যে একটু অস্বাভাবিক হয়ে ওঠে। বিশেষ করে অনিমেষবাবুর উপস্থিতি হেতু মা'র কথায়, যে কথা হয়তো মা দুঃখ করে সমস্ত জীবনে সহস্রবার উচ্চারণ করেছে, ছোড়দির লজ্জা এত বেশি।

অতীশদা নির্বিকার চিত্তে সিগারেট টেনে যাচ্ছে। যেন যত কথা হচ্ছে তোমাদের, সে সব কথার শেষ গতি আমার জানা আছে। একটি কথাও কেউ কাল সকাল পর্যন্ত মনে রাখবে না।

সেটা বার কর তো, স্বামীর দিকে তাকিয়ে বলে শ্বেতাদি। কি যে বার করতে বলে চামড়ার ব্যাগটা থেকে কেউ ধরতে পারে না। আর অনিমেষবাবু এমন চোখে তাকালেন, শ্বেতাদি ভয় পেল, ভুলে গেছেন বুঝি সঙ্গে করে আনতে।

কি ভুলে গেছ নাকি? শঙ্কিত চোখে শ্বেতাদি প্রশ্ন করে।

আরে না, না, শুধু এইটুকু বলে অনিমেষবাবু সঙ্গে আনা চামড়ার ব্যাগ

থেকে একটা কাগজের বড় মোড়ক বার করে শ্বেতাদির হাতে দেন। অনিমেষবাবুর হাত থেকে মোড়কটা নিয়ে শ্বেতাদি ছোড়দির হাতে দিয়ে বলে, এই নে বাবা তোর জিনিস, পাগল করে দিয়েছিলি।

কথার শেষে লজ্জার আরক্ত দৃষ্টিতে একবার তাকায় শ্বেতাদি স্বামীর দিকে।

ছোড়দি দ্রুত হাতে ওপরে জড়ানো খবরেরকাগজখানা ছিঁড়তে থাকে।

অনিমেষবাবু আর শ্বেতাদির দুজনের একখানা ফোটো। সুন্দর সাদা কার্ডবোর্ডের ভিতর শৌখিন রুপোলি ফ্রেমে বাঁধানো।

ছোড়দির সঙ্গে সেও ঝুঁকে পড়ে ছবিখানার ওপর। এমন সুখী দম্পতির ছবি ক্বচিৎ চোখে পড়ে। স্বামী স্ত্রী দুজনেই দুজনের মূল্য সম্পর্কে পুরোপুরি সচেতন। শ্বেতাদির চোখের কোলে, গালের ভাঁজে, নাকের ডগায়, ওষ্ঠের দুই প্রান্তে খুশির চিকচিক আলো স্থির অচঞ্চল। অনিমেষবাবুর মুখে চাপা আত্মপ্রত্যয়ের কয়েকটি স্পষ্ট রেখা। জীবনে কোন ব্যাপারে যেমন ব্যর্থতা বঞ্চনা কি জানেন নি, তেমনি সফল হয়েছেন বুঝি স্ত্রী নির্বাচনের ব্যাপারেও।

হয়েছে বাবা হয়েছে। দেখবার অনেক সময় পাবি। চল, আমায় একটু এগিয়ে দিবি। আচ্ছা মাসিমা যাই—শ্বেতাদি মা'র অনুমতি চাওয়ার মত করে বলে।

আবার যাই বলে, বল আসি, মা কপট ধমক দিয়ে ওঠে।

আচ্ছা, আসি আসি আসি, হয়েছে তো।

মা শ্বেতাদির চপল কথা কটার উত্তরে নীরবে হাসতে থাকে।

কি মশাই উঠবেন নাকি? অনিমেষবাবু অতীশদাকে জিজ্ঞাসা করেন।

হ্যাঁ চলুন, ওঠা যাক, পাঞ্জাবির বোতাম আঁটতে আঁটতে উঠে দাঁড়ায় অতীশদা। প্রখর উজ্জ্বল ও যথার্থ প্রেমিকের মত মনে হল অতীশদাকে তার, কি জানি।

সবাই বেরিয়ে যাবার পর মা ওকে জিজ্ঞাসা করল, কি রে একটু ঘুরে আসবি না?

বেরুতেও পারি একবার, মা যেন আর প্রশ্ন না-করে, এই ভাবেই জবাব

দেয়। মাও বোধ হয় বুঝতে পারে এরপর যে-কোন প্রশ্ন ওর কাছে বিরক্তিকর হবে। তাই সরে যায় সামনে থেকে।

ও বসে ভাবতে চেষ্টা করে কোথায় যেতে পারে এখন ছোড়দি আর অতীশদা। আগে তুলে দেবে অনিমেষবাবু আর শ্বেতাদিকে একটা ট্যাক্সিতে। তারপর ?

তারপর যাবে গঙ্গার ধারে সেই জেটিটার ওপর। পা মুড়ে বসবে দুজনে পাশাপাশি। আগে অনেকদিন সে ছোড়দি আর অতীশদা যেমন মাঝে মাঝে গিয়ে বসত সন্ধ্যার আলোগুলো রাস্তায় জ্বলে যাবার পর। তিন জনে চারিপাশের অন্ধকারকে অনুভব করত। ঠিক যেন গলানো তরল অন্ধকারকে মুখে চোখে গায়ে পিঠে তিন জনে মাখছে। তারপর গঙ্গার জলে সেই অন্ধকারকে ঘষে ঘষে তোলবার জন্যে স্নান করবে তিন জনে। আবার রাস্তার স্বচ্ছ-অস্বচ্ছ আলোয় পথ ধরে বাড়ি ফিরবে।

কত কি সব ভাবত অতীশদা জলের দিকে চেয়ে চেয়ে অন্ধকারে চোখ ঢেকে। ছোড়দি পাথরের মত বসে আড়ষ্ট হয়ে। কোন কথা বিশেষ বলত না। সে দুজনকে একা রেখে উঠে চলে যেত খানিকটা তফাতে। সিগারেট ধরিয়ে পায়চারি করত, স্মৃতিরেখার কথা স্মরণ করত।

এই সব ভাবতে ভাবতেই নজর পড়ল গিয়ে শ্বেতাদি-অনিমেষবাবুর ফোটোখানার ওপর।

অনিমেষবাবু আর শ্বেতাদির এই ছবিখানার দিকে ছোড়দি যখন নির্নিমেষ তাকিয়েছিল, সেও তাকিয়েছিল আর লক্ষ্য করছিল ছোড়দির মুখের ওপর কোন কোন প্রতিক্রিয়া।

মাঝে মাঝে ছোড়দির দৃষ্টি ছবির বিষয় ছেড়ে অনেক দূর চলে গিয়েছিল, তার মনে হয়েছে। অনিমেষবাবুকে শুধু অনিমেষবাবুই মনে হয়নি ; এতদিনের চেনা জানা শ্বেতাদিকে শুধু শ্বেতাদি নয়। দুজনে যেন বিশেষ বয়সে একজন পুরুষ আর একটি নারীর বাঁচার সব চেয়ে গভীর বিপুল ইচ্ছাকে মূর্ত করতে চেয়েছে। যে ইচ্ছার অপূর্ণতায় কোন একদিন জীবনকে, পারিপার্শ্বিকতাকে একেবারে শূন্য অসার মনে হওয়া আশ্চর্য কিছু নয়। চিন্তা করতে করতে ছোড়দির ভাবনা যেখানে গিয়ে ঠেকেছে, সেখানে অনিমেষবাবু কেমন করে যেন বলাইবাবু হয়ে গেছেন। আর

শ্বেতাদি হয়েছে অরুদি। এমনি করে একদিন বলাইবাবু আর অরুদিও ছবি তুলবে। শৌখিন ছিমছাম ফ্রেমে বাঁধিয়ে রাখবে আরেক নিশ্চিত সুখী দম্পতির ছবি। এত বড় জগতে একটি সুখী দম্পতি বার বার নিজেদের এমন করে ভিন্ন আকৃতিতে বিচিত্র ভঙ্গিতে প্রকাশ করে যাচ্ছে। তারপর কি ছোড়দি আরো ভেবেছে? যেখানে ভাবনা আর যথার্থ ভাবনা থাকেনি। চিন্তার অতল স্তরে অবগাহনের আকার নিয়েছে। আর সেইখানে কি শেষ পর্যন্ত বলাইবাবু অতীশদা, আর অরুদি পারুল হয়ে যায়নি? ছোড়দির মনে কি একবারও অমন একখানি ছবি তোলার কথা আসেনি? ছবি তুলে অমন সূক্ষ্ম রুপোলি ফ্রেমে বাঁধিয়ে শ্বেতাদির হাতে তুলে দেওয়ার ইচ্ছা জাগেনি?

যতক্ষণ ভেবেছে ছোড়দির কথা, ছোড়দির সম্ভব ইচ্ছার কথা, সমানে তাকিয়ে থেকেছে ছোড়দিকে উপহার-দেওয়া শ্বেতাদির ফোটোখানার দিকে। আর ছবিখানার ওপর থেকে চোখ তোলার পর যা কিছু মনে এসেছে, তা স্মৃতিরেখার আর তার নিজের কথা।

যদিও বা অতীশদা আর ছোড়দি সুযোগ সুবিধের অবকাশে এমন করে ছবি তোলে, সে আর স্মৃতিরেখা কি কোনদিনও তুলবে। স্মৃতি অভিমান অহঙ্কারের কথা স্পষ্ট জানিয়ে দিল আজ। না-হলে একবার আসত। অন্তত ছোড়দির অনুরোধেও আসত। অনেক দিন এমন গেছে তার ওপর রাগ অভিমানের চূড়ান্ত রূপ প্রকাশ করেছে। তবু ছোড়দি অনুরোধ করলে সে অনুরোধ উপেক্ষা করেনি। স্মৃতি আর আসবে না বলেই কি ছোড়দিরও আজ তেমন করে একটি বারও মনে পড়ল না স্মৃতিরেখার কথা।

সে ভেবে আশ্চর্য হয়, অনেকের জীবনে বিনা আয়াসে অতি অল্প চেষ্টায় যা সফল হয়, যে ইচ্ছা পূর্ণতা পায়, হাজারো চেষ্টায় ছোড়দি বা তার জীবনে কোন ইচ্ছার একাংশও পূর্ণ হয় না। সেও কি তবে শেষ পর্যন্ত ছোড়দির মত ভাগ্যের দোহাই পাড়বে?

যত কথাই মনে আসুক তার ফোটোখানা দেখে, বাড়ি ফিরে ছোড়দি তো আবার অনেকক্ষণ এই ফোটোখানাই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখবে।

উঠে গিয়ে দেয়ালের এক শূন্য অংশে ছবিখানা টাঙিয়ে দেয়।

সহজে চোখে পড়ে এমন জায়গায়। ছবিখানা যে ইতিমধ্যে দেয়ালে কেউ টাঙিয়ে রাখতে পারে ছোড়দি ভাবতে পারবে না। খোঁজাখুঁজির পর যখন দেখবে দেয়ালের গায়ে তখন উৎসাহ হয়তো কিছু স্তিমিত হয়ে আসবে। তারপরই আহত হবে কয়েক পলক তাকিয়ে থাকার পর। আর শয্যায় ওই ফ্রেমে বাঁধানো ছবিখানার স্বপ্নই ছোড়দির রাত্রির স্বপ্ন হবে হয়তো বা।

॥ ১২ ॥

জানালার একটা পাল্লা খুলে গেছে ভোরের বাতাসে। আকাশে অনেক উঁচুতে দুরে ভোরের সঙ্গিহীন তারাটি জ্বলছে। হিমহিম হাওয়া ঘরে ঢুকে আলগোছে বিছানার চাদরের প্রান্ত ছুঁয়ে যাচ্ছে। কেমন একটা আলসেমি তাকে ধরে বসেছে। অভ্যাস মত বুকের নিচে দুটো বালিশ রেখে ঘাড়টা জানালার দিকে একটু হেলিয়ে প্রথম ভোরের অস্বচ্ছ আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকতে মন অবাধ পরিতৃপ্তিতে ভরে যায়। কোন দুর থেকে, কোথা থেকে থেমে থেমে ভেসে আসে করুণ গম্ভীর শব্দ......স্টিমারের ভোঁ।

খাওয়াদাওয়া সেরে কাল যখন বিছানায় আশ্রয় নিয়েছে তখনও ছোড়দি ফেরেনি। সে ছোড়দির গলার স্বর শুনতে পায়নি। তারপর ঘুমিয়ে পড়েছে। অনেক মাঝরাতে যখন ঘুম ভেঙেছে তখন ছোড়দির কণ্ঠস্বর শোনার কথা নয়। তাই শোনেও নি। স্বপ্ন যে একটা দেখেছে তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু স্বপ্নটা ঠিক স্মরণ করতে পারে না। খুব অস্বস্তি বোধ করে। কোথায় স্বপ্নটা শেষ হয়ে গেল, কেমন করে। কি যেন বিষয় ছিল স্বপ্নটার। কিছু মনে পড়ে। ভাল স্বপ্ন যে একটা নয় তা মনে পড়ে। কারণ মাঝরাতে ঘুম ভাঙার পর মন খারাপ হয়েছিল। একটা সিগারেট খেয়েছে। শব্দ করে করে জোরে টেনে টেনে।

তারপর এখন এই ভোর-ভোর আলোর অতি স্বল্প স্বচ্ছতায় ঘুম একেবারে ভেঙেছে। ভাললাগার মধ্যে একমাত্র হিমহিম হাওয়াটুকু। না-হলে ওই দুরের সঙ্গিহীন নির্জন তারা, অস্বচ্ছ আকাশে অস্পষ্ট আলোর রেখা, ক্ষণ বিরতির পর থেকে স্টিমারের গম্ভীর ব্যাকুল ধ্বনি চারিপাশে নিস্তরঙ্গ বিষাদকে বিছিয়ে রাখছে।

ছেলেবেলায় পরীক্ষার পড়ার জন্যে খুব প্রত্যুষে যখন শয্যা ত্যাগ করত তখন স্টিমারের গম্ভীর বিষণ্ণ ভোঁ কানে বাজতো, পাঠে ব্যাঘাত ঘটত। পড়া বন্ধ করে কান পেতে রাখত থেকে থেকে ভেসে-আসা ব্যাকুল বিলম্বিত ধ্বনিতে। সামান্য একটি শব্দের মধ্যে নিষ্ঠুর স্মৃতির দুঃসহ যন্ত্রণা যে এমন কৌশলে বাসা বেঁধে থাকতে পারে, আগে তা কখনও ভাবেনি। শুধু মন পাঠ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে উদাস বিবশ হয়েছে।

আর এখন? এখন মনে হচ্ছে এতদিনের সম্পূর্ণ জীবনটা যদি আবার একেবারে গোড়া থেকে বাঁচা যেত। ঠিক ডায়ারির পাতায় যেমন করে দিন তারিখ ছাপা থাকে, তেমনি জীবনের প্রতিটি ক্ষণ সুসামঞ্জস হিসাবে ভাগ করে নিত। আর তাতে অপচয় বন্ধ হত। আর বাঁচার ইতিবৃত্ত থেকে অপচয় বন্ধ হলে অঞ্জন বা নিপুর মত সার্থক জীবনের স্বাদ তারও অজানা থাকত না।

একটা বিশাল অপচয় জনিত যে শূন্যতাবোধ আর সেই শূন্যতাবোধ হেতু যে হৃদয়দীর্ণ হাহাকার, তা-ই যেন এই মুহূর্তে চারিপাশের অস্বচ্ছতার মধ্যে ভোরের এই আধ-স্বপ্নে তাকে নিরন্তর কান্নার তলহীন অগাধ গভীরে ঠেলে ঠেলে দিচ্ছে। নিরুপায় হয়ে সে একেক সময়ে স্রোতের ভিন্ন মুখে তীররেখার দিকে চেয়ে নিষ্ফল হাত-পা ছুঁড়ছে। অথচ স্রোতের বেগ রোধ করার ক্ষমতা হারিয়ে সে অবশ অক্ষম। না-হলে চোখ জলে ভিজে উঠবে কেন। এই চোখের জলের জন্যে দায়ী করবে কাকে?

স্মৃতি শেষ যেদিন এল, বলা যায় প্রায় অপ্রত্যাশিত এল, সেদিন ওর টেবিলের দুয়েকখানা বই নাড়াচাড়া করে এলোমেলো করেছিল। সেই বইগুলো সে রকম অবস্থাতেই আছে। অনেকদিন এই বিছানার চাদর উচ্ছল হয়ে এলোমেলো করেছে। বিছানার চাদর বালিশ। এখন এ মুহূর্তে বিছানার দিকে তাকিয়ে সামান্য কটা দিন বা মাস আগের বিক্ষিপ্ত টুকরো টুকরো স্মৃতিগুলো জুড়তে জুড়তে মনে হল তারা যেন কত দিনের পুরনো বিবর্ণ। স্মৃতিরেখা কোন প্রাচীন প্রস্তর মূর্তির প্রায়। যার গায়ে বিভিন্ন সময়ে কত উদ্দাম প্রেমিক নিজেদের নাম স্বাক্ষর করে গেছে।

এই সব কিছু নিয়ে সে কখন অনেকক্ষণ ভাবতে পারে এমনই ভঙ্গিতে বিছানার অবিরাম আলস্যে পূর্ণ মগ্ন হয়। স্মৃতির স্মৃতি ভোরের

আকাশের নিঃসঙ্গ ম্লান নিশ্চুপ তারাটি, আসন্ন শীতের মৃদু হিমেল হাওয়া, স্টিমারের বিষাদ গম্ভীর ধ্বনি, ঘরের এই নিরুপদ্রব নিরুদ্বিগ্ন নির্জনতা, বেঁচে থাকার এই প্রায় দুর্লভ অবকাশের মুহূর্ত সে সারা শরীরে মনে অনুভব করে।

যখন স্মরণ করার চেষ্টা করেছে তখন পারেনি। এখন প্রায় অতর্কিতে স্বপ্নটা এসে হানা দিয়েছে মনে। কিসের সঙ্গে কিসের জোড় লেগে যে অমন একটা স্বপ্ন তৈরী হতে পারে ভেবে বার করাটাও কষ্টসাধ্য।

একখানা চলন্ত ট্রেনের কামরায় দেখেছে স্মৃতিরেখাকে। চোখ মুখ বাহু আলাদা আলাদা করে স্পষ্ট কিছু চোখে পড়ে না, তবে স্মৃতি ছাড়া আর কেউ নয়। মুখের চেহারা ঠিক ধরা পড়ে না। খুশি-খুশি ভাব, না গম্ভীর। মুখোমুখি বসে আছে যে তাকে কিছুতেই চিনতে পারা যায় না। কিছুতেই কি মুখ ফেরাবে না লোকটা। কি রকম আলো-আঁধারির জাল সৃষ্টি করেছে নিজেদের চারপাশে ওরা। সিনেমার পর্দায় যারা কথা বলে হাসে কাঁদে তাদের মুখ কখন অন্ধকারে, কখন স্পষ্ট আলোয়, বা কখন আলো-অন্ধকারে। কিন্তু স্বপ্নে যারা আসে তাদের মুখ কখনও সুস্পষ্ট আলোয় দেখা যায় না। সব সময় তাদের চারিপাশে আলো-অন্ধকারের মায়াময় জাল বিছিয়ে রেখেছে। অথচ তাদের কথা কানে বাজে। মুখ চোখের ভাব ধরা পড়ে না সব সময়, নড়াচড়াও অনেক সময় অনুমান করে নিতে হয়, গলার স্বর যেন নিঃশব্দ থেকেও কানে বাজে। লোকটাকে চিনতে পারা গেল। গলার স্বরে, না মুখ ফেরানোয়, কিছু মনে আসে না। তবে অনিমেষবাবু। কোথায় যাচ্ছেন অনিমেষবাবু স্মৃতিরেখাকে নিয়ে? আর স্মৃতিরেখাই বা যাচ্ছে কেন? অনিমেষবাবু যে বললেন, এবার দক্ষিণ ভারতে যাবেন। মাদ্রাজে তাঁর কাজ। আর কাজের অবকাশে একবার কন্যাকুমারীকা পর্যন্ত ঘুরে আসবে। শ্বেতাদির ভীষণ শখ দক্ষিণ ভারতের মন্দির, সেখানকার কারুকার্য আর মূর্তিগুলো একবার দেখে আসে। কিন্তু কোথায় শ্বেতাদি? শ্বেতাদির বদলে স্মৃতিরেখাই কি যাচ্ছে শেষ পর্যন্ত অনিমেষবাবুর সঙ্গে। স্মৃতির মুখ থেকে কি অনিমেষবাবু তার আর স্মৃতির দীর্ঘ পরিচয়ের সব ইতিহাসটুকু জেনেছেন। আরও জেনেছেন তার অক্ষমতার কথা,

তার মনের কম্‌প্লেক্‌সের কথা। কি বলেছে স্মৃতি অনিমেষবাবুকে। অনিমেষবাবু একখানা হাত বাড়িয়ে স্মৃতির নরম একখানি হাতে আলতো চাপ দেন। বাধা দেওয়ার একটা দুর্মর বাসনা জেগে ওঠে। পারে না। কে যেন সমস্ত শক্তি কেড়ে নিয়েছে। চেঁচিয়ে উঠতে চায়। পারে না। কণ্ঠস্বর শক্ত দুটি হাতে কে রুদ্ধ করে দিয়েছে। এর চেয়ে বেশি অক্ষম নিজেকে আর কখনও মনে হয়নি। এরকম অসহায় মানুষ শুধু এক কাঁদতে পারে। কিন্তু সে তাও পারেনি। কান্নার শব্দের বদলে শুধু মাত্র মুখ দিয়ে একটা গোঙানির আওয়াজ বেরিয়েছে অস্ফুট। ঘুম ভেঙে গেছে।

এখন স্বপ্নটার কথা চিন্তা করে মন খারাপ হওয়ার চেয়ে বা হাসি পাওয়ার চেয়ে, লজ্জাই পাচ্ছে বেশি। যেন স্বপ্নটার সত্যতা প্রমাণ করার জন্যে, আকাশ আরেকটু পরিষ্কার হলেই ছুটবে। একবার খোঁজ করবে স্মৃতিরেখাদের বাড়ি। গিয়ে দেখবে স্মৃতি সত্যিই বাড়িতে নেই। তারপর ব্যাপারটার সবটুকু পরিষ্কার করার জন্যে ছুটবে শ্বেতাদির মা'র কাছে। খানিকটা তো মিলেই যাচ্ছে, আর বাকিটুকু মিললেই হয়। শ্বেতাদির মা'র কাছে গিয়ে দেখবে ঠিকই, অনিমেষবাবু নেই।

লজ্জা আর হাসির মিশ্রণে স্বপ্নটার কোন অর্থই এখন মনের মধ্যে ঘোরাফেরা করে না, চাপা পড়ে যায়। আর এরকম একটা স্বপ্ন ঘুমের মধ্যে দেখেছে বলেও অবাক হওয়ার কিছু নেই। কারণ স্বপ্নের মাথামুণ্ড কিছু থাকে না বেশির ভাগ সময়ে। এমন আজগুবি আর অবিশ্বাস্য। তবে হাসির চেয়ে লজ্জাই তার বেশি পেয়েছে। কারণ স্বপ্নটার সঙ্গে তার নিজের মনের উত্তেজনা আর দুর্ভাবনার একটা ক্ষীণ যোগসূত্র কোথায় পাওয়া গেছে।

আর অবাক হওয়ার কথাই যদি ওঠে তবে স্বপ্ন কেন। দৈনন্দিন বাস্তবে যা ঘটে তারও চেয়ে অবাক হওয়ার মত কোন কিছু মেলে না স্বপ্নরাজ্যে। এই যে অরুদি আর বলাইবাবুর বিয়েটা—এর চেয়ে অবাক করার মত সংবাদ, যা কয়েকটা দিন পরেই হয়তো ঘটনা হবে, আর কি থাকতে পারে। সে আর যাই কিছু ভেবে থাক, বলাইবাবুর সঙ্গে শেষ পর্যন্ত অরুদির বিয়ে এটা কিছুতেই ধ্যানধারণায় কুলোয় নি।

আর যা তার কাছে নিতান্ত অবিশ্বাস্য, অভাবনীয় তাই শেষ পর্যন্ত ঘটতে পারে, ঘটলও। ঘটালেন শ্বেতাদি-অরুদির মা। মেয়ের লাজ-লজ্জা মান-অভিমান ক্ষোভ-দুঃখ তাঁকে চঞ্চল করেছে। সে কারণে মেয়ের সমস্যার'ও একটা বিহিত করেছেন।

এমন অবাক হওয়ার মত একটি বিস্ময়কর ঘটনা দীনেনের জীবনে ঘটতে পারে না। এমন আত্মীয়স্বজন কি কেউ নেই দীনেনের যে তার সমস্যার একটা বিহিত করতে পারে। দীনেনের মা বা বাবা কেউ নেই। হয়তো আছেন। থাকলেও অক্ষম। আর পারলে কি করেন না। ইচ্ছে থাকলেও ক্ষমতা নেই। দীনেন কি তবে কাঁধ-ছেঁড়া ময়লা শার্টের হাতা গুটিয়ে এখন অনেকদিন অমন উদ্দেশ্যহীন ঘুরে বেড়াবে। তার সঙ্গে দেখা হলেই তাকে তাগিদ দেবে। কোনদিনও কি দীনেন তাকে এসে হাসি মুখে জানাবে না, একটা চাকরি পেয়েছি অনিন্দ্যদা। প্রথমটা বিশ্বাসই হতে চাইবে না। কারণ একটা বিশ্বাস্য ব্যাপারকেও দীনেন তার চলাফেরায় ব্যবহারে বাঁচার অভিজ্ঞতায় অবিশ্বাস্য করে তুলেছে। অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকতে হবে দীনেনের মুখের দিকে, সারা অবয়বের দিকে। পরে হয়তো বিশ্বাস হবে। কারণ চাকরি না-পেলে দীনেনের মত পোড়-খাওয়া ছেলের মুখের কালিপড়া রঙ এমন পাণ্টায় না। তারপর নজর পড়বে দীনেনের জামাকাপড়ের ওপর। ছিটের রঙীন একটা শার্ট বানিয়েছে দীনেন। রিফু-করা বা কোন কোন জায়গায় মোটা সেলাই-করা সাত পুরনো ধুতিখানাও পালটিয়েছে দীনেন। পায়ের জুতোটাও সংস্কার করিয়েছে, রঙ করিয়েছে।

কি বিশ্বাস করছেন না? চমক ভাঙবে হয়তো ওর দীনেনের সহাস প্রশ্নে। দীনেনের মুখের দিকে সলজ্জ দৃষ্টি রেখে বলবে, আরে! কী যে বল, বিশ্বাস করব না কি? চাকরি তো তোমার হতই, একটু দেরি হয়েছে।

একটু বলবেন না অনিন্দ্যদা। আমি তো আশা ছেড়েই দিয়েছিলুম, দীনেন নিজের দুরবস্থাকে পরিহাস করার মধ্যেও কোথায় আত্মবিশ্বাস খুঁজে পেয়েছে। আর চাকরি না-পেলে দীনেনের বয়সী কোন যুবক এ আত্মবিশ্বাস খুঁজে পায় না।

না না, কি যে বলো তোমার এজ আছে, এমন বয়স্ক ভঙ্গিতে বলে যেন দীনেনের এই চাকরি হওয়ার ব্যাপারে তার হাত আছে। সে গোড়া থেকেই জানতো আর খোঁজও পেয়েছে আগে থেকে দীনেনের চাকরটা হবে।

এজ তো আছে, এনার্জি ? কথাটা বলে দীনেন তাকে যেন এবার সত্যি একটু ঠাট্টা করতে চায়। চাকরিটার জোরে দীনেনেরও এমন করে কথা বলার অধিকার জন্মেছে বইকি। আর এনার্জির কথাটা যা বলেছে দীনেন তা এক অর্থে নিদারুণ সত্য।

এই সামান্য ছুটো কি তিনটে দিনে তার এনার্জির কিছুমাত্র আর অবশিষ্ট নেই মনে হচ্ছে। বাকিটুকু বলতেও বুঝি কিছু আর নেই। যখন নিঃশেষ হয় এমনি করে হয়। ও কি তখন সব কথা খুলে বলতে চাইবে দীনেনকে। দীনেনই বোধ হয় একমাত্র লোক যে ওর প্রত্যেকটি কথা অনুভব করবে। এমন কি বোধ হয় স্পর্শও করতে পারে স্পর্শকাতরতা নিয়ে। ছোড়দিকে বলতে সত্যি কেমন লজ্জা করে। অতীশদাকে তো একেবারেই নয়। কি বলবে দীনেনকে ?

বিশ্বাস করো দীনেন, আমার এনার্জি যেন এই একটা মাসে কে গুঁড়িয়ে তছনছ করেছে। স্মৃতিকে আমি ছাড়া ভালবাসবার অনেক যুবক আছে। কিন্তু আমাকে ভালবাসার জন্যে স্মৃতিরেখার মত ছুর্লভ মেয়ে কি আর একটিও আছে। তুমি দেখ দীনেন, ভাল করে ভেবে দেখ, এই নির্মম প্রাণহীন আত্মসুখসর্বস্ব সংসারের কোলাহলে তোমার জন্যে নির্জনে একলা বসে ভাবার কেউ না থাকলে তোমার জীবনে যে অপূর্ণতা, তা আর কোন কিছু দিয়ে ঢাকা যায় না। আর আমার দুঃখ কোথায় জান, স্মৃতির ক্ষেত্রেও সেই মিস আণ্ডার-স্ট্যাণ্ডিং।

যে দীনেন তার কথা চিরদিন গম্ভীর হয়ে শুনেছে সেও হেসে ফেলেছে, বলেছে, আপনিও এত সেন্টিমেন্টাল, সেই সোজা বহুব্যবহৃত অতিপুরনো কথাটাই দীনেন উচ্চারণ করবে। তারপর কি দীনেন বলবে, কথাগুলো শুনতে কিন্তু খুব ভাল লেগেছে অনিন্দ্যদা। ডায়ারি লেখার অভ্যাস থাকলে লিখে রাখবেন, না হলে হারিয়ে যাবে।

ঠাট্টার মত শোনাবে, এই ভয়ে ইচ্ছে থাকলেও মুখ ফুটে বলতে পারবে না দীনেন।

দীনেন ছাড়া আর যে দ্বিতীয় ব্যক্তি যাকে বলতে পারে মনের কথাটা খুলে তিনি শিবরতনবাবু। বয়সের ফারাক যাই হোক না কেন, ব্যবহারে সমবয়সী বন্ধুর মত। প্রাণখোলা আপন ভোলা লোক। যিনি প্রায়ই তাকে নির্জনে পেয়ে একটা এম. এ. ডিগ্রি নেওয়ার কথা বলেছেন, অফিস ছাড়ার উপদেশ দিয়েছেন। তার দুঃখটা যে কোথায় একমাত্র তিনিই অনুসন্ধান করার চেষ্টা করেছেন।

আর কোন ক্রমে তার ব্যর্থ বাসনার কথাটা যদি ওপরওয়ালাদের কার কানে যায়। বিশেষ করে মিস্টার বক্সির? জুনিয়র ক্লার্কদের এক তরুণ ছোকরা নাকি দুটি কবিতা কোন এক পত্রিকায় ছেপেছে, সেই কথাটা কি করে যেন মিস্টার বক্সির কানে উঠেছে।

যেখানেই যাই মশাই একটি করে কবি জোটে। ন্যাশানাল ব্যাঙ্কে ছিলাম, সেখানে এক কবি ছিলেন, এখানে এসেছি জুটেছেন আপনি। তা আপনারা কবিতা লেখেন, হাতের লেখা এমন কেন? অর্থাৎ মিস্টার বক্সি বোধ হয় স্মরণ করিয়ে দিতে চেয়েছিলেন, এখানে আপনার কাজটা কিন্তু ক্লার্কের। তাই হাতের লেখাটা ভাল হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

তার ভাবালুতার কথা যদি কোনক্রমে কেউ মিস্টার বক্সির কানে তোলে? কি বলবেন তিনি তাকে? আপনিও কি কবি নাকি মশাই?

ওকি উত্তরে বলবে, কবি নই, তবে কবিতা পড়ি। দরকার পড়লে মুখস্থও রাখি। যদি শোনার ধৈর্য থাকে আপনার শোনাতেও পারি স্মরণ থেকে। শুনলে আপনার নিজের দম্ভকে ধিক্কার দিতে ইচ্ছে করবে। শিল্পী হলে কি আপনার এই আস্ফালন সহ্য করতুম। শিল্পীর অহঙ্কার নিয়ে আপনার দম্ভকে পায়ের তলায় ছারপোকার মত পিষে মারতুম।

ওপাশ থেকে চায়ের সরঞ্জামের শব্দ আসে। আকাশের দিকে মাথা উঁচু করে চোখ তোলে। বেশ ফরসা হয়ে এসেছে আকাশটা এখন। ঘরের মধ্যেও আলো ঢুকেছে। সেই নিঃসঙ্গ তারাটি আকাশের সাদা আলোয় ক্রমশ ডুবে যাচ্ছে। আকাশটার দিকে তাকিয়ে আরেক বার মনে পড়ল অনিমেষবাবু আর শ্বেতাদির কথা। কাল রাত্রে মেল ট্রেন

ধরেছেন অনিমেষবাবু সস্ত্রীক। কতদূর চলে গেছেন তাঁরা? কোন স্টেশনে এসে তাঁদের গাড়ি থামল? অথচ কাল সন্ধ্যাবেলায় অনিমেষবাবু আর শ্বেতাদি তার এই ঘরে বসেই গল্প করেছে। তারা দুজনে এখন বাংলাদেশ ছেড়ে সুদূর দক্ষিণ ভারতের দেবমন্দিরের কারুকার্য দেখার আনন্দ স্বপ্নে বিভোর। এও কি কম অবাক করে?

এবার পেয়ালার মধ্যে অনেকক্ষণ চামচ নাড়ার শব্দ এল টুং টুং করে। ছোড়দির চা তৈরী শেষ হয়ে এল। ইদানীং চাকরি হওয়ার পর থেকেই ছোড়দি একটু সকাল সকাল চা করা শুরু করেছে। মা'র পুজো ছেড়ে উঠতে উঠতে রোদ বেশ উঠে যায়। তাই ছোড়দিকে রান্নার কাজেও আংশিক হাত লাগাতে হয়। তারপর মা-ই এসে যা করবার করবে।

এখুনি বৈদ্যনাথের হাতে দিয়ে চা পাঠিয়ে দেবে। চায়ের ব্যাপারে সত্যিই অতীশদা ভাগ্যবান। কারণ অতীশদা মনে করে ভাল চা করা একটা আর্ট, এবং সেই অর্থে ছোড়দি একজন আর্টিস্ট।

বৈদ্যনাথের নাম মনে আসতেই ভালো কথা, তার মনে পড়ে যায় কটা দরকারি কথা। কদিন ধরেই বৈদ্যনাথকে বলবে বলবে ভাবছে। বাড়িতে এখন দুপুরে কেউই থাকে না। সে বেরিয়ে যায়, ছোড়দিকেও নিয়মিত বেরুতে হচ্ছে। মা'র শরীরের দিকে একটু বিশেষ নজর রাখা দরকার। ইতিমধ্যে দুয়েক বার নাকি মাথা ঘুরে পড়েও গেছে মা। শরীরের যত্ন নিতে বললে কিছুতেই নেবে না। উড়িয়ে দেবে সব কথা হেসে। যদিও দুপুরে অতীশদা প্রায়ই আসছে, তবু বৈদ্যনাথ যেন বাড়ি থেকে বেশিক্ষণের জন্যে কোথাও বেরিয়ে না যায় দুপুরবেলা। মা'র ওপর একটু নজর রাখে। এ কথাগুলোই বিশেষ করে বলা দরকার বৈদ্যনাথকে।

না, আর আলসেমি করে কি লাভ। আর ঘণ্টা দুয়েক পরেই তো তীর্থযাত্রার জন্যে তৈরী হতে হবে। নড়ে চড়ে উঠে বসে, শরীরের মনের সব আলসেমি যেন গলার কাছে দলা পাকায়। ছোট্ট একটা হাই তুললেই শেষ হয় না। মস্ত হাঁ করে সেই ছোট্ট হাইটাকে টেনে বুনে বড় করে আলসেমির সবটুকুই বুঝি তাড়াতে চায়।

আর এরই মধ্যে বৈদ্যনাথ চায়ের কাপ হাতে নিয়ে ঢুকল। হাতে

বাজারের থলে। ছোড়দি চাকরিতে বেরুনোর পর থেকে বৈদ্যনাথ আজকাল সকাল সকাল বাজার যায়। থলের দিকে নজর পড়তেই ওর অভিযোগ চাড়া দিয়ে ওঠে বৈদ্যনাথের বিরুদ্ধে, রোজ রোজ যদি ওই একই রকম মাছ আনিস তো আমি খাব না বলছি—

বৈদ্যনাথ শুনল কিনা বুঝতে পারা গেলনা। চায়ের কাপ নামিয়ে রেখে মুখ টিপে হেসে বেরিয়ে গেল।

আর বৈদ্যনাথ বেরিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তার মনে পড়ে, মা'র কথাটা কই বলা হল না বৈদ্যনাথকে।